সুধীর মল্লিক

মোর্চা

ময়না প্রকাশনী ঃঃ ১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

উৎসর্গ

পরম কল্যাণীয়া

বিভাকে—

একটি কথা

চল্লিশের দশকে গ্রাম বাংলায় যে কৃষক আন্দোলন জেগে ওঠে, বিশেষ করে অধুনা বাংলাদেশের খুলনা জেলায় তারই পটভূমিকায় এই কাহিনীর পত্তন। চরিত্র সবই কল্পিত। তবু যদি কারো সাথে কোন চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তা নিতান্তই আকস্মিক ধরে নিতে হবে।

এই উপন্যাসের পরিকল্পনায় যাঁর সঙ্গে কথা বলে উপকৃত হয়েছি সেই সনিষ্ঠ কৃষককর্মী শ্রীহাজারি চরণ হালদারকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

—লেখক।

এই লেখকের—

- নীড়ের মায়া (গল্পসংকলন)
- চেয়ে আছি
  দেখছিনা কিছুই (কবিতাসংকলন)

নোনা বাঁধ

বাসটা থেমে গেল, চাঁচড়া গেট। একটা মৃদু ঝাঁকুনি। ঝাঁকুনি খেয়ে যেন সম্বিৎ ফিরে পায় সুবীর।

কিলবিল করে লোক নামছে। শরণার্থীর দল ফিরে আসছে, স্বাধীন বাংলাদেশ। ভিড় কমে গেলে এক ফাঁকে সুবীর নেমে পড়ে।

দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। এতক্ষণ বাসের মধ্যে ও কারো সঙ্গে কোন কথা বলেনি। শুধু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল।

চেনা চেনা গাছপালা, চেনা চেনা আকাশ। সুদূর দিগন্ত ছোঁয়া গ্রামগুলো। ক্ষেত, মাঠ। ধু ধু করছে। মাঝে মাঝে দু'চারটা গরু ছাগল বাঁধা আছে। বাসের শব্দে মুখ তুলে চাইছে।

এক প্রৌঢ়া গরুর দড়ি ধরে মুগুর দিয়ে ঠুকে ঠুকে খুঁটিটা মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে। ওর দাদী ঠিক এমনি করে মুগুর মেরে গরু বেঁধে দিতে আসত মাঠে। মনিরুদ্দির দাদী। সুবীরও বুড়িকে দাদী বলে ডাকত। দোস্ত মনিরুদ্দির দাদী সুবীরেরও দাদী। সে যেন কোন গত-জন্মের কথা। ও যেন জাতিস্মর হয়ে উঠেছে।

দিগন্তের কোলে আকাশের গায়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। কোথাও একটা বৌদ্ধ-স্তূপের মত। কোথাও ঠিক যেন একটা মসজিদ, কোথাও বা শিব মন্দিরের মত। এই মাঠ, রাস্তা, গ্রাম, গাছপালা, আকাশ, মাটি সব মিলে মিশে যেন একের পর এক ষড়যন্ত্র করে চলেছে. ষড়যন্ত্র করে একদিন যেন ওরাই সুবীরকে ঘর থেকে টেনে এনে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ আবার তারাই যেন ওকে কি এক খেলায় টেনে নিয়ে চলেছে।

অসহায় সুবীর ওদের হাতে যেন খেলার ঘুঁটি। তার নিজের যেন কোন লক্ষ্য নেই। শক্তি নেই, দায়িত্ব নেই, কর্তব্য নেই, এমনকি আনন্দ বেদনার অনুভূতিও নেই।

সুবীর নেমে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল। যশোর রোডের দুধারে অসংখ্য বড় বড় গাছপালা সব পরিষ্কার। চারি ধারে দোকান-পাটের ছড়াছড়ি। রিক্সাওয়ালা এসে ঘিরে ধরেছে। সুবীর ওদের এড়িয়ে এগিয়ে যায়। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে একবার থমকে দাঁড়ায়। কোন রাস্তায় যাবে ভেবে পায় না। সারাদিন শহরের এরাস্তায় সে রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কেমন হয়। রাস্তাগুলোর টুকরো টুকরো স্মৃতি কতটা মনের মধ্যে ভেসে উঠতে পারে, কতটা চেনা চেনা লাগে, না সম্পূর্ণ অচেনা মনে হয়। সেটুকু ঝালিয়ে দেখতে তো আসা। নৈলে সে কেন এল? বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবন যে গ্রামে তার কেটেছে, যে শহরে সে দিনের পর দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত

হয়েছে—সেখানকার ঘরবাড়ী, আকাশ বাতাস, চন্দ্র, সূর্য গাছপালা নদী তাকে চিনতে পারে কিনা—বাল্য-প্রণয়ের স্মৃতি কি সে একাই বহন করছে? ওর দিকে চেয়ে তারা কি ওকে চিনতে পারবে না। একটু হেসে বলবে না। কেমন আছ? যদি না পারে! যদি ওরা কথা না বলে! ওর দিকে ফিরে না চায়। কিংবা ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে তাকায়? শত্রুর মত ভাবে?

সুবীর ঘাড় নীচু করে হন্ হন্ করে হাঁটে। কারো সাথে যেন দেখা না হয়। পরিচিত কোন মুখ। এই শহরে আজও বোধহয় থাকে কত হিন্দু মুসলমান বন্ধু—বিমল, ধীরেন, নওসের। নওসের ওর সহপাঠী ছিল। মুরগী মারলে চুপি চুপি ডেকে পাঠাত। মুরগীর গোস্ত ভাত দুই বন্ধু মিলে ভিতরের ঘরে বসে খেত। দরজার কাছে বসে থাকত নওসেরের মা। সব মানুষের জাত আছে। এই মায়েদের কোন জাত নাই। তাই ভাবে সুবীর মাঝে মাঝে। ভাবলেই চোখটা চিক চিক করে ওঠে। বন্ধুর মা যদি এমন হয় তবে নিজের মা কেমন ও ভাবতে চেষ্টা করে। যে মা নিজের শিশুপুত্রকে ছেড়ে পরপারে পাড়ি দেয়—সে নিঃঠুর হৃদয়হীনা মাকে একবার সামনে পেলে কি যে করত সুবীর ভেবে পায় না।

বিশবছর আগে যেদিন ও জন্মভূমি ছেড়ে গিয়েছিল সেদিন গিয়েছিল রাতের অন্ধকারে পালিয়ে। আজ বিশ বছর পরে ও ফিরছে দিনের বেলায়। তবু গা ঢাকা দিয়ে। পরিচিত মুখগুলো এড়িয়ে। পলাতক অপরাধীর মত যেন ধরা পড়ার ভয় এক অদৃশ্য অনুসরণকারী পুলিশের মত ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। পলায়নপর পরাজিত সৈনিকের গ্লানি যেন ওর সর্বাঙ্গে মেখে আছে। ও নিজেকে যেন অপরের কাছ থেকে, এমনকি নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

দেশটা অনেক বদলে গেছে। চেনাই যায় না। যশোর থেকে কেশবপুর পর্যন্ত শুধু একটা ইটের খোয়ার এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। তারই উপর দিয়ে চলত দেয়াশালাইয়ের বাক্সের মত ঝরঝরে বাস। এখন সে রাস্তা চকচকে পীচের রাস্তা। কেশবপুর ছাড়িয়ে তো কোনদিকে বাস চলাচল ছিলই না। সবদিকে কাঁচা রাস্তা। গ্রীষ্মে গরুর গাড়ীর লিকে এক হাঁটু ধুলো। বর্ষায় হাঁটুভর কাদা। বাস তো দূরের কথা, গরুর গাড়ী চলাও দুঃসাধ্য।

কেশবপুর থেকে তখন হেঁটে যেতে হত মঙ্গলকোটের সাঁকো পেরিয়ে বসুন্দিয়ার মধ্য দিয়ে চুকনগর কাঁঠালতলা। আর না হয় নৌকা করে। মেয়েছেলে, ছেলেমেয়ে বা বুড়োবুড়ি থাকলে নৌকা ছাড়া গতি ছিল না। রেজিষ্ট্রি অফিসের ঘাট থেকে নৌকা ছাড়ত। ভাটার শুরুতে নৌকা ছাড়তে পারলে একবেলা লেগে যেত চুকনগর পৌঁছাতে। তা নৈলে একদিন। হাতে কাজ না থাকলে, নৌকাতে যদি 'ছই'

থাকে তবে তার নিচে শুয়ে বসে যেতে মন্দ লাগে না। দুধারের গ্রামগুলো, নদীর ধারের গাছপালা, তারই ছায়ায় গৃহস্থের ঘরবাড়ী 'ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়।' গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় কোন বাড়ীর ঘোমটা-পরা বউ উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে—কেউ গরু দুইছে—ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে গোময় ফেলতে আসছে, ছেলেমেয়েরা খেলছে, গাছে চড়ে লিচু, পেয়ারা, জাম জামরুল, আম, নারকেল পাড়ছে। প্রায় প্রতি গৃহস্থের বাড়ী থেকে একটা সরু পায়ে চলা পরিষ্কার পথ এসে নেমেছে নদীর ঘাটে। রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় তৃষ্ণার্ত সাপের মত। কোন অলস দুপুর, আর বিনিদ্র রজনী নদীর ও নদীধারের সৌন্দর্য আর মায়া—ধীরে ধীরে চোখের সামনে তুলে ধরে। দুপাশে কত গ্রাম, আলতাপোল, ডোঙ্গাঘাটা, নর্নে, বসুন্দিয়া, গোগ—ছবির মত ভেসে উঠে সুবীরের চোখের সামনে।

থানার পাশ দিয়ে যে রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে যেতে হত মঙ্গলকোট সেই রাস্তা এখন পাকা পীচের রাস্তা। বাস এগিয়ে চলে সেই রাস্তা দিয়ে, পার হয় মঙ্গলকোটের সেতু। সুবীর বাসের এককোণে চুপ করে বসে আছে। অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে। যদি কারো সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে সে আবার চিনতে পারে—এই জিনিসটা সে এড়াতে চায়।

চুকনগর এসে যখন বাস থামল তখন শীতকালের বেলার চারটা বেজে গেছে। বাস থেকে নেমে কোন দিকে না তাকিয়ে সুবীর সোজা কাঁঠালতলার রাস্তা ধরে। ডানদিকে চলে গেছে পাকা সড়ক তালা—সাতক্ষীরা। বাঁদিকে খেয়াঘাট পেরিয়ে—দৌলতপুর, খুলনা।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাজারের সীমা পেরিয়ে যায় সুবীর। তারপর আবার আস্তে আস্তে চলতে থাকে।

কোথায় গিয়ে উঠবে সে? তার নিজের বলতে কেউ নেই। ঘরবাড়ী কিছু নেই। শ্বশুরবাড়ীরও কেউ নেই এদেশে। সবাই ভারতীয় নাগরিক হয়ে সেদেশে গিয়ে বাস করছে। নিজের পূর্বপুরুষের ঘরবাড়ী জমাজমি সব ফেলে জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্যত্র গিয়ে ঘর বেঁধে নতুন করে বসবাস করার মধ্যে দুঃখ কষ্ট আছে সত্যি কিন্তু সে দুঃখ কষ্ট সহনীয় হলেও এর মধ্যে যে মানবাত্মার একটা অপমান ও গ্লানি আছে সেটাই আজ সুবীরের কাছে বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যারা মানুষকে এভাবে যেতে বাধ্য করে আর যারা যেতে বাধ্য হয়—উভয়েরই এতে অপমান। আর সে অপমান বড় করে ধরলে—সমগ্র মানবতার অপমান। একজন মানুষ চাঁদে বেড়িয়ে আসছে আর একজন চোখের জল ফেলতে ফেলতে পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে ভিন্ন দেশে অনিশ্চিতের পানে পাড়ি

দিতে বাধ্য হচ্ছে। এ দুটোর মাঝে দাঁড়ালে মানবতার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সব অহংকার হাস্যকর মনে হয়।

সুবীরেরও হাসি পাচ্ছিল। সেতো একদিন চোরের মত রাতের অন্ধকারে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। সে ভীরুতার গ্লানি আজ যেন সে বিশেষভাবে অনুভব করছে। জন্মভূমির মাটি আঁকড়ে থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার সাহস দেখাতে সে পারেনি। নির্যাতনের ভয়—মৃত্যু ভয়কে যে জয় করতে পারে না তার দেশপ্রেম বোধহয় বিলাসিতা। তার জীবন জোড়া ব্যর্থতার কারণ কি তাই?

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সুবীর একটু পা চালিয়ে দিল। মাঘের প্রায় শেষ। শীতটা যাই যাই করে ও রয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন তেমন দেখা যাচ্ছে না। দু'একজন পথচারী কিছুক্ষণ আগে পাশ কাটিয়ে গেছে। সব অচেনা মুখ। ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়নি সুবীরের। আর কি বা জিজ্ঞাসা করবে। কোন গ্রামে কে আছে না আছে তার খবর ওরা কিইবা বলতে পারবে। পথঘাট তো আর ওর অচেনা নয়। গ্রামের লোকজন বিশেষ করে হিন্দুরা কে বা কারা চলে গিয়েছিল, আর কারা কারাই বা ফিরে এসেছে—তার খবর পথের লোক কি করে বলবে। তার চেয়ে সময় নষ্ট না করে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। দু'চারটে রাখাল ছেলে গরু বাছুর ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে ধু ধু করছে মাঠ। কোথাও কোন ফসল দেখা যাচ্ছে না। হয়ত চাষবাস তেমন হয়নি। কিংবা শীতকালীন ফসল কলাই মুসুরী চাষীরা ইতিমধ্যে ঘরে তুলে নিয়েছে।

সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। পথের পাশে একটা পলাশ গাছে লাল ফুলের মেলা। ওরই উপর সূর্য কিরণ এসে পড়েছে। গাছটা যেন জ্বলছে। বাংলাদেশের মাটিতে যত রক্ত ঝরেছে তার সবটুকু যেন ঐ গাছটা শুষে নিয়েছিল। সেই রক্ত আজ বমন করে দিচ্ছে।

সুবীর একমুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। শুধু বাংলাদেশে কেন সারা পৃথিবীতে শত শত কোটি নিপীড়িত মানুষের রক্ত তো নিয়তই ঝরছে। তাই রক্ত রাঙা লাল পতাকা সর্বহারাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রেরণা ও প্রতীক।

একটা দমকা বাতাসে দু'চারটা লাল ফুল ঝরে পড়ল। সুবীরের চেতনা ফিরে এল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু নিভে গেল। কাঁঠালতলা এখনো অনেকখানি পথ। সুবীর ক্লান্ত পা'দুটোকে দ্রুত চালিয়ে দিল। অন্ধকার হয়ে আসছে। পথের উপর তো আর রাত কাটানো যাবে না। কোথাও উঠতেই হবে।

আজকালকার যুবক যারা তাদের কাউকেই ও চেনে না। তারাও ওকে চিনবে

না। ওর সমসাময়িক যারা ছিল তাদের অনেকেই হয়ত আজ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে। যারা আছে তারাও কে কোথায় আছে জানা নেই।

কাঁঠালতলা এখনও বোধহয় মাইলখানেক হবে। কিন্তু বাঁ পাশের ঐ গ্রামটা ? এটাই বোধহয় চাকুন্দিয়া। চাকুন্দিয়ার বিল্টু মাল ছিল সুবীরের বন্ধু ও সহকর্মী। সে কিংবা তাদের কেউ আছে কিনা কে জানে।

গাছপালার ভিতর দিয়ে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি বেশ জমে আসছে সন্ধ্যা হতে না হতেই। কাঁঠালতলা পেরিয়ে গ্রামে কারো বাড়ী খুঁজে নেওয়া এই অন্ধকার রাতে সহজ হবে না। বাংলাদেশে কেরোসিনের অভাব। সন্ধ্যের পর তাই সব বাড়িতে আলো নিভে যাবে। তার উপর অপরিচিত লোক গিয়ে ডাকলে হয়ত কেউ সাড়া দেবে না। এখনও রাজাকারদের দৌরাত্ম্য চলছে চোরা-গোপ্তা আক্রমণের মাধ্যমে। তার চেয়ে ঐ আলোটা অনুসরণ করে এই গ্রামে ঢুকে দেখলে হয়; পরিচয় দিয়ে একটা আশ্রয় মেলে কিনা।

আম কাঁঠালের মুকুলের গন্ধ ভেসে আসছে। এদিকে মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা কেমন একটা অস্বস্তি ছড়াচ্ছে। দু'খণ্ড রাস্তার পাশে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু বসলে তো আর চলবে না। পরিচিত আশ্রয় যদি মেলে তবেই নিশ্চিন্তে ফিরে এসে এখানে বসা যাবে। প্রাণভয়ে আম্রমুকুলের সুবাস মেখে অতীতকে চোখে চোখে দেখা যাবে।

দ্বিধা ও শংকাজড়িত পায়ে সুবীর এগিয়ে যাচ্ছিল বনজঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসা সেই আলোর রেখাটা অনুসরণ করে। হঠাৎ ওর মনে হল এইতো সেই বিশ্বাসদের আমবাগান। আর এরই ওধারে ছিল রথতলার মাঠ। আর একটু এগিয়ে গেলেই কাঁঠালতলার বাজার। হয়ত এখন সেই বাজার বড় গঞ্জে পরিণত হয়েছে। একদিন ওর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল ঐ বাজার থেকে। আর রাজনৈতিক জীবনের একটা অর্থপূর্ণ অধ্যায়ের শুরু বলতে গেলে ওই রথতলার মাঠে একযুগ ধরে চলেছিল সেই রোমাঞ্চকর সংগ্রাম জীবন। আর সে জীবনের শেষও হয়েছিল এখানে এই আমবাগানে। মনে পড়তেই ওর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সেদিন সেই গভীর ছায়াঘন নিঃসঙ্গ রাত্রিতে চরম দুঃখ হতাশা আর অনিশ্চয়তার পুটুলিটা সঙ্গে দিয়ে রিণী যখন ওর ছোট্ট নৌকাখানা ধাক্কা দিয়ে মাঝনদীতে ভাসিয়ে দিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারেই ও বৈঠা তুলে সামলে নিল নৌকাটা। আজ মনে হয় নৌকাটা ডুবে গেলেই বা ক্ষতি কি ছিল। বাঁচবার যে সহজাত প্রবৃত্তি বা বেঁচে থেকে আবার দেখা হবার একান্ত একটা অদম্য ইচ্ছা তাই বোধ হয় সেদিন ওকে মরতে দেয়নি। মানুষের জন্য সংগ্রাম ওটা যেন শুধু রিণীর কথার সুদূর প্রতিধ্বনি মাত্র মনে হচ্ছিল।

কিন্তু বেশীদূর ওর একা একা সেই গভীর রাত্রে নৌকা বেয়ে যাওয়া নিরাপদ মনে হয়নি। আরও অনেক নৌকা উজানে ও ভাঁটিতে যাতায়াত করছে। তার মধ্যে ব্যাপারী নৌকো অর্থাৎ ছোট বড় ব্যবসায়ীদের নৌকোই বেশী। দস্যুতস্কর, জেলে বা পুলিশের নৌকোও থাকে। হেঁকে একে অপরের পরিচয় নেয়। সুবীর দু'চার বার মিথ্যে পরিচয় দিল। ওর মনে হচ্ছিল ওরা কেউ ওর কথা বিশ্বাস করছে না। এতরাত্রে একা একা একটা লোক নৌকা করে কেন যাচ্ছে। অবশেষে যখন একান্তই আর সাহসে কুলাল না, তখন কাঁঠালতলার ঘাটের ওধারে জঙ্গলের পাশে ও নৌকো ছেড়ে পায়ে হেঁটে উঠেছিল এই আমবাগানে। কেন? তা সেদিন ও জানত না। হয়ত এখানে অন্ধকারে বসে ঐ মাঠের দিকে চেয়ে ও বিদায় নিতে চেয়েছিল সেই জীবনের কাছ থেকে, যে জীবনের ইতিহাস একটা গৌরবময় সংগ্রামের মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছিল এতদিন। আর আজ যার উপর এসে পড়ল এক অন্ধকার কালো যবনিকা। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ও এখানেই বসেছিল হয়ত এরই কোন একটা গাছে হেলান দিয়ে। ভোরের প্রথম পাখী ডাকতেই ওর চমক ভেঙেছিল। আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটেছিল বাল্যবন্ধু সমসেরের বাড়ী। সারাদিন ওরা ওকে লুকিয়ে রেখেছিল অন্ধকার ধানের গোলার মাঝে।

অতীতের সেই সমস্ত জীবনটা এক মুহূর্তে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। আজও যেন কে ওর পা দুটো বেঁধে দিল সেই বাগানের এক গাছের তলায়। ও ভুলে গেল বর্তমানকে। যে অতীত সে বহুদিন বহুযত্নে ভুলেছিল আজ সে এক অমোঘশক্তিতে ওকে পরাভূত করে ওকে বিবশ করে দিল। ধীরে ধীরে ও বসে পড়ল সেই গাছটার তলে। ওর মনের পর্দায় পাক খেতে খেতে ভেসে চলল সেই দিনগুলো।

॥ ২ ॥

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশে ঘন কালো মেঘ। চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার। একহাত দূরেও দৃষ্টি চলে না। পায়ের নীচে পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথ। সভার শেষে রিণীর হাত ধরে সুবীর ফিরছিল। একটা অনাগত যুদ্ধের মহড়া শেষ করে সহযোদ্ধার কাঁধে হাত দিয়ে শিবিরে ফেরার মত।

এতবড় জনসভা এই অঞ্চলে ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকরা গাঁজা মদের দোকানের সামনে পিকেটিং করেছে, বিলাতী বস্ত্র বর্জনের জন্য আন্দোলন করেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এই জাতীয় জনসভা, সংগঠন কেউ করেনি। এমনকি

যারা সভার উদ্যোক্তা তারাও ভাবে নি যে এতলোক এসে উপস্থিত হবে রথতলার মাঠের এই সভায়।

সুবীর অবশ্য গ্রামে গ্রামে খুব ঘুরেছে। এক এক গ্রামের উৎসাহী যুবকদের সংগঠিত করেছে। তাদের উপর ভার দিয়েছে জনসাধারণকে বুঝিয়ে সভায় নিয়ে যাওয়ার। গৌরীঘোনার—মন্মথ, মনিরুদ্দি, বরাতিয়ার—নন্দ, জিষ্ণু, কাঠালপাড়ার অনিল, চাকুন্দির—কাসেম আলি, দুলাল—এরা সবাই তাদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে। বাজারের পুলিন পোদ্দার আর বিষ্টু প্রামাণিক এদের উপর ভার ছিল সভাস্থলে ছোটখাট একটা প্যাণ্ডেল করার।

রথতলার মাঠের গায়ে বিশ্বাসদের আমবাগান। সভা প্রকৃতপক্ষে সেই আমবাগানেই হবে। হাজার হাজার লোক সেই আমবাগানের ছায়ায় বসতে পারবে—বসতে পারবে রথতলার মাঠের ঘাসের উপর রোদ পড়ে গেলে।

পুলিন আর বিষ্টু চারকোণে খুঁটি পুঁতে একটা চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে। গোটা কয়েক চৌকি পেতে হয়েছে ডায়াস। ডায়াসের উপর খানকয়েক চেয়ার একটা বেঞ্চি আর একটা টেবিল। মেয়েদের বসার জন্য একপাশে একটা জায়গা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। একটা ডে লাইটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যদি একটু রাত্রি হয় এই ভেবে।

বক্তারা সব এসে উপস্থিত হয়েছেন। কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। শ্লোগান দিতে দিতে আসছে সব। দুনিয়ার কৃষক এক হও। দুনিয়ার মজুর এক হও। জমিদারী প্রথা ধ্বংস হোক।

বক্তারা সব বুঝিয়ে বললেন কেন আজ কৃষকের এই দুরবস্থা। কে তাদের শোষণ করছে। তাদের জমিদার, তাদের বাড়ীর পাশের মহাজন, ধনী ব্যবসায়ী—এরা কি উপায়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাদের শোষণ করছে। তাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে না পারলে কৃষকদের বাঁচার পথ নেই। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের শোষণের এক একটা পথ বন্ধ করে দিতে হবে। বন্ধ করে দিতে হবে বংশী সাহা আর শচীন বিশ্বাসের সিনেমা, বন্ধ করে দিতে হবে হাটের জমিদার চাটুজ্যেবাবুদের তোলা খাজনা আদায়, বন্ধ করতে হবে অজন্মা জমির খাজনা দেওয়া।

মনে রাখতে হবে—এসব করতে গেলে অনেক বিপদ আসবে। আসবে অনেক অত্যাচার। জমিদার গুণ্ডা লাগাবে। পুলিশ ডাকবে। কিন্তু সে ভয় করলে চলবে না। আমাদের এই আন্দোলন—বাঁচার আন্দোলন। আমাদের এই জীবনমরণ সংগ্রামকে কোন শক্তিই প্রতিহত করতে পারবে না। এ সংগ্রামে আমরা জয়ী হবই।

সভা প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সভাপতিত্ব করছেন মনিরুদ্দির বাবা বুড়ো

জাঁহির মোড়ল। এবার সভাপতির উঠে দু'একটা কথা বলার পালা। এমন সময় কাল বৈশাখীর কালো মেঘে দ্রুত আকাশ ছেয়ে গেল। সভার লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যার গ্রামের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। অন্ততঃ পাশের গ্রামে লোকের বাড়ীতে গিয়ে তো দাঁড়াতে হবে। জ্যোতিষবাবু তাড়াতাড়ি বক্তাদের বাজারের দিকে নিয়ে গেলেন।

সুবীরের তো পালালে চলবে না। পুলিনকে ডেকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চাঁদোয়াটা খুলে নিল। ডে লাইট্‌টা বিষ্টুর ঘাড়ে দিয়ে বাজারের দিকে ছুটে চলল। ততক্ষণ ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

ধুলোর জন্য চোখ মেলা যায় না। বাতাসের দাপটে এগুনো যায় না। রাস্তা দিয়ে যেতেও ভয় করে। কখন হয়ত পথের পাশের একটা ডাল ভেঙে পড়বে ঘাড়ে। অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে হচ্ছে। ইতিমধ্যে জোর বৃষ্টি নেমে গেল।

ভিজতে ভিজতে শেষকালে বাজারের শেষপ্রান্তে একটা চালাঘরে গিয়ে উঠল ওরা। সেখানে আরও কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছে। সন্ধ্যা নেমে গেছে। কাউকে চেনার উপায় নেই।

সুবীর পকেটে হাত দিয়ে বিড়ির বাণ্ডিলটা পরীক্ষা করে দেখল। ভিজে চুপসে গেছে। পকেট বুকের কাছে টেনে এনে ওটাকে রক্ষা করার অনেক চেষ্টা করেও সফল হওয়া যায়নি।

ঝড়বৃষ্টি আরও কিছুক্ষণ চলবে নিশ্চয়ই। এখনও ঝড়ের বেশ বেগ আছে। ভিজে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগছে। বিড়ি খেতে না পারলে আর চলে না। পুলিনকে ডেকে বললে—পুলিন একটা বিড়ি খাওয়াতে পারিস। আমার প্যাকেটটা ভাই ভিজে একেবারে আমসী হয়ে গেছে। বিড়ি বটে আছে দাদা। আমার প্যাকেটটা চাঁদোয়াটার ভাঁজে এমন করে চালান করে দিয়েছিলাম যে ভিজতে পারেনি। কিন্তু ধরাবে কি করে। দিয়াশালাই কনে পাব। দিয়াশালাইটা ভিজে গেছে।

তাইতো, এই তো এখানে এত লোক আছে। কারও কাছে কি একটা শালাই নেই।

হঠাৎ সুবীরের নজর পড়ল এক কোণে যেন একটা বিড়ির আগুন জ্বলছে।

পুলিন, বিড়ি দেতো। আগুন পাইছি। শিগগির দে। সুবীর বিড়ি নিয়ে এগিয়ে গেল সেই লোকটার জ্বলন্ত বিড়ি থেকে ওটা ধরিয়ে আনতে।

এই যে দাদা, বিড়িটা একটু দেন তো ধরিয়ে নি।

এককোণে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল রিণী। ভাবছিল ঝড়জলে কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এখন এই অন্ধকারে সে যাবে কি করে। অবশ্য পথ চেনা। তবু অন্ধকার পথে একা একা যাওয়া—ভয় ঠিক নয়, তবু যেন কেমন কেমন লাগবে।

গলার স্বরে সুবীরকে চিনতে পারে রিণী। গলা বাড়িয়ে ডাকে। বীরুদা, না? আমি রিণী।

রিণী, তুই এখানে এসে উঠেছিস্। আর কে আছে?

না, আমাদের পাড়ার আর কেউ নেই।

কেন, জ্যাঠামশাই ওরা গেলেন কোথা?

কি জানি, ঝড়ের মধ্যে কে কোথায় নিপাত্তা হয়ে গেলো। কারো হদিস পাচ্ছিনে।

তুই যাবি কার সাথে?

দেখি তেমন কাউকে পাওয়া যায় নাকি। নৈলে একাই চলে যাবো। তোমাকে ভাবতে হবে না।

ততক্ষণে জ্বলন্ত বিড়িটা হাতে নিয়ে মুখের বিড়িতে লাগিয়ে জোর টান দিচ্ছে সুবীর। উত্তর দিতে দেরী হোল।

জোর ধোঁয়া ছেড়ে আধপোড়া বিড়ির মালিকের হাতে তা ফিরিয়ে দিয়ে সুবীর রিণীর উদ্দেশ্যে বললে,—

যাক্ আর একা একা গিয়ে বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তুই এক কাজ কর। আমার দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়া। আমি দশ পনের মিনিটের মধ্যে চলে যাব। একা একা পালিয়ে যাসনে যেন।

এত লোকের মধ্যে বেশী কথা বাড়াতে ভাল লাগে না রিণীর। সুবীর ও ততক্ষণে বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেছে।

বৃষ্টি প্রায় নেই বললেই চলে। দু'এক ফোঁটা পড়ছে কি পড়ছে না। বাতাসের বেগও মরে গেছে। সমস্ত আকাশ মেঘে ঢেকে আছে। চারিদিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

আকাশে মেঘ যেন জমে আছে। আবার বৃষ্টি নামা অসম্ভব নয়। এই সুযোগটা ছাড়া উচিত হবে না। জ্যোতিষবাবু অতিথিদের নিয়ে এতক্ষণ সুবীরের দোকানের বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। একটা হ্যারিকেন যোগাড় হয়েছে পান-বিড়ির দোকানি কালিপদর কাছ থেকে। এবার সদলে রাস্তায় নেমে পড়লেন। অন্ধকারে ঠোক্কর খেতে খেতে রিণী সুবীরের দোকানের কাছে এসে পড়ল। সামনে একদল লোক যাচ্ছে। একটা হ্যারিকেনও আছে। ঐ সংগে যেতে পারলে হত। ঐ তো জ্যোতিষবাবুর গলা শোনা যাচ্ছে।

জেঠু বলে ডাকতে যাচ্ছিল রিণী। না ডেকেই থেমে গেল। ডাকলে তো ওদের সঙ্গেই যেতে হয়। অথচ সুবীর অপেক্ষা করতে বলে দিল।

ভয়ানক অস্বস্তি লাগছে রিণীর। একা যেতে সুবীরের কোন অসুবিধাই নেই।

তবু মিছামিছি ওকে অপেক্ষা করতে বললে। এখন ও যদি চলে যায় তো অন্ধকারে ওকেই হয়তো এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াবে।

ভুলটা রিণীরই হয়েছে। নিজের ওপর ওর রাগ হতে লাগল। সুবীর ওকে অপেক্ষা করতে যখন বলল তখন ও স্বচ্ছন্দে বলতে পারত, আমি অপেক্ষা করছি বটে, তবে সাথী পেলেই চলে যাবো। তুমি গিয়ে আমাকে না পেলে একাই চলে যাবে। বুঝবে আমি চলে গেছি।

কথাটা বলে রাখলেই নিশ্চিন্তে জ্যাঠামশায়ের সংগে ও চলে যেতে পারত।

যে সময়ে যে কথাটা বলা উচিত কিছুতেই ওর মনে আসে না। চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে।

অন্ধকারে বিরক্ত ও সংকুচিত হয়ে সুবীরের দোকানের বারান্দায় খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকে রিণী।

যে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কি করে যে যাবে ওরা—মনে করে রিণীর ভাল লাগছে না। জ্যাঠামশায়ের সাথে দিব্যি আলোতে যেতে পারত।

তবে মিটিংটা আজ খুব সুন্দর হয়েছে। এত লোক হবে তা ও ভাবতেই পারেনি। এর আগে এমন কোন জনসভাতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা রিণীর ছিল না।

রিণী আজ সভাতে এসেছিল শুধু শুনতে নয়, কর্মী হিসাবে। বেশ কিছু মেয়েদের ডেকে ডুকেও এনেছিল। সেও কৃষক সমিতির কর্মী। একটা নতুন অভিজ্ঞতা। নতুন উত্তেজনা ও অনুভূতি। রিণীর হাসি পেল। তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ও ভাবলে, মন্দ কি, একটা কাজ তো জুটেছে। দিনগুলো যেন তার কাটছিল না।

সুবীর এসে গেল। একটু বেশী তাড়াতাড়িই এসেছে। রিণী অন্ততঃ আরও অনেক দেরী হবে ভেবেছিল। যদিও প্রতিমুহূর্তে ও আসছে না দেখে রিণী অধৈর্য্য ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিল। ক্রোধ সুবীরের উপর যতখানি তার চেয়ে বেশী নিজের উপর নিজের বোকামির জন্য।

সুবীর ডাকে, রিণী।

রিণী সাড়া দেয় না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে থাকে।

সুবীর নিজে নিজেই বলে, চলে গেল নাকি।

রিণী মুখ বন্ধ করে শব্দ করে 'হুঁ'। সুবীর হাসতে হাসতে বলে, ও দুষ্টু। পেত্নী। ভয় পেয়েছো? হাসতে হাসতে বলে রিণী।

চল, বেরিয়ে পড়া যাক্। অন্ধকারে যেতে পারবি, না একটা আলোর জোগাড়ে যাব?

তুমি যদি না পার তবে যাও। আমার জন্যে যেতে হবেনা। কেন রে। কাদা পথে অন্ধকারে তোরই তো চলার অভ্যাস নেই। আমিত বরং নিশাচর।

আমার আলো লাগলে আমি তো জ্যাঠামশায়ের সংগে যেতে পারতাম।

দেখা হয়েছিল ?

না।

তবে ?

শোনা হয়েছিল।

মানে ?

এখানে এসে যখন পেঁছিলাম হোচটাতে হোচটাতে তখন জেঠুরা রাস্তায় নেমে এগিয়ে চলেছেন। ছোট একটা লণ্ঠন যোগাড় করে নিয়েছেন দেখলাম কোথা থেকে। জেঠুর কথা শুনে বুঝলাম। সাড়া দিলাম না। তাই দেখা হল না।

তবে তো তুমি তাঁদের সংগে যেতে পারতে।

তা পারতাম। তা হলে বীরপুরুষকে তো একাকী অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে যেতে হত।

ভাবছ কি তাতে এ শর্মা,—বাপ মা যাকে সুবীর নাম দিয়েছে—সে অপারগ হত ?

যথাসময়ে সে বীরত্বের প্রমাণটা পাওয়া যাবে। অতএব—অতএব, দয়াময়ী নেমে এস পথে। যাত্রাভিনেতার ঢং-এ রিণীকে আহ্বান করে হেসে উঠল সুবীর। রিণীও একটু স্পোর্টসমানের মত কায়দা করে বারান্দার খুঁটি ধরে লাফিয়ে পড়ল নীচে।

এরপর আর আলো নেবার কথা ভাবা যায় না। কিন্তু দু'চার পা যেতেই এটা হৃদয়ঙ্গম হল যে একটা দণ্ডগ্রহণ ভিন্ন উন্নত শীর্ষ হয়ে এগিয়ে যাবার কোন উপায় নেই সেই অন্ধকারে। রাস্তার পাশে হালদারদের পটলক্ষেত। জীওল গাছের ছোট ছোট ডাল বা কচাপুঁতে বেড়া দেওয়া হয়েছে অল্প দিন হল। এগুলি এখনও শিকড় মেলে দাঁড়াতে পারেনি। ওরই একখানা উপড়ে আনল সুবীর।

নেবে নাকি একটা ?

না। আমি তো সুবীর নই। অবলা নারী গদা গ্রহণ করে কি করবে। বলেই হেসে উঠল রিণী। এত শিগগির যে তোমার বীরত্ব ধরা পড়ে যাবে তা ভাবতে পারি নি।

কেন, এর মধ্যে ভীরুতা কোথায় দেখলে। বীর সর্বদা অস্ত্রগ্রহণের অধিকারী।

রিণী পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। একটা পা কাদায় ফেলে কতটা হড়কে যায় দেখে শক্ত করে কাদায় পুতে নিয়ে আর একটা পা উঠাচ্ছে। সুবীর ওকে সহজেই

দু'পাঁচ পা ছাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ওকে সাথে সাথে এগিয়ে আসার সুযোগ করে দিচ্ছে।

সুবীর কয়েকটা পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবছিল রিণীটা একটা আলো যোগাড় করে নিতে বাধা দিল কেন? ছেলেমানুষী খেয়াল আর কি? একটা এ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ পেতে চায় বোধ হয়।

রিণী ডাকলে—কই বীরুদা, কোথায় তুমি? কথা বলছ না কেন? কি ভাবছ?

এই তো আমি। ভাবছি একটা আলো আনতে দিলে না। এই অন্ধকারে কাদাপথে কি হাঁটতে পার? কি ভাবলে কে জানে?

রিণীর হাসতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু হাসতে পারল না। বললে, ভাবব আবার কি? আসলে অন্ধকারে হাঁটতে আমার বেশ ভালই লাগছে।

অন্ধকার আবার কারো ভাল লাগে নাকি?

আমার লাগে। জীবনটাই যখন অন্ধকার, তখন অন্ধকারে সবদিক থেকে মানিয়ে নেবার মহড়া দেবার সুযোগটা হারাই কেন? বলেই এবার হেসে উঠল রিণী।

সুবীর কিছু বলতে পারল না। সত্যটা এত কঠিন নির্মম যে রিণীর হাসির তরঙ্গে সেটা ভেসে এসে সুবীরকেই যেন আঘাত করল। অথচ এই নিপীড়ন, এই অত্যাচার, এই নিষ্ঠুরতা মানুষ নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সুবীর। রিণী ওর পাশে এসে পড়েছে। এইটুকু আসতেই বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে বোঝা যাচ্ছে। একে তো অন্ধকারে পিছল পথ, তাতে সম্পূর্ণ অবলম্বনহীন। এক পা এগোতে কতটা কষ্ট হচ্ছে তা সুবীর বেশ বুঝতে পারে। এই অভিজ্ঞতা তার আছে। রিণীর বরং ছিল না।

রিণীও ভাবছিল এই হঠকারিতা কেন করলাম। এর চেয়ে একটা আলো আর একটা লাঠি নেওয়া উচিত ছিল।

এই অবস্থায় খেয়াঘাট পর্যন্ত পেঁছাতে যেমন সময় লাগবে তেমনি শারীরিক কসরৎ। সময়ের জন্য চিন্তা নেই। যতটা সময় লাগে লাগুক। কিন্তু শারীরিক সামর্থ্যে যদি না কুলোয়। কোথাও দাঁড়িয়ে বসে বিশ্রাম নেবারও উপায় নেই। সারাদিন শরীরের উপর দিয়ে যা ধকল গেছে তার উপর আবার এই কষ্ট।

সুবীর বললে, তোমার যা কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছি। যদিও তুমি স্বীকার করবে না।

রক্ষে কর বাপু, সারাদিনের পর আবার রাজনৈতিক বক্তৃতা আর সহ্য হবে না।

না, সে ইচ্ছা আমারও নেই। বলছিলাম, তুমি আমার হাতটা ধর। ওর স্বরে একটু শুষ্কতা ও গাম্ভীর্য যা রিণীর কান এড়ায় না।

থাক্, ধন্যবাদ। আমি একাই যেতে পারব।

তা হাতটা ধরে গেলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত। বলেই সুবীর এক পা এগোল।

শোন, আমাকে রেখে পালিয়ে যাচ্ছ। বেশ যা হোক পুরুষ মানুষ।

না, পালিয়ে যাব কেন, এই তো দাঁড়িয়ে আছি। সুবীর দাঁড়িয়ে পড়ে বলল।

তুমি বৃথা রাগ করছ কেন? কারো হাত ধরে শেষ পর্যন্ত যেতে পারতাম তো মন্দ হত কি? খেয়াঘাটের আগেই তো হাত ছাড়তে হবে।

অন্ধকারে কারো হাত ধরে যতটুকু যাওয়া যায়—ততটুকুই লাভ। সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে লাভ কি? আচ্ছা আমিই তোমার হাত ধরে অন্ধকার রাতে যতদূর যাওয়া যায়—যাব—তাতে অন্ততঃ রাজী হও। বলে সুবীর ওর ডান হাতের কব্জিটা মুঠো করে ধরলে।

রিণী চমকে ওঠে। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে পারে না। ইচ্ছে করেও না। একটা বৈদ্যুতিক শক্ খেয়ে ওর স্নায়ুগুলো যেন অবশ হয়ে গেছে।

সুবীর ওকে টেনে নিতে চায়। রিণী ক্লান্তস্বরে বলে, একটু দাঁড়াও। ও ওর শরীরের সমস্ত ভরটা সুবীরের গায়ে ঢেলে দিয়ে একটু বিশ্রাম নিতে চায়। মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করছে।

ওর যেন সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে ওর অন্তরাত্মা যেন কারো উপর দেহমনের সমস্ত বোঝাটা এমনি করে চাপিয়ে দিয়ে হাল্কা হতে চায়—মনের এই একান্ত ইচ্ছাটা ওর মধ্যে কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল তা তো ও জানত না। আজ হঠাৎ এই আবিষ্কারে ও শিউরে ওঠে। ও হাঁপাতে থাকে। সুবীর আর একটা হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে রাখে।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কেটে যায়। তারপর সামলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিণী। বলে, চল। লাঠিটা বরং আমাকে দাও।

তা দিচ্ছি। এইবার বীরাঙ্গনা রূপটি পূর্ণ হল। তখন যে বড় ঠাট্টা করছিলে। লাঠি না থাকলে কার জোরে তুমি এগোবে। তবে এও বলে রাখি আমার লাঠি যখন নিচ্ছ তখন আমাকে তোমার হাত ধরে যেতেই হবে।

কথাগুলো আগের মতই হাল্কা ঢংয়েই বলতে চেয়েছিল সুবীর। কিন্তু কেমন যেন আর তেমন হাল্কা শোনাল না। বলে ফেলেই তাই ও যেন একটু সংকুচিত হয়ে উঠল।

রিণীও কোন কথাই বলতে পারলে না।

॥ ৩ ॥

রিণীর উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেছে। সারা বাড়ী রোদে ভর্তি। কালকের ঝড়বৃষ্টিতে ভেজা গাছপালা, ক্ষেত, ঘাস, লতাপাতার উপর সকালের হলদে রোদ পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। তার দিকে তাকান যায় না। রিণী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু'হাতে চোখ দুটো ঘসে নিল। উঃ, কতটা বেলা হয়ে গেছে। এখনও নিশ্চয়ই জেঠুদের চা দেওয়া হয়নি। কে-ই বা দেবে। ও কাজটা তার। আর কেউ পারেও না ঠিক। রিণীর নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হল। দেরী করে ওঠার জন্য সে নিজের উপর ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠল। এখন ও হাত মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় বদলে চা করে নিয়ে যেতে তো আরও আধঘণ্টা সময় চাই।

কি করবে, এক মুহূর্তে ভেবে নিয়ে রিণী আবার ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। স্টোভটা ধরিয়ে আগেই চায়ের জল বসিয়ে দিল। তারপর বাইরে গিয়ে কোনমতে জল কুলকচা করে এল। ভাল করে দাঁত মেজে মুখ ধোওয়া আজ পরেই হবে। প্রাতঃ-কৃত্যও সেই চানের আগেই। আজ বরং সকাল সকাল চানটা সেরে নেবে। তাড়াতাড়ি কাপড়টা ছেড়ে চায়ের সরঞ্জাম হাতে ও যখন বাইরের ঘরে পেঁছাল তখন আটটা বেজে গেছে। কেষ্টবাবুরা বেরিয়ে পড়ার জন্য তৈরী।

কেষ্টবাবু হেসে বললেন, এই যে রিণী মা, তোমার সংগে দেখা হচ্ছে না বলেই যেতে পারছি না।

লজ্জিত মুখে কৈফিয়তের সুরে রিণী বললে, আজ উঠতে বড় দেরী হয়ে গেল কাকু।

হওয়াই তো স্বাভাবিক মা। কাল শুতে শুতেই তো রাত দু'টো বেজে গেল। তার উপর সারাদিন যা পরিশ্রম গেছে। তোমাদের তো এত খাটাখাটুনি অভ্যেস নেই।

জ্যোতিষবাবু বললেন, শুধু কাল কেন, রিণী এ ক'দিন খুব খেটেছে। পোষ্টার লেখা থেকে সরু করে মেয়েদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করা—ও সারাদিনই ব্যস্ত থাকত। কাল যে সভায় অতগুলো মেয়েছেলে এসেছিল সে শুধু রিণীরই কৃতিত্ব, নৈলে এদেশে কস্মিনকালেও কোন সভাসমিতিতে কোন মেয়েছেলে বের হয়নি।

সে তো আমি জানি। আমাদের জনসভা যে পরিপূর্ণ সফল হয়েছে তার প্রমাণ ঐ মেয়েদের যোগদান। এখানে আমাদের আন্দোলন বিফল হবে না, এ আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি দাদা।

কমরেড আলিসাহেব বলে উঠলেন, আর সেই সফলতার অনেকখানি কৃতিত্ব কমরেড্ মিস্ রিণী মজুমদারের।

আলি সাহেবের কথায় সবাই হাল্কাভাবে হেসে উঠলেন। রিণী এদের স্নেহসিক্ত প্রশস্তিতে এতক্ষণ যেন মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। কোন কথা বলতে পারেনি। মাটির দিকে মুখ করে সকলের সামনে মুড়ির বাটি ও চা'র গেলাস এগিয়ে দিয়েছে।

এবার সংকোচ কাটিয়ে রিণী বললে, কাকু, আমাকে আপনারা এমন ভাবে লজ্জা দিচ্ছেন কেন?

কেষ্টবাবু তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, না মা, লজ্জা দেবার কথা নয়। সত্যি সত্যি গ্রামাঞ্চলে আমাদের একজন 'মহিলা কর্মী' আজ পর্যন্ত নেই। তাই তোমাকে পেয়ে আমরা অতিমাত্রায় খুশী হয়েছি। আমাদের কাছে এটা যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার। তা বাদে তোমার মধ্যে একটা স্বচ্ছ রাজনৈতিক দৃষ্টি আছে—যা অনেক ছেলেদের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

ওটা আপনি স্নেহবশে বাড়িয়ে বলছেন।

না মা, না। এর এক বর্ণও আমি ভাবাবেগে বলিনি। ঐ যে কাল রাতে আলোচনা চক্রে তুমি বললে, লোহা গরম থাকতে থাকতে পিটতে হবে যদি তা দিয়ে কিছু বানাতে হয়। জনসাধারণের মধ্যে যে উত্তেজনা এসেছে এটাকে দেরী না করে আন্দোলনের পথে নিয়ে যেতে হবে নৈলে সব পণ্ডশ্রম হয়ে যাবে। তখন পুনরায় তাতাতে আবার অনেক সময় লাগবে। এটা একটা খুব মূল্যবান কথা।

চা-মুড়ি শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে। গেলাসটা নামিয়ে রেখে ঝোলাটা কাঁধে নিতে নিতে বললেন, থাক্ আজ আর কথা নয়। আবার তো দেখা হচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যে। তোমাকে যা করতে হবে জ্যোতিষদাকে বলে গেলাম। তারপর সুবীরকে লক্ষ্য করে বললেন, চুকনগরের সভা অর্গানাইজ করার ভার তোমার উপর রইল। জ্যোতিষদার নির্দেশমত সব কাজ ঠিক ঠিক করা চাই। আমি সভার দিন ছাড়া বোধ হয় আসতে পারব না।

জ্যোতিষবাবুকে নমস্কার করে উঠানে নেমে পড়লেন কেষ্টবাবু, কমরেড আলি ও দত্ত। রাস্তা পর্যন্ত রিণী ও সুবীর সংগে সংগে চলল।

রাস্তায় পড়ে রিণী ও সুবীরের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কেষ্টবাবু বললেন, চলি, কেমন। আর তোমরা এস না।

ওঁরা পূর্বদিকে হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছেন। সেইদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল রিণী আর সুবীর যতক্ষণ ওঁদের দেখা যায়।

কাজের হুজুগে এ কটা দিন যে কিভাবে কেটে গেছে তা যেন খেয়ালই ছিল না। নিত্য দিনকার যে জগতে একঘেয়ে ঘোরাফিরা করে দিন কাটে তা থেকে মুক্তি পেয়ে একটা নেশার ঘোরে যেন ছিল ওরা। বিশেষ করে রিণী। তাই রিণীর যেন কেমন

বড় ফাঁকা লাগছে। বাড়ী ঘরে কেউ যেন কোথাও নেই। এমনকি জেঠু. ঠা'মা এরাও যেন থেকেও নেই। আসলে মনের মধ্যে কাকেও যেন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একটা অবসাদ—কিছুই করতে ইচ্ছে হয় না। অথচ শুয়ে বসে থাকাও যায় না। কি এক অস্থিরতা।

ফিরে আসতে জ্যোতিষবাবু বললেন, একটু তামাক খাওয়াবি, মা? রিণীর মনে পড়ল সকাল থেকে জেঠুকে সে আজ তামাক সেজে দেয়নি। তাড়াতাড়ি ছুটল ও।

আজ ক'দিন দোকানে যাওয়া হয়নি। সময় কোথা। সুবীর ভাবছিল একবার ঘুরে আসবে কি না। সুনয়নী ডাকলেন নাস্তা খেয়ে নিতে। বললেন, রিণী আর তুই দু'জনে বাকী। দু'জনে খেয়ে নিয়ে আমাকে মুক্তি দে।

ওরা খেয়ে বাইরে যেতে দেখে জ্যোতিষবাবু তৈরী হচ্ছেন। কোথায় যাবে জেঠু? রিণী জিজ্ঞাসা করে।

ওপাড়ায় একটা 'কল' আছে তাই যাব। তুই ততক্ষণ ডাক্তারখানায় বস। কেউ এলে একটু ঔষধ দিয়ে দিবি। নৈলে বসিয়ে রাখবি।

একটা কাজ পেয়ে রিণী খুশী হয়ে উঠল। বললে, আমি আছি। তুমি তাড়াতাড়ি এস কিন্তু।

তথাপি রিণীর ভাল লাগছে না। সুবীর দোকানে যাবে।

রিণীর একা একা ডাক্তারখানায় বসে বসে আর যেন সময় কাটাতে পারবে না।

জেনেও রিণী জিজ্ঞাসা করে, বীরুদা কোথায় যাবে এখন?

দেখি, দোকানমুখো তো ক'দিন যাইনি। একবার দেখে আসি। সুবীর বলে।

দূর, এত বেলায় কি আর দোকানে যাবে। বরং সকাল সকাল চান খাওয়া সেরে একেবারে সে বেলা যাবে।

সুবীর এমন অপ্রত্যাশিত অনুরোধের কোন কারণ খুঁজে পায় না। অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রিণী মৃদু হেসে বলে, কি দেখছ অমন করে?

না, ভাবছি তুমি হঠাৎ আজ এখন দোকানে যেতে না বলছ কেন।

এমনিই। এ কদিন তো খুব ধকল গেছে। আজ সকাল সকাল চান খাওয়া করে একটু বিশ্রাম করে তারপর যাও।

কথাটা খুবই মনঃপূত। সুবীরের একটু বিশ্রাম খুবই প্রয়োজন। এ বেলা যাবার এমন কোন তাগিদ আছে তা ও না। বাড়ী বসে কি আর করে, তাই যাওয়া। কাজের মধ্যে বাজারে একটু আড্ডা দেওয়া হবে।

কিন্তু এর মধ্যে রিণীর কি কোন প্রয়োজন নেই। শুধু কি সুবীরের বিশ্রামের

প্রয়োজনের কথা ভেবেই ও যেতে নিষেধ করছে। না আর কিছু। সুবীর ভাবতে থাকে। অথচ বেশী কিছু আর জিজ্ঞাসা করতেও ভরসা পায় না।

বলে, এই তো সকালের খাওয়া খেয়ে উঠেছি। এখনি কি-চান করব।

না, ঘণ্টাখানেক পরেই চান করলে হবে। জেঠু আসুক। ততক্ষণ এস না গল্প করি।

সুবীর বুঝলে রিণীর প্রয়োজন কি। তাই সে অমনি করে বলছে। এখন একা এই বাইরের ঘরে তার বসে থাকতে ইচ্ছা করছে না। অথচ থাকতেও হবে।

কিন্তু ওদের দুজনে এখন বসে বসে গল্প করলে তার ফল ভবিষ্যতে যে খুব মধুর হবে না সে কথাটা সদা সতর্ক রিণীও বোধহয় খেয়াল করছে না। অথচ তা তাকে বলাও চলে না। অন্ততঃ সুবীর বলতে পারবে না। কাল রাতে সভার শেষে ওরা দুজনে ফিরেছে এটা আর কারো তেমন চোখে না পড়লেও বা আর কেউ গুরুত্ব না দিলেও, কমলা খুব খেয়াল রেখেছে। তাই নিয়ে গভীর রাতে যেটুকু দাম্পত্য অশান্তি ঘটেছে তার ফলে স্বাভাবিক কথাবার্তা এখন বন্ধ। সে জন্য অবশ্য সুবীরের এমন কিছু খারাপ লাগছে না। কিন্তু তাদের মধ্যে এই মনান্তরের কারণটা যখন আর সকলে জানবে তখনকার অবস্থাটা চিন্তা করে সুবীর শংকিত না হয়ে পারছে না। অবশ্য এর কোন আভাস সে নিজে রিণীকে দিতে পারবে না; দিতে চায়ও না। দিলে আর কিছু না হোক দেশের কাজ থেকে রিণী নিজেকে গুটিয়ে নেবে। সে আবার নিভে যাবে। সুবীর তা কিছুতেই হতে দিতে পারে না।

সুবীর চুপ করে আছে দেখে রিণী বললে, কি ভাবছ বীরুদা? চুপ করে রইলে যে। আমার সঙ্গে বসে গল্প করা উচিত কিনা তাই? বোধহয় ওর গলায় একটু ব্যঙ্গ।

সুবীর সুযোগটা ছাড়ে না। বলে, অত চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টি আমার নেই। অবশ্য থাকলেও আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাতাম না; ও দায় যদি বইতেই হয় তবে তুমি বইবে। দাঁড়াও, একটা পান খেয়ে আসি। বলেই হন্ হন্ করে বাড়ীর ভেতর চলে যায়।

রিণী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। একটা রুদ্ধ আক্রোশে ওর চোখ দুটো জ্বালা করতে থাকে। কেন, কি তার অপরাধ? যার জন্য সে সকলের কাছে আসামী হয়ে থাকবে? তার মনটা যদি মরে না যায় তবে সে কি করতে পারে তার জন্যে।

পড়ে পড়ে যে মার খায় তাকে মার খেয়েই যেতে হয়। একটা বিদ্রোহ জাগে রিণীর মনে। অমনি করে আর মার খেতে সে রাজী নয়। ঠিক আছে। দেখাই যাক না কি দায়িত্ব এসে চাপে, আর সে তা বইতে পারে কিনা।

সুবীর ফিরে এল পান চিবোতে চিবোতে। রিণীর জন্য সুপারি এনেছে খানিকটা। মৃদু হেসে ওর হাতে দিল, ধর।

রিণী সত্যিই ভারী খুশী হয়ে উঠল। এইটুকুই যেন আজ সে চাইছিল। তার এই ছোট প্রয়োজনটুকুই না বলতে কেউ পূরণ করে দেবে এটা সে ভাবতে পারেনি, অথচ তার মনটা যে এ'টুকুই একান্ত আশা করেছিল—এই আবিষ্কারে সে অজ্ঞাতসারে যেমন হ'ল খুশী, তেমনি হ'ল আশ্চর্য।

সুবীর একটা বিড়ি ধরিয়ে হেলান দেওয়া বেঞ্চিটায় আরাম করে বসল।

রিণী চেয়ারটায় পা তুলে বসে বলল, তাহলে আর সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই শ্রীঘরে যাচ্ছো। কি বল?

রিণী মৃদু হাসতে থাকে। সুবীর বুঝতে পারছে না দেখে আবার বলে, অবশ্য ওটাকে কেউ মামার বাড়ীও বলে। কেউ আবার শ্বশুরবাড়ীও বলে।

সুবীর এবার বুঝতে পারে। হাসতে হাসতে বলে, তা হয়ত যেতে হবে। তবে ওজন্য আর ভয় করিনে, সেবার মাস পাঁচেক থেকে অনেকটা অভ্যাস হয়ে গেছে।

হুঁ, শুনেছি দেশোদ্ধার আগেও করতে। আসলে নিষ্কর্মা বাউণ্ডুলে ছেলেদের ওটাই তো একটা কাজ। এই ধর যেমন আমি। মেয়ে হয়েও নিষ্কর্মা বলে তোমাদের দলে ভিড়ে গেছি। হাল্কা হতে চায় রিণী।

সুবীর কিছু বলে না। গম্ভীর মুখে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে।

রিণী একটু কৌতুক বোধ করে। বলে, কি রাগ করলে নাকি?

না রাগ করব কেন?

সত্যি বলছ?

হ্যাঁরে হ্যাঁ। সত্যি নয় কি মিথ্যা বলছি।

উঁহু, বিশ্বাস হল না। সত্যি, যদি রাগ না করে থাক, তবে তোমার সেবারে জেলখানার গল্পটা শোনাও। কোনদিন তো বলতে চাওনি।

কি হবে সে সব শুনে।

বল না। আর দাম বাড়িও না। তোমাদের দলে যখন ভিড়ে পড়েছি তখন হয়ত আমাকেও একদিন লালঘরে যেতে হতে পারে। তোমার গল্প শোনা থাকলে ভরসা পাব।

তবে শোন। কোথা থেকে আরম্ভ করি বলতো।

ঠিক আছে। তোমাকে পুলিশ ধরল কেন বল।

আমি তখন সত্যাগ্রহী ছেলেদের একটা দলের নেতা·········সুবীর বলে চলে। ডুমুরিয়া থানায় আমার কাজ। পিকেটিং করছি গাঁজা মদের দোকানের সামনে।

এমন সময় এক গাঁজাখোর রক্তচক্ষু করে তেড়ে এল। হাতে উন্মুক্ত ছোরা। আমরা ক'জন অহিংস সত্যাগ্রহী। কিছু করার নেই। হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করছি। মনে মনে একটু ভয়ও হচ্ছে। ছোরাটা কাজে লাগালে যে আমাদের দু-এক'জনকে আর দেশের কাজ করতে হবে না তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুখে কাকুতি মিনতি করছি—মনে মনে জপ করছি ঠাকুরের নাম। গাঁজাখোর সমানে হম্বিতম্বি চালিয়ে যাচ্ছে। খবর পেয়ে বাজারের কিছু লোক জুটে গেল। তারা তখন রুখে দাঁড়াতে গাঁজাখোর পালিয়ে গেল।

ইস্ এমন একটা ট্রাজেডি ঘটতে ঘটতে ফুস্। যাঃ বাবা, বাজারের লোকগুলো তো ভারী বেরসিক। গম্ভীর হয়ে বলে রিণী।

হাসিমুখে সুবীর বলে, তা বটে, তবে তাদের কাজে একটা সুফল হয়েছে—এমন একটা হবু ট্রাজেডীর গল্পটা তোমার অন্ততঃ শোনার সৌভাগ্য হচ্ছে। নৈলে তো তুমি জানতেই পারতে না। সে যাক্ তারপর শোন।

থানা নিকটেই। লোকজনের ভীড় সরে গেল। বেলা প্রায় তিনটে বাজে। ক্ষিধেয় পেট চো চো করছে। সেই সকাল সাতটা থেকে এসে বসেছি—দোকান খোলার আগে। ভাবছি সবাই উঠে যে যার বাড়ী যাব নাকি।

এমন সময় দারোগাবাবু এলেন তিন চারজন কনস্টেবল নিয়ে। বললেন—চলুন থানায়। আপনাদের আমি এ্যারেষ্ট করলাম।

আমি হাত জোড় করে বললাম, স্যার এত কাছে থানা—আর আপনারা এত দেরী করে এলেন, সেই সকাল থেকে আপনাদের আশায় বসে আছি।

দারোগা আমানুল্লা কঠিন অত্যাচারী বলে খুব সুনাম। তার সামনে এমনি ইয়ারকি করে কেউ কথা বলতে পারে তা সকলের ধারণাতীত। সকলেই মনে মনে ভাবছে এইবার শুরু হ'ল রুলের গুঁতো বা বুটের লাথি।

কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমানুল্লা হেসে বল্লেন, এতগুলো সত্যাগ্রহীর একবেলা খাবারের খরচা বাঁচিয়ে দিলাম। যার খাই তার স্বার্থ দেখতে হবে তো।

আমি সাহস পেয়ে আবার বললাম, হুজুর, দয়া করে রাতের বরাদ্দ থেকে কিছু কেটে এখন যদি চারটে মুড়িটুড়ির ব্যবস্থা করে দিতেন, তা হলে প্রাণে বাঁচতাম, ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। আর ক্ষিধেয় যদি আমরা কেউ মরেই যাই তবে তো আপনার ভবিষ্যৎও অন্ধকার।

এইবার বোধ হয় দারোগা সাহেবের আত্মসম্মানে লেগে গেল। মুখের হাসি নিভে গেল হঠাৎ। গম্ভীর হয়ে বললেন, আগে থানায় চলুন। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে

আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। তবে ক্ষিধের কথা যখন বলেছেন তখন দেখা যাবে কি করা যায়।

বলেই উনি এগিয়ে গেলেন। আমাদের দলের মম্মথ বললে, বীরুদা, তোমার ও রকম কথা বলা ঠিক হয় নি। ও শালা যদিই বা কিছু করত, এখন আর কিছু করবে না। সেই রাত অবধি শুকিয়ে থাকতে হবে।

বলিস কি! ও করবে না তো ওর বাবা করবে। যদি আধঘণ্টার মধ্যে জলখাবার-টাবার কিছু না দেয় তবে কি করতে হবে জানিস্।

মম্মথ হতাশভাবে বললে, কি আর করবে। এখন আমরা ওদের মর্জির উপর বাঁধা। আমার তো মনে হয় হাজতে নিয়ে রুলের গুঁতো ছাড়া আর কিছু খেতে দেবে না।

মম্মথর কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। সে বোধ হয় সত্যি সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি বললাম—তোমাদের কোন ভাবনা নেই। শুধু আমি যা বলব তাই করে যাবে। আধঘণ্টার মধ্যে, যদি খেতে না দেয় তবে আমরা অনশন ধর্মঘট করব। কোর্টে হাজির না করা পর্যন্ত কিছু মুখে দেব না। আর সেখানে গিয়ে হাকিমের সামনে সব বলে দেব। ও ব্যাটার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে জান যাবে। ও ভেবেছে কি? সহজে ছাড়ার পাত্র সত্যাগ্রহীরা নয়।

পুলিশগুলো শুনছে আমাদের কথা। আমার নূতন সঙ্গীরা খুবই অস্বস্তি-বোধ করছে। পুলিশের মুখের উপর গালাগালি করছি। নির্যাতনের ভয়ে ওদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

আমার উদ্দেশ্য পুলিশকে শুনিয়ে বলা যে আমরা অনশন ধর্মঘট করতে পারি। ঐ জিনিসটা ছিল তখন আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র—কিছুতেই বিফল হবার নয়। পুলিশগুলো গিয়ে আমাদের অভিসন্ধি দারোগাকে নিশ্চয়ই বলে দেবে। ফলে আমাদের খাদ্যের বরাদ্দ নিশ্চিত।

আর হলও তাই। আধঘণ্টার মধ্যে নারকেল, মুড়ি আর খেজুর গুড় এসে গেল। আমি এবার মুখ টিপে হাসলাম মম্মথর দিকে চেয়ে।

তোমাদের ক'দিন থানায় আটকে রাখল?

থানায় কি আটকে রাখবে? ওদের ক্ষমতা আছে নাকি থানায় আটকে রাখার। সেই রাত্রেই রাত্রি এগারোটার গহনার নৌকায় সশস্ত্র পুলিশ আমাদের নিয়ে গেল খুলনায়।

তারপর সেখানে গিয়েই খালাস নাকি? অতঃপর সগর্বে উচ্চশির দেশগৌরব বীরুদার প্রত্যাবর্তন—রিণী দু'হাতে মালা ধরার ভঙ্গী করে হেসে উঠল।

[illegible] তেমন নজর দিল না। বললে—খালাস কি রে? খালাস কি [illegible] দু'টি মাস হাজতে পুরে রাখল। তারপর বিচারে দিল তিন [illegible] জেল খাটাতে পাঠিয়ে দিল দমদমে।

[illegible] বেশ রাজ অতিথি হয়ে জেলে গেলে। তা খাওয়া-দাওয়ার কেমন ব্যবস্থা [illegible] আমার সবসময় ভয় কি জান, যদি কখনও জেলে যেতে হয় তবে খাবার [illegible] মরে যাব। খাওয়া আর ঘুমানোর যদি কষ্ট হয়, তবে আমি তোমাদের [illegible] মধ্যে নেই বাপু। বলে আবার হাসতে থাকে, রিণী।

[illegible] বলে, জেলখানায় খাওয়া থাকা উভয়েরই কষ্ট—এই কঠিন সত্যটা তোমার জেনে রাখাই ভাল। তবে এত লোক যখন সেই খাদ্য খেয়ে এবং সেইভাবে থেকে বেঁচেও আছে, তবে তুমিও বা পারবে না কেন? মনকে তৈরী করতে হবে কষ্ট স্বীকারের জন্য, নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে। তা না হলে কোন বড় কাজ তো দূরের কথা, আমাদের বেঁচে থাকাও তো অনেক সময় কঠিন হয়ে উঠে।

আবার বক্তৃতা শুরু করলে? ঐ বদভ্যাসটা বেশ রপ্ত করেছ। কি খেতে দিত তাই বল।

খেতে অবশ্য ভাতই দিত। তবে সে ভাত আমরা খেতে পারতাম না। পচা চাল। ভাতে বিষ্ঠার গন্ধ। মুখের কাছে আনতেই বমি হয়ে যেত। বোধ হয় না খেয়েই মারা যেতাম যদি এই সময় কেষ্টদার সংগে দেখা না হত।

কাকু কি তখন জেলে ছিলেন নাকি?

হ্যাঁ ছিলেন। তবে আমাদের মত সাধারণ বন্দী হিসাবে নয়। রাজবন্দী হিসাবে। তাদের মান মর্যাদা, সুখ সুবিধার ব্যবস্থা যে কোন লোকের ঈর্ষার বস্তু ছিল। জেলের মধ্যে একধারে ওরা থাকতেন—যেমন ঘর, তেমনি বিছানা, তেমনি খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা। বিকালে ঘুরে বেড়াতেন জেলের মধ্যে। আলাপ পরিচয় হত আমাদের মত সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে — সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে।

আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে কেষ্টদা এরপর থেকে প্রত্যেকদিন এক কাপ করে ঘি আর কিছু মশলা পাঠিয়ে দিতেন। আমরা সেই দুর্গন্ধ ভাতে ঘি মেখে কোনমতে গিলতাম আর মশলা মুখে দিয়ে বমি আটকাতাম।

কিন্তু এইভাবে তো চলতে পারে না। নিত্য দু'চার দল করে সত্যাগ্রহী আসছে। দেখতে দেখতে দশবারো দিনের মধ্যে প্রায় শ'দুই সত্যাগ্রহী জমে গেল। কেষ্টদার এক কাপ ঘিয়ে কি হবে। স্থির হল সংগ্রাম করতে হবে। অনশন ধর্মঘট শুরু হ'ল নানা দাবীতে।

খাওয়া ছাড়া আবার আরও দাবী ছিল নাকি ?

ছিল বৈকি। চান করতে হত পাঁচ ঘটি জলে। 'ডুবাও বা[illegible] —এই বোলের সঙ্গে তাল রেখে পাঁচ ঘটি মাথায় ঢালা হলেই তো[illegible] তারপর রাত্রে ঘুমানোর উপায় নেই। মেট কয়েদীরা পালা করে প্র[illegible] দেয়। দু'ঘণ্টা অন্তর এক দলের ডিউটি শেষ। এক এক ঘরে[illegible] চার কোণে। পনেরো মিনিট অন্তর এরা ডাক পেড়ে সব ঠিক অ[illegible] জানায়। এর মধ্যে ঘুমায় কার সাধ্যি।

মেট কয়েদী আবার কারা বীরুদা ?

ওঃ, জেলের মধ্যে আমরা তো ছিলাম 'রাজনৈতিক বন্দী'। এছাড়া চোর-ডাকাত যারা ছিল – যাদের কারো চার পাঁচ বছর থেকে আট দশ বছর জেল হয়ে গেছে— এদের মধ্যে পুরানো মাতব্বর কয়েদীদের বলতো মেট বা সর্দার কয়েদী—এরা আর সব কয়েদীদের উপর খবরদারি করত। তাদের নিয়ে যেত ক্ষেতে খাটাতে, গম পেষাই করাত, ঘানি টানাত এদের দিয়ে। রাত্রে এদের কতকগুলোর উপর জেগে অন্য কয়েদীদের পাহারা দেবার ডিউটি থাকত।

সেই 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি', না কি বল ?

ঠিক তাই।

তারপর কি হ'ল ? তোমাদের অনশনে ফল হ'ল ?

ফল হ'ল মানে ? একদিন না যেতেই জেল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট, জেলার, সিভিল সার্জেন, ম্যাজিস্ট্রেট সব এসে হাজির।

তারপর আলাপ আলোচনা ও সন্ধি। আমাদের দাবী ওরা মেনে নিলো। এরপর থেকে ভাল চালের ভাত দেওয়া হবে। ইচ্ছামত জল নিয়ে চান করতে পারব আমরা। রাত্রে হৈ চৈ করে আমাদের কেউ বিরক্ত করবে না। আমাদের ক্ষমতা দেখে অন্যান্য কয়েদীরা থ বনে গেল।

সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে ? সন্ধ্যেবেলায় আমরা বিজয়োৎসব পালন করলাম। থালা বাটি বাজিয়ে গান আর হৈ হল্লা চলল রাত দশটা অবধি।

আক্রাম ছিল ডাকাতের সর্দার। ধরা পড়ে ছয় বৎসর জেল হয়েছে। বছর চারেক কেটে গেছে। সে একজন মেট। স্বদেশীদের দেখাশুনা করত একদল কয়েদী। তাদের থালাবাটি কম্বল গুছিয়ে রাখা—ছোটখাট ফাইফরমাস খাটা এদের কাজ। মেথরের কাজ পর্যন্ত কয়েদীদের করতে হত। আক্রাম এদের নেতা।

আক্রামের প্রধান সহকারী ছিল হরিনাথ। সে জাতে নাপিত। সে মাঝে মাঝে আমাদের দাড়ি কামিয়ে দিয়ে যেত ব্লেড দিয়ে।

[illegible] দিন আক্রামকে বললাম, চাচা, জেলের মধ্যে ঐ যে আখ হয়েছে, [illegible] বড় লোভ হচ্ছে।

[illegible] বড় বড় করে বললে, অমন কাজটি করবেন না বাবু। আমাকে তো [illegible] কে জানাতে হবে। আর জেলার আপনাদের নির্যাতন করবে, নয়ত [illegible] মামলাও জুড়ে দিতে পারে।

[illegible] মধ্যে স্বদেশীদের ভালবেসে ফেলেছে। তাদের উপর নির্যাতন হোক তা [illegible]

আমরা [illegible] ম, চাচা, তুমি মেহেববাণী করলে সব হবে।

আক্রাম চুপ করে সরে গেল।

বিকালে জীবানন্দ আখ ভেঙে নিয়ে এল। আমরা সকলে এক এক খণ্ড হাতে নিয়েছি এমন সময় জেলারেব নিকট খবর গেল। জেল পুলিশ আসতে আসতে আমরা তৎক্ষণে যে যার সীটে গিয়ে বসে আখ খেতে লেগে গেছি। এমনি করে জেলখানার গাছের আম পেড়েও খেলাম একদিন।

তুমি এমন গল্প দিচ্ছ মনে হচ্ছে জেলখানা যেন মামা বাড়ী।

অর্থাৎ আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে থাক্ আর বলব না। আমি তো বলতে চাইনি।

তবে যে নির্যাতনের কথা শুনি সে সব কি মিথ্যে ?

না মিথ্যা হবে কেন ? যেখানে স্বদেশীরা সংখ্যায় কম সেখানে নানাভাবে অত্যাচার চলতো।

সেবার বিচারে আমাদের তিন মাস জেল হয়ে গেল। কয়েদী হয়ে গেলাম এখন থেকে। এক বুড়ো কয়েদী লিখে দিত কাকে কাকে সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হবে। আমরা ধরলাম তাকে।

একটা ব্যাচে আমাদের দশ বারো জনকে পাঠান হচ্ছে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে। রাত দশটা। আমরা দু'জন দু'জন করে একটা হ্যাণ্ডকাপ দিয়ে বাঁধা। সশস্ত্র পুলিশ আমাদের ঘিরে নিয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং সাহেব এস. পি. সাইকেলে চলেছেন আমাদের সাথে। আমরা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। রেগে এস. পি. একজনের গলা টিপে ধরে গালাগাল দিতে লাগল।

রিণী মা।

এই যে জেঠু।

ও, সুবীরও আছ। আজ দোকান যাওনি।

না জ্যাঠামশাই, একেবারে খেয়ে দেয়ে সে বেলায় যাব। বড় ক্লান্ত লাগছে আজ।

সেই ভাল। আবার কাল থেকে তো চুকনগরের মিটিং এর [illegible] করতে হবে। সব ভারই তো আমাদের উপর দিয়ে গেলেন ওঁরা।

সেই কথাই তো হচ্ছিল রিণীর সঙ্গে।

বেশ বেশ তোমরা দুজনে পরামর্শ করে একটা প্রোগ্রাম ঠিক ক[illegible] আমাকে একবার দেখিও।

শুনলে তো রিণী। তুমিই একটা খসড়া করে ফেল আগে, [illegible] রিণী এদিক দিয়ে খুব এক্সপার্ট। ও না থাকলে সেদিনের [illegible] ম্যানেজ করতে পারতাম না। কত ভুল যে ও শুধরে দিয়েছে।

রিণী কটমট করে একবার তাকাল সুবীরের দিকে। ইতিমধ্যে খুব চোস্ত হয়ে উঠেছে। জেঠুর কাছে কিরকম মিথ্যা বলে যাচেছ। দাঁড়াও ফাঁক পেলে মজা দেখাচ্ছি তোমার—চোখের ইঙ্গিতে সেই কথা জানিয়ে দিয়ে ও বেরিয়ে গেল। যেতে-যেতে বললে, আপনি বসুন, আমি আপনার তামাক নিয়ে আসছি জেঠু।

॥ ৪ ॥

বিকালে এসে সুবীর দোকান খুলে বসেছে। কাজকর্ম কিছু নেই আজকাল। তবু খুলে বসতে হয়। যদি কোন চাষী টাকা দাদন নিতে আসে তবে তাকে টাকা দিতে হয়। খোঁজ-খবর রাখতে হয়, কোন গ্রামে এবার চাষীরা কেমন পাটের চাষ করছে। কে কতটুকু জমিতে পাট বুনল।

দোকানের মালিক রবিন বোস ওকে খুব বিশ্বাস করেন। দাদন দেবার জন্য টাকা পয়সা দিয়ে যান। হাটবারের দিন ছাড়া তিনি দোকানে থাকেন না। পাটের কেনাবেচা আবার সেই ভাদ্র-আশ্বিনে জোর চলবে। তখন অবশ্য রবীনবাবু প্রায় সব দিনই থাকেন। সপ্তাহে দু'দিন গুদাম ভর্তি হলে নৌকা করে দিয়ে আসেন বড় মোকাম দৌলতপুরে। সেখানে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা বসে। তাদের আড়তে মাল পৌঁছে দেওয়া, টাকা পয়সা আনা—এ কাজটা রবীনবাবুই করেন।

এখন যেটা বড় কাজ তা হল চাষী ধরা। চাষের খরচের জন্য চাষীরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ টাকা দাদন নেবে। শর্ত হল সেই চাষীর সব পাট ঐ মহাজনকে দিতে হবে, অন্য আর কাউকে দেওয়া যাবে না। অধিক পাট সংগ্রহ করা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হলে এই ভাবে দাদন না দিলে চলবে না। এজন্য গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়।

[illegible] সুবীর ভাবছিল, বেশ তো ছিল সে এইসব নিয়ে। বউ [illegible] কিছুরইতো অভাব ছিল না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে [illegible] এইসব দেশের কাজে। কেমন ভাবে জড়িয়ে গেল তাই [illegible]

[illegible] গিয়েছিল নদীর ওপারে গৌরীপোতা গ্রামের চাষীদের [illegible] দেখা [illegible]তে। জহির মোড়লের সংগেও দেখা হয়েছিল।

[illegible] চাচা—কেমন আছ ?

[illegible] আছি বাবু। তা ক'নে চলেছ ?

এই আলাম একবাব তোমার গে খোঁজ খবর নিতি। তাও কি আসতি নেই নাকি। সুবীর চাষী পাড়ায় গেলে ওদেরই মত কথা বলে।

মোড়ল হা হা করে ওঠে। সে কি কথা বাবু। তোমরা আসবা সে তো আমাগের ভাগ্যি।

সে কথা কেন কচ্ছ চাচা। আমরা তোমাগের ছাড়া কবে আছি ? মোড়ল অস্বীকার করতে পারে না। বলে তা সত্যি বাবু, তুমি তো ঘরের ছাবালের মত। সব সময় আমাগের হিল্লে-হদিস কর।

তা যাক্ চাচা। সুবীর এবার কাজের কথা পাড়ে। চাষবাসের খবর কি ? জমিতি হালটাল করছ তো।

এই তো সেদিন বৃষ্টি হ'ল বাবু। এইবার চষতি হবে। চষা শুরু করা হয়েছে।

তা কতটা জমিতি এবার পাট দেবে ভাবছ ?

ভেবেছিলাম তো বিঘে দশেক মত জমিনে পাট বুনব, তবে পাট চাষে তো খরচ আছে বাবু। যা ঘাস হয়। নিড়ানোর সময় তো কমপক্ষে দু'শো টাকা চাই।

টাকার অভাব হলে কইও চাচা। আমরা কি জন্যে আছি। টাকা যা লাগে দেওয়া যাবে।

তা তো বুঝি বাবু। তবে টাকা নিয়ে ফসল না করতি পারলি তো ফাঁপরে পড়ে যাব।

আরে ফসল হবে। ফসল কেন হবে না। খোদাতালার উপর ভরসা রাখ। মনিরুদ্দি কনে ?

সে মাঠে গেছে হাল নিয়ে।

মনিরুদ্দির সাথে সুবীরের খুব ভাব। একসাথে স্বদেশী করেছে মাঝে মাঝে। খেলাধূলো, আড্ডা দেওয়া, তাস পিটা—মনিরুদ্দি ছিল ওর ঘনিষ্ট সঙ্গী। সুবীর তখন এই গ্রামেই ওর মামার বাড়ী থাকত। মনিরুদ্দির ঠাকুরমাকে ও দাদী বলে ডাকত।

বৈকালে কাঁঠালতলার বাজারে ওরে বেড়াতে যেতি কইও চাচা। [illegible] আছে ?

না মার শবীল ভাল না। বুড়ো মানুষ। আর বে[illegible] নেই। বাড়ীর দিকি আইস, বাবু।

না, চাচা। পাড়ার উপব দি.য় একটু ঘুরে ঘুরে যাই। আমি [illegible] একদিন আসব চাচা, দাদীকে দেখে যাব।

বেলা প্রায় বারোটা পর্যন্ত ঘুবে ঘুরে গ্রামে হিন্দু মুসলমান চাষীদের অনেকের সঙ্গেই দেখা সাক্ষাৎ করে দাদনেব টোপ ফেলে এসেছে। আগামী একপক্ষ [illegible] মধ্যে আশে পাশেব দশ বারোখানা গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওকে দাদন বিলির ব্যবস্থা করতে হবে। দাদনের টাকা পয়সা যা লাগবে তা অবশ্য মূল মালিক রবীন বোসই দেবেন। তবে খাটা খাটুনী যা করার তা সুবীরের উপর। গ্রাম থেকে মাল যোগাড়ের ব্যবস্থা, বে-হাটবারের কেনাকাটা, দোকান আগলে থাকা।

সুবীরের ফিবতে বেলা বারোটা গড়িয়ে গেছে। তারপর দুটো ভাতে ভাত ফুটিয়ে খেয়ে দেয়ে এইমাত্র উঠল।

ফাল্গুনের শেষ। এখনও তিন চারদিন বাকী মাস যেতে। ইতিমধ্যে বেশ গরম পড়ে গেছে। বাইরে রোদের দিকে যেন চাওয়া যায় না।

সামনে সুবল পরামাণিকের চা, পান বিড়ির দোকানে বাঁশচালীতে তাসের আড্ডা জমিয়েছে বাজারের ছেলে ছোকরারা। সুবলের ছোট ভাই পলটা বসে আছে দোকানে, খদ্দের কেউ এলে সেই ঠেকাবে। তারও চোখ এবং মন তাসের দিকে।

গামছায় হাত মুছতে মুছতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুবীর হাঁকলে, এই পলটা, পলটারে।

পলটা ফিরে চাইল। তারপব ঘাড়টা উঁচু করে পিছন দিকে মাথাটা টেনে বুঝতে চাইল, সে কি করবে।

সুবীর হাঁকলে, এক প্যাকেট বিড়ি আর এট্টা পান দিয়ে যা তো।

দোকানের বারান্দার একপাশে একটা চৌকি পাতা। তার উপর মাদুর বিছিয়ে ক্যাস বাক্স নিয়ে সুবীর বসে। হাটবারে বসে রবীন বোস। দোকানের সামনে দুটো বাঁশের খুঁটি। ওতে কাঁটাপাল্লা টাঙানো হয়—পাট মাপার জন্য।

সুবীর চৌকিতে মাদুরটা বিছিয়ে তার উপর বালিসটা পেড়ে নিল।

পলটা পান বিড়ি নিয়ে এল। পান মুখে দিয়ে বিড়ি ধরাল সুবীর। বালিসটার উপর পা দুটো তুলে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে বিড়ি টানতে লাগল। বাইরে রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। রোদের ঝাঁঝটা যেন ওর বিছানায় এসে লাগছে। সুবীর ভাবছে

ভিতর মেঝেয় শুলে কেমন হতো। তবে একে তো মাটির মেঝে, কাল নিকানো হয় না। এক কোণে আবার দুপুর বেলায় ও এক খায়। কোন মতে ঝাঁটা দিয়ে ঘরটা একবার ঝাট দিয়ে নেওয়া—আর জল ছাড়া আর কিছু হয়ে ওঠে না। বেটাছেলের দ্বারা এসব সারা ঘরটায় এটা সেটা নানা জিনিসপত্তর। কেমন একটা মেটে আর পাটের রাগ মিশানো গন্ধে ঘরটা ভরপুর।

শুতে বিশ্রী লাগে সুবীরের। কেমন যেন গার মধ্যে ঘিন ঘিন হয়ে আসতে চায়। তার চেয়ে রোদ্রের ঝাঁঝ অনেক ভালো। প্রাণ-ভরে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। বেশী গরম পড়লে চৈত-বোশেখে কাপড় টাঙিয়ে একটু ঘিরে নিলেই হবে।

ওদিকে পলটাদের দোকানে তাসের আড্ডার চিৎকার শোনা যাচ্ছে। 'টেক্কা তুরুপ', ওরা বিন্তি খেলছে। মাঝে মাঝে সুবীর গিয়ে জোটে। আজ আর যেতে ইচ্ছে করছে না। গ্রামে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

ভাল লাগেনা সুবীরের এই কাজ। কি এর ভবিষ্যৎ। সে ধীরে ধীরে ভাল পাট ব্যবসায়ী হবে। লাভের টাকা থেকে চাষের জমি কিনবে দু'দশ বিঘে। সেই চাষ আর ব্যবসায়ে ওর সংসার চলে যাবে। সংসার বলতে ওর স্ত্রী আর একটা ছয় মাসের শিশু। প্রায় দেড় বছর হল বিয়ে করেছে।

বিয়ে করার ইচ্ছে ছিল না ওর। মামা-মামী তাড়িয়ে দেওয়ার পর একমাত্র আড্ডাখানা জ্যোতিষ মজুমদারের বাড়ী।

স্বদেশী করা ছেলেমেয়েদের অনেকেরই ওখানে আড্ডা। এইসব নিষ্কর্মা বাউণ্ডুলেদের সকলেই অবশ্য সুবীরের মত নিরাশ্রয় নয়। আড্ডা দিয়ে ঘরে ফিরে বাবার হোটেলে গিয়ে দুটো খেতে পায়। সুবীরও মামার হোটেলে ফিরে যেত। তারপর মামা-মামী তাড়িয়ে দেওয়ার পর আর যাওয়ার জায়গা রইল না।

ব্যাপারটা জ্যোতিষবাবুর কানে যেতেই তিনি সুবীরের খোঁজ করে ডেকে পাঠান।

সুবীর এসে দাঁড়াতেই বললেন, কি সুবীরের যে আর খোঁজ খবরই পাওয়া যায় না। কোথায় ছিলে এই দু'দিন? এমনি করে তোমরা দেশের কাজ করবে নাকি?

সুবীর কোন কথা বলে না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে না জ্যোতিষবাবু সব শুনেছেন কিনা। না থাকলে কি ভাবে বা তাঁকে বলা যায় প্রকৃত ঘটনা।

একটু চুপ করে থেকে জ্যোতিষবাবু বললেন, তা হলে মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল?

মুখ না তুলেই সুবীর বুঝতে পারে জ্যোতিষবাবু সব জেনেছেন। [illegible] হাসছেন তিনি।

এই একটা লোক যাকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত [illegible] করা যুবকেরা নিজেদের মধ্যে দেশের কাজে উৎসাহটা আজও কিছুটা জাগি[illegible]।

সদা হাস্যময় ধীর স্থির শান্ত চেহারার মানুষটি এই জ্যোতিষবাবু। [illegible]টা চেহারা। বিপত্নীক। নিজের ছেলেমেয়ে নেই। ভায়েদের নি[illegible]। সংসারে মা, দু'ভাই, তাদের সাত আটটি ছেলেমেয়ে। জমিজমা [illegible] ভাইয়েরা চাষবাস দেখে। অবসর সময়ে সবাই মিলে রাজনীতির চর্চা [illegible]।

জ্যোতিষবাবু নিজে একটু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারি করেন। দু'চারটে রোগী পত্তর এলে একটু ঔষধপত্র দেন। টাকা পয়সা— দু এক টাকা কেউ দিলে নেন, না দিলে কারুর কাছে চান না। অবশিষ্ট সময় বাইরের ঘরে বসে দিনরাত গল্পগুজব আড্ডায় সময় কাটান। ঘন ঘন গড়গড়ায় তামাক খান।

মিষ্টি অথচ একটু গম্ভীর স্বভাবের মানুষ জ্যোতিষবাবু। সবাই তাঁর কাছে যেতে, মেলামেশা করতে পারে। অথচ তাঁর সামনে বাচালতা করা চলে না। এতদঞ্চলের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করে। জ্যোতিষবাবুর কথার ভঙ্গীতে সুবীর সাহস পেল। মুখ তুলল। কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না।

জ্যোতিষবাবু বললেন, তা এ দু'দিন কোথায় কাটালে ?

বরাতিয়ার জিষ্ণুদাদের বাড়ী।

তা ওখানে আর কদিন থাকবে ? না, স্থায়ী আড্ডা গাড়া যাবে।

না, কোথাও একটা ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

কিছু ভেবেছ ?

না।

তোমাদের মত ছেলেকে কে রাখবে ? না জান মজুর খাটতে, না আছে অন্য কোন কাজের অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতার মধ্যে তো দু'একবার জেল খাটা। বলে হাসতে লাগলেন।

অনেক কষ্টে সুবীর বলে ফেললে— আপনি একটা ব্যবস্থা করে দেন। ও মামার কাছে আর ফিরে যাব না।

সুবীরের কথা শুনে জ্যোতিষবাবু আর একবার হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে। ভাবনা কি ? ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। আজ থেকে আমার এখানেই থাক যতদিন না অন্য ব্যবস্থা হয়।

তদবধি সুবীর সেইখানেই আছে। কিছু না করে বসে বসে খাওয়া পাপ।

[illegible] রূপ হয়ে থাকা—জ্যোতিষবাবু বলেন। তিনি চেষ্টাচরিত্র করে এই [illegible] দিয়েছেন সুবীরকে। নিজের ছোট ভাইয়ের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে [illegible] কাঠা জমি রেখে দিয়েছেন বাড়ীর পাশে। ভবিষ্যতে পৃথক বাড়ী করে [illegible]

[illegible] একাজে ঠিক আনন্দ পায় না। কিছু করতে হবে তাই করছে। [illegible] মনেতে এইসব এলোমেলো ভাবছিল সে।

[illegible] লোক। ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে। এই খর- [illegible] তপ্ত রাস্তায় হাঁটিতে হয় সে নিতান্ত হতভাগ্য। সুবীরের একবার [illegible] প্রায় বারোটা পর্যন্ত সেও আজ গ্রামে গ্রামে ঘুরেছে। শরীরটা বেশ [illegible] মনে হচ্ছে। মাথার মধ্যে দপ্‌দপ্‌ করছে। আবার ভাবলে, না, চাষীরা তো এই রৌদ্রের মধ্যে মাঠে হাল করছে। সেও অনেক দিন এই রৌদ্রের মধ্যে খেটেছে মামার বাড়ী থাকতে। কখনও কখনও জমি কোপান, জমিতে হাল দেওয়া, কিষেণদের জন্য ভাত, জল ও আগুন তামাক নিয়ে যাওয়া—এগুলো তো করতেই হত। তথাপি মামার মন পায়নি।

সেদিন সুবীর প্রায় কাঠাদশেক জমি কুপিয়েছে। সকাল থেকে কোদাল ধরে জমিতে কাজ করতে করতে সুবীরের হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল। হাতটা জ্বালা করছিল। আসলে কোদাল নিয়ে কাজ করার তেমন অভ্যাস ছিল না।

মনিরুদ্দি এসে ডাকলে, চল বিশ্বেসদের বাগে নারকেল পাড়তি যাচ্ছি। ডাব খাওয়াবো—চল।

বিশ্বাসদের আম-কাঁঠাল, নারকেল-সুপুরির প্রকাণ্ড বাগান। মনিরুদ্দির ডাক পড়ে মাঝে মাঝে গাছে উঠে ফল পাড়ার জন্য। পাড়ানী হিসাবে গাছ প্রতি একটা নারকেল পাবে ও। হিসাবের বাইরেও দু'চারটা নিয়ে বাড়ী ফেরে মনিরুদ্দি।

রোদে সুবীর আর কোদাল চালাতে পারছিল না। মনিরুদ্দির সঙ্গ নিল। ডাব খাওয়ার প্রস্তাবটা মনেও ধরল।

ঘুরতে ঘুরতে প্রায় একটা বেজে গেল। মনিরুদ্দি ছাড়ে না। বলে আর একটু দাঁড়া। আর কটা গাছ বাকী। শেষ করে একসাথে চলে যাব। তুই চলে গেলে আমার একা একা ভাল লাগবে না।

মামা মাঠ থেকে কিছু আগে ফিরেছে। মামী প[illegible]ান করে লাগিয়েছে। তোমার গুণধর ভাগ্নে সেই বেলা নয়টা না বাজতেই মনিরুদ্দির সাথে কনে আড্ডা দিতি গেছে।

বাড়ীতে পা দিতেই মামা পথ দেখিয়ে দিল, বের হও এ বাড়ী থেকে। আজ্ঞা

মেরে—বেড়াবে— আর খাবার সময়ে এসে কাড়িকাড়ি গিলবে। অমন আলফো [illegible] আমার নেই।

অস্নাত অভুক্ত ক্ষুধার্ত সুবীর বেরিয়ে এসেছিল একবস্ত্রে। আর [illegible]ন। সেদিনকার কথা মনে হলে চোখ দিয়ে জল এসে যায় যেন।

সুবীরের আর পরিশ্রমের শক্তি নেই যেন। ব্যবসা করতে বসে যেন একটু আরাম-প্রিয় হয়ে যাচ্ছে। রোদে যাওয়াকে ভয় পায়। অথচ লক্ষ লক্ষ কৃষক যদি রোদে জলে না খাটত তবে দেশের লোকের আহার জুটত কি করে। সুবীর নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে দূরের সেই লোকটা সুবীরের দোকানের কাছাকাছি এসে পড়েছে। গায়ে মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবী। পায়ে স্যাণ্ডেল। কাঁধে ঝোলান একটা সাইড ব্যাগ। লম্বা পাতলা চেহারার মানুষ। সুবীরের মনে হোল যেন লোকটা চেনা।

কেষ্টদা না? না সুবীর চোখদুটো কুচকে রাস্তার মাঝে ছুঁড়ে দেয়। চোখের উপর হাতের চেটো নৌকো করে রোদ সরিয়ে ও দেখতে চায়। তাইতো, অবিকল কেষ্টদার মত। অথচ এই সময় এই পথে তাঁর যাওয়ার কথা কল্পনাই করা যায় না। সে কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে নাকি? ভদ্রলোক পলটাদের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাসের আড্ডার একজনকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞাসা করলেন। সে তখন আঙুল দিয়ে সুবীরকেই দেখিয়ে দিচ্ছে।

ভদ্রলোক এবার ফিরে সুবীরের দিকেই আসতে থাকলেন। না, আর সন্দেহ কি। কেষ্টদাই বটে। সেই দীর্ঘ ছয় ফুট লম্বা ছিপছিপে দেহ, উন্নত বিস্তৃত ললাট। মাথার চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া ছোট করে ছাটা। জ্বলজ্বলে দু'টো চোখ। মুখে মৃদু হাসি লেগে আছে। সুন্দর চেহারার মানুষ। রোদে মুখখানা লাল হয়ে গেছে।

সুবীর ছুটে গিয়ে পথের মাঝেই প্রণাম করলে।

কেষ্টদা আপনি? আপনাকে এখানে এমনভাবে দেখব স্বপ্নেও ভাবিনি। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না।

কেষ্টবাবু সুবীরের কাঁধে হাত রাখলেন। তাতেই যেন অনেক কথা বলা হয়ে গেল। একান্ত আপন কর[illegible]নিলেন যেন তিনি ওকে।

স্মিতমুখে আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বারান্দায় উঠলেন। চৌকিটাতে বসে বললেন, পাখা আছে? দরদর করে ঘাম ঝরছে কপাল, মুখ, গলা, হাত পা থেকে। যেন চান করে উঠেছেন। পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালটা, মুখটা মুছে ফেললেন। নোনা ঘামের দু'একটা ফোঁটা চোখের ভিতর ঢুকে গিয়ে জ্বালা করছে।

সুবীর ঘর থেকে পাখা নিয়ে এসে বাতাস করতে লাগল। কেষ্টবাবু হাত বাড়ালেন, দাও।

আমি বাতাস করে দিই, কেষ্টদা। সুবীর বললে।

কেষ্টবাবু চোখ তুলে চাইলেন সুবীরের দিকে। সেই দৃষ্টিতে যেন স্নেহের সঙ্গে ভর্ৎসনা মাখা। যেন বলতে চাইছেন আমি গুরুঠাকুর নই। তোমাদের সঙ্গে আমার চেলা গুরুদেবের সম্পর্ক নয়।

বললেন, না, দাও আমাকে।

সুবীর কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে পাখাটা কেষ্টবাবুর হাতে তুলে দিল। কেষ্টবাবু সুবীরের অপ্রতিভ ভাবটা লক্ষ্য করলেন। হাসিমুখে বললেন, তুমি বরং এক কাজ করো সুবীর। এক গ্লাস জল নিয়ে এস। আমি হাত মুখটা ধুয়ে ফেলব একবার।

সুবীর জল নিয়ে এল। হাতে ধরে দাঁড়াল।

বললেন, রাখ। অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় সুবীরের মনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা থিতিয়ে এসেছে।

কেষ্টবাবু বললেন, তা প্রায় সাত আট বছর হয়ে গেল তাই না, সুবীর?

সুবীর সায় দিয়ে বললে—তা আট বছর হয়ে গেল। সে ছিল ত্রিশ সালের শেষের দিকের কথা। আর এ'তো উনচল্লিশে পড়ল।

এতোদিন পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হওয়ায় কি যে আনন্দ হচ্ছে।

এমনভাবে যে আজ দেখা হয়ে যাবে, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি কি আর ভেবেছিলাম যে আমাকে এই দিকেই আসতে হবে। তা এসে দেখছি যে ঠকিনি। তোমাদের মত কিছু পুরানো স্বদেশী কর্মী ভাইয়েরা এদিকে আছে তা তো জানতামই না। আমার খুব ভাল লাগছে। তা খবর কি বল। কেমন আছে সব?

ভালই আছি।

এখানে সে সময়ের আর কে কে সব কর্মী ভাইয়েরা আছে। আছে অনেকে। তবে আপনার সঙ্গে তো তাদের কখনও দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। সেবার জেলখানায় তো শুধু মন্মথ ও আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তাই হবে অনেকেই তো ছিলে তোমরা। তবে কোন অঞ্চলের কে আজ আর তা সঠিক মনে নেই। আমি তো ভাবছিলাম তোমরা ভুলে গেছ। দেখলে চিনতেই পারবে না।

কেষ্টবাবু একটু সহজ হয়ে এসেছেন। হাতমুখ ধুয়ে পাখার বাতাস খেয়ে এখন ওকে বেশ প্রফুল্ল ও সতেজ দেখাচ্ছে।

সাহস পেয়ে সুবীরও সহজ ভাবে বললে. আপনাকে কি ভোলা যায় ? যা ঘি খাইয়েছিলেন। আপনার ঘি না পেলে সেবার না খেয়েই মারা যেতাম।

কেষ্টবাবু হেসে উঠলেন। বললেন, তবেই দেখ সুবীর কোন জিনিস কি কাজে লাগে। সরকার ঘি বরাদ্দ করল রাজবন্দীদের ভোলাতে। রাজবন্দীরা সেই ঘি দিয়ে স্বদেশী ছেলেদের জয় করলে। দলভারী করে নিল। যাক্, তারপর কেমন আছ, বল।

ভালই আছি।

কি করছ আজকাল ?

কি আর করব ? এই একটু পাটের ব্যবসায়ে লেগে গেছি।

কেমন লাগছে ?

সে আর বলবেন না। মোটেই ভাল লাগছে না।

কেন ?

এমনি করে পাট কেনা-বেচা করে জীবন কেটে যাবে। ভাবতেই কেমন লাগে।

কি করতে চাও তবে ?

কি যে করব, আর কি করতে পারি, তাও তো জানি না। ইংরাজ বিতাড়িত হবে, দেশ স্বাধীন হবে—অনেক আশা, অনেক উৎসাহ নিয়ে—ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম কংগ্রেসের আন্দোলনে। লক্ষ্য সিদ্ধ হল না, আন্দোলনও থেমে গেল। সুভাষ বোসও বিতাড়িত হলেন। এই নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হবে আজ আর সে বিশ্বাস নেই। খদ্দর পরে চরকা কাটতে বসার প্রতি আর শ্রদ্ধাও নেই, রুচিও নেই। তাই কোন-মতে দিন যাপনের গ্লানি বয়ে চলেছি।

তোমার কথা দেশ-সেবাব্রতী কর্মীর মত হল না। সত্যিকার কর্মী নেতা খুঁজে নেয়। নেতার উপর দোষারোপ করে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। যাক্, গ্লানি বোধ করছ কেন ?

আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। গরীব চাষীদের বঞ্চিত করে পাট ব্যবসায়ে লাভ করে ভাল খেয়ে পরে বাঁচব এর সঙ্গে মনকে মিলাতে পারছি না। তাই শান্তিও পাচ্ছি না। আবার সত্যিকার কর্মী হওয়ার মতো শক্তিও নেই। আপনি যে কথা বলছিলেন।

না-না, তুমি ভুল করছ, সুবীর। তোমাদের মধ্যে যে আগুন আমি দেখেছি, সে তো মিথ্যে হতে পারে না। তবে অনেক সময় এমন হয়। ঠিক পথটা বেছে নিতে একটু সময় লাগে। চৌরাস্তার মোড়ে এসে নতুন পথিককে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয়। জেনে বুঝে ঠিক পথটা চিনে আবার চলা শুরু করতে হয়। তবে লক্ষ্যটা মনে রাখা চাই। নতুবা পথ ঠিক করবে কোন নিরিখে।

লক্ষ্য তো আমাদের ঠিকই আছে কেষ্টদা—পূর্ণ স্বাধীনতা।

কেন? স্বাধীনতা নিয়ে কি হবে। নাই বা হলে স্বাধীন—ক্ষতি কি?

স্বাধীনতা না পেলে দেশের এই লক্ষ লক্ষ গরীব চাষী মজুর মধ্যবিত্ত এদের অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। এরা শিক্ষা পাবে না, চিকিৎসা পাবে না। মানুষের মত খেয়ে পরে বাঁচতে পারবে না।

ঠিক বলেছ সুবীর, অর্থাৎ এমন সমাজব্যবস্থা আমরা চাই যার মধ্যে দেশের অগণিত দরিদ্র নিষ্পেষিত শোষিত মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারে। তার জন্য দেশ স্বাধীন হবার দরকার হলে দেশ স্বাধীন হবে। না হলে হবে না। আর সেই অধিকার কেউ হাতে তুলে দেবে না। সংগ্রাম করে আদায় করে নিতে হবে।

কারা করবে সংগ্রাম?

যাদের অধিকার, প্রয়োজন, তারাই করবে—সেই কৃষক শ্রমিক মজুর মুটে কুলি সবাই।

কাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম?

যাদের দ্বারা আজ তারা প্রত্যক্ষভাবে শোষিত নির্যাতিত হচ্ছে। সেই জমিদার, মহাজন অসৎ ব্যবসায়ী ধনী সম্প্রদায়। এমনি করে এক একটা বাধা অপসারিত হবে। নূতন বাধা আসবে—সাম্রাজ্যবাদ যখন বাধা হয়ে দাঁড়াবে তখন তার বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করে তাকে হটিয়ে দিতে হবে।

কতদিন চলবে এই সংগ্রাম?

যতদিন না সর্বহারাদের কর্তৃত্বে তাদের স্বার্থে সমাজব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না, সুবীর বলে।

কেন? তোমার খটকা কোথায়।

ঐ জমিদার মহাজন, ধনী সম্প্রদায়—ওরা তো সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষপুটে আশ্রিত। তাই সাম্রাজ্যবাদের উৎখাত না করে এদের খতম করা যাবে কি করে? ওদের রক্ষার্থে সাম্রাজ্যবাদী সরকারই তো এগিয়ে আসবে।

এলে আমাদের যা আছে তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াতে হবে—সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের কি আছে? রাইফেল গোলাগুলির বিরুদ্ধে কি শুধু হাতে সংগ্রাম হবে?

তুমি ভুল করছ, সুবীর। রাজশক্তির বিরুদ্ধে সেই রাজশক্তির সীমানার মধ্যে থেকে সংগ্রাম করতে হলে তার প্রধান হাতিয়ার গণচেতনা। বিপ্লবীরা এ কথাটা বোঝেনি বলে তারা ব্যর্থ হয়েছে। বাইরে থেকে অস্ত্রশস্ত্র সৈন্য সংগ্রহ করে ব্রিটিশ

শক্তিকে যুদ্ধে পরাজিত করার স্বপ্নও বিফল হতে বাধ্য। গণ জাগরণ আনতে হবে। আর সে জাগরণ স্বাধীনতার ফাঁকা বুলিতে আসবে না। খাওয়া পরা বেঁচে থাকার একান্ত প্রয়োজন ও সমস্যার মধ্য দিয়ে সেই চেতনা জাগাতে হবে। যেখানে সকলেরই স্বার্থ প্রত্যক্ষগম্য। তাই আমাদের কাজ নতুন করে শুরু করতে হবে। আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে কৃষক মজুর সর্বসাধারণকে নিয়ে—সেইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে যার মধ্যে তাদের প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত হচ্ছে। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে তারা কিভাবে শোষিত হচ্ছে। দলবদ্ধভাবে সেই শোষকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে জাগবে গণচেতনা, যার আঘাতে একদিন ভেঙ্গে পড়বে কায়েমী স্বার্থের সব দুর্গ। স্বাধীনতা সেদিনই হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ফরাসী বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লবের ইতিহাস পড়, সব বুঝতে পারবে।

সুবীরের কাছে এ সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা। সব জিনিসটা ভাল করে বুঝতে না পারলেও সে যেন একটা নতুন আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছে।

সে বললে, তা হলে এখন কিভাবে কাজ শুরু করতে চান?

বলব, সেই কথাই তো বলব বলে এসেছি। আজ সন্ধ্যায় জ্যোতিষবাবুর ওখানে একটা আলোচনা সভা করতে চাই। সর্বপ্রথম আমাদের একটা কর্মীদল গড়ে তুলতে হবে। কাজ যারা করবে—তাদের আগে চাই। তারপর কি কাজ কেমনভাবে করতে হবে তা ভেবে দেখা যাবে। তোমরা একদিন সারা দেশের কাজ করেছ—কংগ্রেসের নির্দেশে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছ বা অন্যান্য যুবকেরা যারা দেশের কাজ করতে চায় এমন কিছু লোক আমার সাথে পেলে আমি এই অঞ্চলের সাধারণ লোকের মধ্যে, দীন দরিদ্র চাষী মজুরদের মধ্যে নামতে চাই। তোমরা আসবে আমার সঙ্গে?

নিশ্চয়ই আসব। উৎসাহ ভরে সুবীর বলে। কেষ্টবাবুর উপর তার পূর্বশ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়।

তাহলে আজ সন্ধ্যায় তোমার বন্ধুবান্ধব যারা দেশের কাজে নামতে চায়—তাদের ডেকে নিয়ে জ্যোতিষবাবুর ওখানে হাজির হও। আমি আর একটু এগিয়ে চুকনগর পর্যন্ত ঘুরে যথাসময়ে ফিরে আসব। সেখানে আলোচনা করে কর্মপন্থা স্থির করা যাবে।

আপনি তাহলে এখনই উঠবেন?

হ্যাঁ, আর দেরী করব না। যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। এক গ্লাস জল খাওয়াও।

আচ্ছা, বলে সুবীর ঘরের মধ্যে গেল। আবার সেই মুহূর্তে ফিরে এসে বললে, কিছু যদি মনে না করেন তবে একটা ডাব নিয়ে আসি।

ওঃ, ঘি'র প্রতিদানে ডাব? হো হো করে হেসে উঠলেন কেষ্টবাবু।

সুবীর একটু লজ্জিত হলো। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল; তার আগেই কেষ্টবাবু বললেন, ঠিক আছে, তাই আনো। তবে ডাবের জল তো এই রোদে গরম হয়ে গেছে।

না, না, গরম হবে কেন। ঐ দোকানের ভেতরে বেশ ঠাণ্ডা জায়গায় ওরা ডাব রাখে। আমি নিয়ে আসছি, দেখুন না খেয়ে। বলেই সুবীর এক ছুটেই বেরিয়ে গেল।

হাটের একপ্রান্তে সুবীরের দোকান। পাশে একফালি চষা জমি। তার ওধারে গৃহস্থের বাড়ী। বেড়ার ধার দিয়ে আম কাঁঠাল ও নারকেল গাছের সারি। ছায়াতে আনারস গাছের ঝোপ। আমের গুটিগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে ছোট বেলায় কাঁচা আম লবণ লংকা দিয়ে জারিয়ে বা কাসুন্দি মেখে খাওয়ার কথা মনে পড়ল কেষ্টবাবুর। আজও খেতে ইচ্ছে করে। সে সময় ও সুযোগ আর হয়ে ওঠে না।

বি. এ. পড়তে পড়তে কংগ্রেসের ডাকে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই উনিশ বিশ সালে। তারপর জেলে জেলে। কখনও বা রাজবন্দী হয়ে জেলে বা থানায় থানায় অন্তরীণ হয়ে অনেকদিন কেটেছে। সেই অবস্থায় তিরিশ সালে খুলনা জেলে দেখা সুবীরের সঙ্গে।

না, কংগ্রেসের প্রতি আর আস্থা নেই। চোরা গোপ্তা সন্ত্রাসের উপরও নেই। গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গণ জাগরণ ঘটাতে হবে। এই অঞ্চলের কৃষকদের মধ্যে কাজ করার জন্য তাকে পাঠান হয়েছে। অথচ গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করার কোন অভিজ্ঞতাই নেই বলতে হবে।

চষা ক্ষেতের মাঝে রোদ যেন ধেই ধেই করে নাচছে। জ্বলন্ত মাঠটা থরথর করে কাঁপছে। এরই মাঝে একজন চাষী লাঙল কাঁধে গরু দুটিকে খেদিয়ে নিয়ে বোধ হয় ফিরে যাচ্ছে। মাথায় ছোট একটা মাথালি। হাতের পাচনি দিয়ে গরু দুটিকে কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। এই রৌদ্রে বেলা আড়াই প্রহর পর্যন্ত লাঙল চষার পর মেজাজ ঠিক থাকে না।

একটানা একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে। ঘুঘুগুলো এমনি দুপুরবেলাতেই ডাকে। ওরা বোধহয় এই গরমে ক্লান্ত হয়ে চীৎকার করে। কিংবা হয়ত এই গরমই ওদের পরম কাম্য। মনের আনন্দে সঙ্গীকে আহ্বান জানায়।

কেষ্টবাবু উঁকিঝুকি মেরে দেখলেন ঘুঘুটা কোথা থেকে ডাকছে। দেখা গেল না। একটা কাঠবিড়ালী সুড় সুড় করে আমগাছটা বেয়ে উপর দিকে উঠে যাচ্ছে। খানিক উঠে থেমে গিয়ে লেজটা উঁচু করে কাঁপাতে থাকে। ভারী সুন্দর দেখতে। ছোটবেলায় ওদের দেখলেই ঢিল ছুঁড়তে ইচ্ছা করত।

সুবীরের ফিরতে একটু দেরী হোল। ও ডাবটা কেটে এনেছে। তবে মুখটা ফাটায়নি। মুখটা কাটিয়ে একটা গ্লাসে ঢেলে দিল জলটা।

কেষ্টবাবু জল খেয়ে বললেন, না, জল বেশ ঠাণ্ডা আছে। এত বড় ডাব। এখানে এর দাম কত ?

এক আনা করে বিক্রি হয়। তাও খদ্দের কোথায় ? দিনে দু'একটা বিক্রি হয় পথচারীদের কাছে। আর হাটবারে কিছু বিক্রি হয়।

আচ্ছা তা হলে আমি এবার উঠি। ছাতাটা হাতে নিয়ে ঝোলা কাঁধে উঠে পড়লেন কেষ্টবাবু। ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন — তা হলে সন্ধ্যেবেলা যাচ্ছ তো ?

নিশ্চয়ই।

ঠিক আছে। বলে সুবীরের কাঁধে হাত দিয়ে চাপড়ে দিয়ে নেমে গেলেন রাস্তায়।

সুবীর দাঁড়িয়ে রইল অপসৃয়মান ছাতাটার দিকে চেয়ে।

॥ ৫ ॥

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে দিতে কেন যে শেষ না করে সুবীর উঠে এসেছিল, সে কথা সঠিক কেউ আজ পর্যন্ত জানে না। ম্যাট্রিক পাশ সুবীরের হল না। আর দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার কোন ইচ্ছা বা লক্ষণও তার মধ্যে দেখা গেল না।

কংগ্রেসের আদর্শে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বেচ্ছাসেবক হতে স্কুল কলেজের কত ভাল ছেলেই হুট করে একদিন পড়া ছেড়ে দিল। লেগে গেল গাঁজা মদের দোকানের দোরগড়ায়, না হয় বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে পিকেটিং করতে। এমন তো হামেশাই হচ্ছে। যারা এমন কুকর্ম করছে তাদের বাপ মা'রা বাইরে না হলেও মনে মনে ছেলের জন্য গর্ববোধই করে। কত ছেলে ব্রিটিশ সরকারের কারাগারে প্রকাশ্যে ফাঁসি গেল, কত গেল নিখোঁজ হয়ে পর্দার অন্তরালে। কত পুলিশ আর মিলিটারীর গুলিতে। ব্রিটিশ সরকারের মতে এরা অন্যায় করছে। এরা রাজদ্রোহী। রাজদ্রোহিতার শাস্তি এদের পেতেই হবে। ন্যায় অন্যায়ের কথাটায় সুবীর হো হো করে হেসে ওঠে। নিজে নিজেই হাসছে সে পাগলের মত। ওধারের দোকানে ওরা সব তাস খেলায় মেতে আছে। নৈলে বোধহয় সবাই ছুটে আসত। ন্যায় চিরকালই শক্তিমানের পক্ষে। কথাটা বোধহয় তাদেরই উদ্ভাবনা। বাকী সমাজ — তারা দুর্বল বলেই স্তব্ধ। নীরবতায় সেটা মেনে নিয়েছে। মেনে না নিয়ে উপায় থাকে না বলেই। গোলমাল বাঁধে তখনই, যখন কালক্রমে চেতনা ছড়ায়। দুর্বল

অংশও যখন নিজেদের মত করে ভাবতে চায়, ন্যায় অন্যায়ের মূল্যায়ন করতে চায়। আর সেই থেকেই কোনদিন এর চরম সমাধান হোল না। বোধহয় কোনদিনই হবে না।

সুবীর কিন্তু কংগ্রেসের ডাকে তার স্বেচ্ছাসেবকদের দলে ভিড়বার জন্য স্কুল ছাড়েনি। ছেড়েছিল কোন ব্যক্তিগত অজ্ঞাত কারণে। তাই বলে সেই দলে ভিড়তে তার বাধা কোথায়। সে কেন লোকের গঞ্জনা সহ্য করবে? বাপের গালাগালি সইবে?

তাই সুবীরও একদিন ভিড়ে গেল দলে। দলে মিশে পিকেটিং করতে গেল গাঁজা আফিমের দোকানের সামনে—বিলাতী কাপড়ের দোকানের সামনে।

অহিংস পিকেটার এরা। ক্রেতাদের সামনে হাত জোড় করে বলে, আপনারা দয়া করে গাঁজা আফিম কিনবেন না। বিলাতী কাপড় কিনবেন না।

সুবীরের মনে ভয় ঘোচে না। ঝোঁকের মাথায় স্বদেশী দলে ভিড়েছে। পড়া ছেড়ে দিয়ে নিষ্কর্মা হয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরত। সকলেই হেয় চোখে দেখে। বড়রা গালি-নিন্দা করে। সুবীরের দিনগুলো গ্লানিময় হয়ে উঠেছিল। দেশোদ্ধারের তেমন কোন প্রেরণা বোধ করেনি। তবু সে এসেছে।

পড়াশোনা তার দ্বারা না হলেও মহৎ কাজে আত্মোৎসর্গ করার মত সাহস ও যোগ্যতা তার আছে। পরীক্ষা পাশ এবং ইংরাজের গোলামী করা যারা জীবনের একমাত্র কাম্য লক্ষ্য মনে করে সুবীর তাদের দলে নয়।

ছেলেমানুষী উত্তেজনায় এই কথা ভাবতে ভাবতে সুবীর অধীর হয়ে পড়ে। একটা অনিশ্চিত গৌরববোধে নিজেকে ওর বেশ ক্ষিপ্র ও হাল্কা বোধ হতে থাকে। ও বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে—বেরিয়ে পড়ে কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লেখাতে।

প্রাথমিক সে উত্তেজনা কেটে গেছে। এখন দল বেঁধে দোকানের সামনে সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে মাঝে মাছে ভয় হচ্ছে। পুলিশের ভয়। সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিসি অত্যাচারের নানা গল্প শুনেছে সুবীর। তাই অজানা ভয়ে মাঝে মাঝে কেমন অস্বস্তি বোধ করছে ও। আবার যখন এক সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিচ্ছে তখন মনের মধ্যে একটা উদ্দীপনা বোধ করছে।

ওদের দলের নেতা সুনীল দাশগুপ্ত। দৌলতপুর কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। খদ্দরের কাপড় বিছিয়ে দোকানের সামনে বসেছে ওরা আটজন সত্যাগ্রহী। সুনীল নানা কথায় ওদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখছে।

এক সময় বললে, বন্ধুগণ, পরাধীনতার শৃঙ্খল আমরা ভাঙবই। তার জন্য

সারাজীবন দুঃখকষ্ট সহ্য করতে, যে কোন মূল্য দিতে আমরা প্রস্তুত। পুলিস আসছে। একটু পরেই হয়ত এসে পড়বে। তোমাদের পূর্বে সত্যাগ্রহ করার অভিজ্ঞতা নেই। পুলিস আমাদের বেঁধে নিয়ে যাবে। তারপর আমাদের ভাগ্যে কতখানি অত্যাচার ও নির্যাতন আছে তা কেউ বলতে পারে না। সে কথা ভেবে কি কারো মনে ভয় হচ্ছে?

সমবেত কণ্ঠে উত্তর হল, না।

এস আমরা সবাই সমবেত কণ্ঠে গাই—

'লাথি মার ভাঙরে তালা
যতসব বন্দীশালা
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা
কারার ঐ লৌহ কপাট—
ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট।'

নজরুলের গান গেয়ে ভয় ভেঙ্গে গেল। নতুন উৎসাহ সুবীরকে অধিকতর জীবন্ত করে তুলল।

সুনীল বললে, দেখ ভাইসব। পুলিস আমাদের এ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়ে আজ হাজতে পচাবে। আমরাও পুলিশকে শান্তিতে থাকতে দেব না। কি করতে হবে বলে দিচ্ছি।

থানা হাজতে নিয়ে গিয়ে আজ ওরা আমাদের সেখানেই রাখবে। সারারাত ধরে আমরা এক এক জন করে পায়খানা, না হয় প্রস্রাব করতে যেতে চাইব। পুলিসকে বিশ্রাম করতে দেব না। ওদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব। তারপর কোন কোর্টে হাজির করলে যা বলতে হয় আমিই বলব।

কিছুক্ষণ পরেই একজন সাব ইনস্পেকটারের নেতৃত্বে একটা পুলিশ দল এসে হাজির হল। ওরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দিতে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বরণ করল।

পরদিন ওদের খুলনা কোর্টে হাজির করা হল। মহকুমা হাকিম এণ্ডারসন সাহেব ওদের জামিন নিতে বললেন। কিন্তু ওরা জামিন নেবে না। কোন মুচলেকাও দেবে না। কংগ্রেসের তাই নীতি। হুকুম হল, জেল-হাজতে রেখে দাও।

সুনীল বললে, হুজুর কাল থেকে পুলিশ আমাদের কিছুই খেতে দেয়নি। আমাদের পেট ভরে খেতে দেবার হুকুম হোক।

ইংরেজ হাকিম পুলিশের দিকে কটমট করে চাইলেন।

সাব ইনস্পেকটার ইলিয়াস সাহেব বলতে যাচ্ছিলেন, না হুজুর সব মিথ্যা।

হাকিম ওকে থামিয়ে দিলেন, They must be well-fed. তারপর ওদের ইঙ্গিতে কোর্ট থেকে নিয়ে যেতে বললেন। পুলিশ ওদের দড়া ঘেরা দিয়ে জেলখানায় নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এক তাজ্জব ব্যাপার। চিড়ে, কলা, ঘোল আর পাকা আম। কে কত খাবে। ওরা পেট ভরে খেয়ে অবশিষ্ট সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। কি খুশী তারা। জেলে এসে এমন জামাই আদরে ফলার খাওয়া যায় —এই অসম্ভব শুধু স্বদেশীবাবুদের দ্বারাই সম্ভব।

পুরো দুটি মাস জেল হাজতে কাটাতে হয়েছিল। তারপর খালাস। পুরানো দিনের সেইসব ছবিগুলো স্পষ্ট মনের মধ্যে এসে ভীড় করে সুবীরের।

এব পবের বার আলাপ হয় কেষ্টদার সঙ্গে। সেও ঐ খুলনা জেলেই। উনি ছিলেন ডেটিনিউ হিসাবে।

ওদের তাসের আড্ডা ভেঙে গেল। অনিল দোকানের বাইরে এসে হাতদুটো মাথার উপর তুলে আড়মোড়া খাচ্ছে। সুবীর দাঁড়িয়ে আছে ওর দোকানের বারান্দায়।

অনিল ডাকলে, ও সুবীরদা, কি হচ্ছে আজ। খেলায় বসলে না কেন? আজ একবার গোরীপোতায় গিছিলাম চাষীদের বাড়ী। ফিরতে বেলা হল। তারপর খেয়েদেয়ে উঠতে প্রায় দুটো বেজে গেছে।

তখন তোদের অবশ্য খুব জমাটি আসর।

তবু একবার দেখতেও তো এলে না।

আরে আসব কি। খেয়েউঠে পানটা মুখে দিয়ে কেবল বিড়িটা ধরিয়েছি অমনি এক মাননীয় অতিথি হাজির। বিড়িটাও ভাল করে খাওয়া হল না।

তারপর ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে ওকে ডেকে বললে, আরে শোন, শোন, খুব জরুরী খবর আছে।

কৌতুহলী হয়ে অনিল এগিয়ে আসে।

তোমার আবার মাননীয় অতিথি কে গো? কোন শাঁসালো আড়তদার মেড়ো-টেড়ো নাকি?

আরে না রে না। কেষ্টদা এসেছিল। কেষ্ট বাড়ুজ্যে। নাম শুনিসনি? খুলনার নামকরা স্বদেশী কর্মী, অনেকদিন ডেটিনিও ছিল। সাত আট বছর আগে জেলে ওর সাথে পরিচয় হয়।

তা, সে মহাপ্রভুর আবার এখানে আসা কেন? এখানে তো জেল টেল নেই।

যাঃ, কি যে বলিস। নতুন করে দেশের কাজে নেমে পড়েছেন। এবার সব কৃষক, মজুর, সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করবেন। আমাদের সব কাজে নেমে

পড়তে বললেন। আজ সন্ধ্যায় জ্যোতিষবাবুর ওখানে মিটিং করবেন। তোদের সব ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

তা আমরা গিয়ে কি করব।

নিজে শুনবি তো, কি বলেন। দেশের কাজে নেমে পড়া দরকার হলে, নেমে পড়তে হবে। দেশ তো শুধু বাবুদের নয়। দেশ তোমার আমার। দেশের কাজে ডাক আসলে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কাউকে পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

নাও, তোমার ও সব বড় বড় বাত রাখ। এট্রা বিড়ি থাকে তো দাও। সুবীর ডিবা থেকে একটা বিড়ি বের করে অনিলের হাতে দেয়। আর একটা বের করে তার সেঁকা মুখটা মুখের কাছে এনে জোরে জোরে দু' তিনটা ফু দিয়ে আলগা তামাক বের করে দেয়। তারপর পেছনটা ঘুরিয়ে দাঁতে চেপে ধরে দেশলাইয়ের কাঠি বের করতে করতে বলে, বোস্ না বোস্। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

অনিল বসে পড়ে। সুবীর নিজের বিড়িটা আগে ধরিয়ে নিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা দুই হাতে আড়াল করে অনিলের দিকে এগিয়ে ধরে। বাতাসে কাঠিটা নিভে না যায়।

বিড়িটায় একটা টান মেরে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সুবীর বললে, দেখ অনিল, তুই তো যাবিই। আর কাকে ডেকে নেওয়া যায় বল দিকি। কেষ্টদা বলেছিল, বেশ কিছু যুবক ছেলে যাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন কর্মী পাওয়া যাবে এমন দেখে ডেকে নিয়ে যেতে।

দূর, আমার ভালই লাগে না, তো আর কি বলব। তোমাদের ঐ চরকাকাটা, খদ্দর পরা, অহিংসার রাজনীতি—ওর মধ্যে আমি নেই। একটা মানুষের মত মানুষ ছিল তোমাদের ঐ কংগ্রেসে - সুভাষ বোস। তাকে তো ষড়যন্ত্র করে তাড়াল তোমাদের ঐ গান্ধী মহারাজ। নমস্কার বাপু, তোমাদের কংগ্রেসী মার্কা খুরে।

আরে না-রে। তুই ভুল বুঝছিস্। কংগ্রেসের কাজে আমারও ঘেন্না ধরে গেছে। তাই দেখনা আজ দুবছর সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে পাট ব্যবসা আরম্ভ করেছি। জানিস্ কেষ্টদাও কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে।

কংগ্রেস ছেড়ে দিয়েছে? তবে আবার এখানে এসে মরতে গেছে কেন? কংগ্রেস ছাড়া রাজনীতি আর কে করে?

অনিলের ঐ রকম কাটখোট্টা কথা। ভদ্রভাবে বড় একটা কথা বলে না। স্কুলে পড়তে পড়তে লেখা পড়া ছেড়ে বাউণ্ডুলের মত এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বাড়ী থাকলেও রাতদিন কাঠালতলার বাজারে আড্ডা দেওয়া আর খাওয়ার সময় দুটো খেয়ে আসা—এই কাজ।

আরে চল না—শোনাই যাক কি বলে। কেষ্টদাতো বললে, এই অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে কাজ করতে হবে। কৃষক সমিতি গড়ে তুলতে হবে।

আচ্ছা, তুমি যখন বলছ। চল দেখা যাক্।

কাকে কাকে ডেকে নেওয়া যায় বল দিকি।

সে তোমায় ভাবতে হবে না। ভোলা, রমানাথ, বলাই, দিব্যেন্দু, মন্মথ, কমলাকান্ত ওদের ডেকে নিয়ে আমি যাচ্ছি।

ঠিক সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে পেঁছুবি কিন্তু।

আচ্ছা। অনিল উঠে পড়ল।

সুবীর ভাবতে লাগল—অনিলের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। দোকান বন্ধ করে ও নিজে একবার বেরিয়ে পড়বে। চাকুন্দীর মাঠে ফুটবল খেলতে যুবকেরা এসে জোটে। ওদের ক্লাবের কয়টা বাছা বাছা ছেলেকে ও নিজেই খবর দিয়ে যাবে। কেষ্টদার কাছেও কথা দিয়েছে। অনিল যা খেয়ালী ও দায়িত্বহীন। হয়তো নিজেও যাবে না শেষ পর্যন্ত। সন্ধ্যেবেলায় আবার কোন তাসের আড্ডায় বসে যায় তো ব্যাস্।

ভাবতে ভাবতে সুবীর বেরিয়ে পড়ে ঘরে তালা এঁটে খেলার মাঠের দিকে।

॥ ৬ ॥

মিটিং শেষ হতে রাত ১২টা হয়ে গেছে। এমনি মিটিং প্রায়ই আজকাল হচ্ছে জ্যোতিষবাবুর বাড়ীতে। সেই সে দিন থেকে। সপ্তাহে অন্ততঃ একটা তো হয়ই। ভাত নিয়ে বসে আছে সুনয়নী—জ্যোতিষবাবুর মা। ষাটের উপর বয়স। তবু বুড়ী এখনও শক্ত আছেন খুব। ভাত নিয়ে বসে থাকা তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজ। প্রতিদিনই প্রায় আড্ডা শেষে খেতে আসতে রাত বারোটা একটা বেজে যায় এ বাড়ীতে! বড় ছেলে জ্যোতিষের স্ত্রীপুত্র নেই। মেজ রমেশের স্ত্রী নেই। একটা মাত্র মেয়ে রিণী। জ্যাঠার একান্ত আদুরে। জ্যাঠার সঙ্গে দিনে রাতে খাওয়া ওঠা বসা। জ্যোতিষবাবু একটু হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করেন। রিণী তার কম্পাউণ্ডার। বৈঠকখানা ঘরেই সে থাকে প্রায় সব সময়। ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্যাঠার গড়গড়ায় অম্বুরী তামাক সেজে টিকে ধরিয়ে দেওয়া। আর মাঝে মাঝে চা করে নিয়ে যাওয়া। এতদঞ্চলে গ্রামের মধ্যে এই একমাত্র বাড়ী, যেখানে চা'র চল হয়েছে। গঞ্জে বাজারে মাত্র দু একটা চা'র দোকান হয়েছে বা সবে হচ্ছে গ্রামের লোককে চায়ের নেশা

ধরাবার জন্যে। কয়েক বছর আগেও যেখানে বিনি পয়সায় চা খাওয়ানো হত এর স্বাদে ও গুণে এদের আকৃষ্ট করতে সেখানে গাঁয়ের মধ্যে একটা বাড়ীতে চা'র প্রচলন, একটা বিশেষ ব্যাপার। অবশ্য চা জ্যোতিষবাবুই খান, ইদানীং রিণী আর সুবীর তাঁর সঙ্গী হয়েছে। বাইরের বাবুরা এলে তাদের জন্যও লাগে।

ছোটছেলে দীনেশ লোকজন নিয়ে খেত খামারে চাষবাস দেখে। চাযের ভাব তার উপর। চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে তার। বড় মেয়ে কমলার প্রায় দু'বছর হল বিয়ে হয়েছে সুবীবের সঙ্গে। সুবীব ছেলেটিকে জ্যোতিষবাবুর একটু বিশেষ পছন্দ। কেন তা কে জানে। নৈলে অমন চালচুলোহীন পথের ছেলের সাথে এ বাড়ীর মেয়ের বিয়ে হত না। সংসারের কর্তা বড়দার উপর কোন ভাই কথা বলে না। আমাদেব কাজ করার কথা কাজ করে যাই। ভালমন্দ যা, তা বড়দা আছে—সেই বুঝবে। মাথা থাকতে মাথা ব্যথা করতে যাওয়া কেন? এমনকি জ্যোতিষবাবু ভাইদের পরামর্শ চেয়েও পান না। বড় ভাইকে আবার কি পরামর্শ দেবে তারা। পরামর্শ করতে হব মা আছেন—তাঁরই সঙ্গে তিনি পরামর্শ করবেন। অবশ্য সুনয়নী অসুখী হননি। নাতনীটা কাছে কাছেই থাকবে দেখতে তেমন ভাল না। গাযের রং কালো। লেখাপড়াও প্রাইমারীর উপর যায়নি। দূরে চোখেব আড়ালে কার হাতে কেমন বাড়ীতে গিয়ে থাকবে, হয়ত কত হেনস্তা করবে তাবা। তার চেয়ে এ ভালই হল। চোখেব উপর থাকবে আপাততঃ তো বাড়ীতেই থাকবে। তারপর বাড়ীর পাশেই একটু জমি কেনা হয়েছে। ওখানেই একটা ঘর কবে দেওয়া হবে তাদের। ইতিমধ্যে জ্যোতিষবাবু সুবীরকে পাটের ব্যবসায়ে ঢুকিয়ে দিযেছেন।

সারাদিন খাটাখাটুনীর পর দীনেশ সন্ধ্যায় ফিরে এ পাড়ায় ও পাড়ায় এর বাড়ী ওর বাড়ী একবার ঘুরতে যায়। পাড়া বেড়ানো তার নিত্য দিনের সখ ও অভ্যেস। রাত নটা দশটায় ফেরে। ছোট বউ ততক্ষণে রান্নাবান্না সেরে একটু বিশ্রামের আশায় বিছানায় শুয়ে পড়ে। সংসারে বলতে গেলে ঐ একমাত্র মেয়েছেলে। সারাদিন খাটাখাটুনীর অন্ত নেই। পাড়াগাঁয়ে বাইরে খাটার জন্য কিষেণ মজুর চাকর যেমন মেলে, ঘরে খাটার জন্য মেযেছেলে তেমন মেলে না। অনাথা মেয়েছেলেরা বরং ভিক্ষে করে ভাড়া কুটো ভেনে খায়, তবু বাঁধা দাসী চাকরাণী হিসাবে থাকতে চায় না।

ছোট বউকে সকাল না হতেই উঠে উঠান ঝাঁটানো, ঘর নিকানো, বাসন মাজা, গোয়াল পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে—রান্নাবান্না, কাচা ধোয়া সবই করতে হয়। তার উপর ছেলেমেয়ের ঝামেলা আছে।

আজকাল অবশ্য মেয়েরা বড় হযেছে। দুপুরের রান্নাটা কমলাই করে অধিকাংশ

দিন। রিণী বড় হলেও সংসারের একটা কাজও তার দ্বারা হয় না, জ্যাঠার ফাইফরমাস খাটা ছাড়া।

দীনেশ পাড়াবেড়ানো সেরে বাড়ী ফিরে ডাকে, মাগো, ভাত দাও।

সুনয়নী রান্নাঘরের দাওয়ায় একটা পাটী বিছিয়ে শুয়ে বসে থাকেন। ঘরের মধ্যে কেরোসিন ল্যাম্প জ্বলছে। যে যখন এসে ডাকবে তাকেই তিনি খেতে দেবেন। মেজ ছেলে রমেশ অবশ্য প্রায়ই বাইরে থাকে। চুকনগর, ডুমুরিয়া এইসব হাট থেকে কাঁচা তরিতরকারী কিনে নৌকায় করে চালান দেয়, চালনা, বাজোর বড় বড় গঞ্জে। সপ্তাহে দু'একদিন বাড়ী থাকে বড়জোর। আর সে কদিনও তার খেতে খেতে রাত বারোটা তো হয়ই। তার আবার তাস পাশার নেশা। সন্ধ্যেবেলায় কারো বাড়ী তাসের আড্ডায় জমে গেলে বাড়ী ফিরতে সেই রাত বারোটা।

রিণী ছুটতে ছুটতে এসে বললে, ঠা'মা ও ঠা'মা, ভাত দাও। মিটিং শেষ হয়ে গেছে। সব লোকজন চলে যাচ্ছে। বলেই আবার ছুট দিচ্ছিল।

রিণী, ও রিণী, শোন্।

কি ঠা'মা।

বাড়ীতে লোকজন আছে। তুই একটু লেগে দেনা। আমি বুড়োমানুষ, একা একা কি পারি?

ওঃ, বলে রিণী একটু চাপা বিরক্তি প্রকাশ করে। লোকজন বলতে তো কেষ্টবাবু। তিনি তো ঘরের লোকের মতন। আর সব যে যার বাড়ী চলে গেছে।

তা তাকেও তো দুটো বেড়ে গুছিয়ে দিতে হয়। তার অযত্ন হলে আমার চেয়ে তোদেরই বেশী লজ্জা হবে না?

কথাটা ঠিক। কেষ্টবাবুর সঙ্গে সর্বদা ওঠা বসা—জ্যোতিষবাবু, রিণী ও সুবীরের। ওদের নিয়েই তো তার কাজ। কাজেই তাঁকে যত্ন করার দায়িত্ব রিণী এড়াতে পারে না।

আসন পিড়ী পেতে জল দিয়ে থালায় থালায় ভাত বেড়ে, বাটীতে বাটীতে তরকারী সাজিয়ে রিণী আবার ছুটল ওদের ডেকে আনতে।

পাশের ঘরের বারান্দায় খেতে বসেছেন জ্যোতিষবাবু, কেষ্টবাবু আর সুবীর। থালা ধরে দিচ্ছে রিণী। ভেতর থেকে এগিয়ে দিচ্ছেন সুনয়নী।

কেষ্টবাবু বললেন, রিণী তুমি আমাদের সঙ্গে বসবে না?

না কাকু, আমি আপনাদের দিয়ে থুয়ে ঠা'মার সঙ্গে খাব। ঠা'মা একা আর কত পারে।

কেষ্টবাবু বললেন, সে তো ঠিকই। তা মা'র শরীর খারাপ নয়তো?

সুনয়নী ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। না, বাবা, ভালই আছি। তবে বুড়ো মানুষ, সবদিন কি আর ভাল থাকব। শরীরটা কোনদিন খারাপ হয়ে পড়লে রিণীকেই তো তোমাদের দেখা-শোনা করতে হবে। তাই বললাম, তুই আজ ওদের খেতে দে।

তা সেজন্য আপনার ভাবনা নাই, মা। রিণী খুব বুদ্ধিমতী ও কাজের মেয়ে।

রিণী নিজের প্রশংসায় সংকুচিত হয়ে গেল। তারপর বললে, যানু, আপনার সব বাড়াবাড়ি, কাকু।

কেষ্টবাবু হাসিমুখে বললেন, নারে, আমি কি মিছে কথা বলছি, মাই বলুন। কেষ্টবাবু ইতিমধ্যে সুনয়নীকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছেন আর ঘরের ছেলের মত সব ব্যাপারে সহজ হয়ে গেছেন।

সুনয়নী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, মিছে কথা কেন হবে বাবা, আমার রিণীর মত মেয়ে ক'টা হয়। যেমন দেখতে শুনতে, তেমনি কাজে কর্মে, লেখা পড়ায়। ম্যাট্রিকটা পরীক্ষা দিলে ভালভাবেই ওর পাশ হয়ে যেত। কিন্তু ও যে কি কপাল নিয়ে জন্মেছিল। ওর জন্য আজ সংসারে কারো মনে শান্তি নেই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছর হঠাৎ রিণীর বিয়ে হয়ে গেল এক বড়লোকের ঘরে। মা মরা এই মেয়েটাকে বুকে করে মানুষ করেছেন জ্যোতিষবাবু। বড়লোকের ঘরে সম্বন্ধ হওয়াতে পরীক্ষার জন্যও আর অপেক্ষা করেননি। কথা ছিল বিয়ের পর আবার ছুটি মাস পড়াশোনা করবে। তারপর পরীক্ষা শেষে নিয়মিত শ্বশুর ঘরে গিয়ে থাকবে। বিয়ের একমাসের মধ্যেই রিণী বিধবা হয়ে গেল।

রিণী আর পরীক্ষা দেয়নি। পড়াশোনাও করেনি। শ্বশুর নিয়ে রাখতে চেয়েছিল—রিণী যেতে চায়নি। জ্যোতিষবাবুও মত করেননি। আজকাল সে জ্যোতিষবাবুর কাছে কাছেই বেশী সময় কাটায়। বিধবার বেশ পরে না। শাড়ী পরে। কুমারী মেয়ের মত থাকে। পাড়ায় অনেকে এটা না পছন্দ করলেও জ্যোতিষবাবুর জন্য কেউ কিছু বলতে পারে না।

সে প্রায় দু'ছর হয়ে এল। রিণী ও সুবীরের একই দিনে বিয়ে হয়—বাড়ীর 'দু' মেয়ের বিয়ে।

দুর্ঘটনার পর অনেকদিন রিণী সুবীরের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারে নি। শুধু সুবীর নয় প্রায় কারো সঙ্গেই সে বড় একটা কথাবার্তা বলতো না। তদবধি বাড়ির ভিতরে প্রায়ই থাকে না। জ্যাঠামশায়ের তামাকটা সেজে দিয়ে তার ডিসপেনসারীতে চুপ করে বসে থাকে। কোন রুগী এলে ঔষধটা ওই দিয়ে দেয় জ্যাঠামশায়ের প্রেসক্রিপসন মত।

ইদানিং কেষ্টবাবুর আসা যাওয়াতে রিণী যেন একটা করবার মত কাজ পেয়েছে। আবার প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠেছে আগের মত।

কেষ্টবাবু ইতিমধ্যে এ সবই জেনেছেন। তাই এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা চাপা দেওয়ার জন্য বললেন, মা আপনার হাতের এই কাসুন্দিটা আমার খুব ভাল লাগছে। কাসুন্দির এমন সুস্বাদ অন্য কোথাও পাইনি।

জান বাবা, ও সব রিণীর হাতের গুণ। ওই তো যত্ন করে কাসুন্দিটা তৈরী করে।

মিছে কথা কাকু। বিণী বলে উঠে ঠা'মার সব অমনি কথা। সরষে ধোয়া বাটা, এসব কাকীমা ও দিদির কাজ। জল জ্বাল দেওয়া, সরষে গোলা, টক দেওয়া, যা সব কাজ সব ঠা'মাই করে। আর আমার কাজ কি জানেন, বলে হি হি করে হাসতে থাকে রিণী।

কি তোমার কাজ? জিজ্ঞাসা করেন কেষ্টবাবু।

কাসুন্দি গোলা হয়ে গেলে ঘরে নিয়ে রাখা। আর রোজ সাত-সকালে রোদ উঠলে চান করে এসে কাসুন্দির ধামা বা নাদা বাইরে এনে রোদে দেওয়া। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সেগুলো নেড়ে দেওয়া কাঠি দিয়ে। দুপুর পর্যন্ত এই চাকরী। দুপুরের পর ঘরে তুলে রাখা। স্নান করে শুদ্ধ বস্ত্র ছাড়া সেই ধামা বা নাদা কারো ছোঁয়ার হুকুম নেই।

তবেই দেখ বাবা, আসল কাজটা তো রিণীই করে। অমনি করে রোদ দিতে দিতে আর নেড়ে দিতে দিতে কাসুন্দিতে 'তার' হয়। যারা ওটা ঠিকভাবে করে না তাদের কাসুন্দিতে ভাল স্বাদ হয় না। নৈলে সরষে কুটে জলে গুলে তো সবাই নেয়।

তাহলে তো মার কথামত দেখা যাচ্ছে আসল স্বাদের জন্য রিণীর দক্ষতা না হোক নিষ্ঠাই দায়ী।

জ্যোতিষবাবু মন্তব্য করলেন, সব কাজেই নিষ্ঠাই হচ্ছে সবার আগে প্রয়োজন। নিষ্ঠা থাকলে দক্ষতা আসেই।

একই দিনে বিয়ে হয়েছিল কমলা আর রিণীর। কমলার শ্বশুরবাড়ী বলতে কিছু নেই—স্বামীর নেই চালচুলো। শ্বশুরের অন্নদাস। মেয়েদের কাছে এটা খুব গৌরবের নয়। অনেকে খোটা দিতেও ছাড়ে না। খোটা ওরা স্বামীকে লক্ষ্য করেই দেয়—যে স্বামী ঘরজামাই। কিন্তু লাগে তো তারই মনে। স্বামীর অক্ষমতায় স্ত্রীকে লজ্জায় সংকুচিত হয়ে যেতে হয়।

সংসারে আপাতদৃষ্টিতে যা ভাল মনে হয় পরিণামে অনেক সময় দেখা যায় ঠিক তার উল্টো। বিয়ের দিন অনেকেই কমলার দুর্ভাগ্যের সাথে রিণীর সৌভাগ্যের

তুলনা করে যে ব্যালান্সশীট কেটেছিল তাতে কমলার দিকে শুধুই ছিল লোকসান, আর রিণীর লাভের অংক আকাশ ছোঁয়া। অথচ আজ কে না বলবে কমলা হাজারগুণে রিণীর চেয়ে সৌভাগ্যবতী। তার স্বামী আছে, ছেলে আছে। স্বামীর আর কিছু না থাকলেও স্বাস্থ্য চেহারা বয়স সামর্থ্য সবই আছে। নিজস্ব ঘর বাড়ী ধন দৌলত নাই বা থাকল। বেঁচে থাকার মত একটা ব্যবস্থা চেষ্টা ও বুদ্ধি থাকলে করে নেওয়া যায়।

কিন্তু রিণীর সে কিছুই নেই। সে আজ সকলের চোখে হতভাগী, অলক্ষ্মী। এ বাড়ীর অভিশাপ। সে আজ করুণার পাত্র। যা করছে করুক। কাজকর্ম করার কথা কেউ তাকে বলেও না। সে সকলের চোখের সামনে থেকেও যেন নেই—বাড়ীর কেউ তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে না। নিজেরাও ভুলে থাকতে চায়। তাকেও ভুলিয়ে রাখতে চায় জীবনের একটা দিকের কথা, যেদিকে একটা অদৃশ্য নিশ্ছিদ্র প্রাচীর উঠে গেছে দৃষ্টির শেষ সীমা অবধি। ওর সে পারে কি আছে, কি থাকতে পারে সে ভাবনার অসহায় বেদনা যেন দৈনন্দিন বেঁচে থাকাটাকে আরও রক্তাক্ত না করে দেয়।

এই দুই বছরে রিণীর যেন কত বয়স বেড়ে গেছে। মুখখানা সবসময় গম্ভীর ও থমথমে। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেই যে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল আর তেমন হাসিখুশী চপলতা কোনদিন দেখা যায় নি। এই কচি মেয়ের সিঁথি থেকে কে সিঁদুর মুছে দেবে। নিজে নিজেই চান করে ও সিঁদুর ঘসে তুলে দিয়েছিল। কান্নাকাটি কিছুই করে নি। পাড়ার মেয়েরা ওর কাছে এসে সহানুভূতি জানাতে থাকলে ও সেখান থেকে উঠে যেতো।

কমলার দুঃখ হয় রিণীর জন্য। তবে এরই মধ্যে যেন একটা সান্ত্বনাও সে খুঁজে পায়। প্রথম গেমে রিণী ওকে হারিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই জিতে শাস্তি পেয়েছে। তার বিজয়ের চিহ্ন এই তার কপালে আর ঐ বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছে তার ছয় মাসের শিশু। করুণা আর জয়ের আনন্দ মিলে কমলার চোখে মুখে একটা চাপা গর্ব ফুটিয়ে তোলে। ইদানিং রিণীর একটু পরিবর্তন হয়েছে। তাই কমলার মনে এসেছে একটা অস্থিরতা। রিণী আগের মত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাইরের ঘরে প্রায়ই মিটিং হয়। লোকজন আসে, রিণী ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে। তারপর থেকে তার মুখখানা হাসিখুশী। বীরুদা বীরুদা করে সুবীরকেও নানা কথা জিজ্ঞাসা করে—তার সঙ্গে নানা শলাপরামর্শ হয়—দেশের কাজের কথা। কি সব অন্দোলনের কথা।

আজকাল মাঝে মাঝে কাঁদতে থাকলে ও কমলার ছেলেটাকে নিয়ে থামাতে চায়।

অথচ আগে ওকে কোলে নিতে চাইত না। বলত, আমার মত অপয়ার দৃষ্টি পড়লে তোমার ছেলের যদি অমংগল হয়।

ঈর্ষা? না ঈর্ষা কেন করবে কমলা রিণীকে। রিণী জোর মাস পাঁচ ছ'য়েকের ছোট হবে কমলার। একসঙ্গে খেলাধূলা করে দুই বোন বড় হয়ে উঠেছে। রিণী অবশ্য 'লেখাপড়ায় বরাবরই বেশ ভাল। তাই প্রাথমিক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার লেখা পড়াটাও থেমে যায়নি। যা পাড়াগাঁয়ের মেয়েদের সাধারণতঃ হয়। দেখতেও রিণী একটু ভাল—গায়ের রং অনেকটা ফর্সা। তাই বলে তাকে ঈর্ষা করার কি থাকতে পারে। তেমন কথা কোনদিনই কমলার মনে ওঠেনি। তার মা নেই, তাই বড় জ্যাঠামশাই রিণীকে একটু বেশী স্নেহ করেন। এটাও বাড়ীর সকলে যেমন, কমলাও তেমনি মেনে নিয়েছিল। পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে বেশী কেউ মাথা ঘামায় না। তা'ছাড়া রূপের উপর কারো হাত নেই. সে তো ভগবানের দেওয়া।

তবু সেই বিয়ের সময়টা থেকে কমলার মনে কেন যেন একটা ঈর্ষার জ্বালা ধরেছিল। রিণীর হয়ত কোন দোষ নেই। কিন্তু রিণীকে নিয়েই বা কেন সবাই এত মাতামাতি করবে। সেও তো এই বাড়ীরই একটা মেয়ে। সেদিনের বিয়ের উৎসবটা যেন রিণীর বিয়ের জন্যই ছিল। কমলা এর মাঝে ফাউ। ঘর বরও হয়ত সকলের ভাগ্যে সমান জোটে না। তাই বলে বিয়েটা ছোট বড় হবে কেন? সব বিয়ের মর্যাদা. সব বিয়ের আনন্দ সমান হবে না কেন? এই বৈষম্য সেদিন কমলার মনে অজ্ঞাতে কোন ঈর্ষার বীজ বুনে দিয়ে থাকবে। রিণীকে নিয়ে সবাই মাতামাতি করছে বলে কি রিণীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা। কিন্তু কিছুদিন না যেতেই তার দুর্ভাগ্য যখন প্রকট হয়ে উঠল—তার মাথাতে ফুটন্ত গোলাপটা যখন ম্লান হয়ে এল তখন আর সেই বীজ উপ্ত হবার সুযোগ পায়নি। চাপা পড়েছিল মনের তলে।

আজ আবার রিণীকে নিয়ে যেন একটা মাতামাতি শুরু হতে চলেছে। বিশেষ করে তারই স্বামী যেন বেশী করে মেতে উঠেছে। অবশ্য রিণী করবেই বা কি। কি নিয়ে কি ভাবে সে জীবন কাটাবে। দেশের কাজ ভাল কাজ। তাই নিয়ে যদি ওর জীবনটা কেটে যায় সে তো ভাল কথা। সে দিক থেকে দোষের তো কিছু নেই এর মধ্যে। কমলা মনকে শান্ত করে।

তবু মনের মধ্যে যেন একটা অস্থিরতা। ঘুম পেতে চায় না। সে বরাবরই ঘুমকাতুরে। বিয়ের পর তার এত ঘুমের জন্য স্বামী অনেক সময় বিরক্ত হয়ে উঠত। দিনের বেলায় বাবা, জ্যাঠা, মা ঠাকুমার সামনে কাজ ফেলে স্বামীর কাছে বসে গল্প করাও তো সম্ভব নয়। কোন সময় ফাঁক পেলেও লোকলজ্জা বলে তো একটা

জিনিস আছে — পাড়ার কেউ এমনকি ছেলেমেয়েরা দেখলেও উঁকি মারবে। কাজেই স্বামীর সঙ্গে নিরিবিলি দুটো কথা বলা রাত্রে শোয়ার পর ছাড়া হয়ে ওঠে না। অথচ সেই সময় কমলার এমন ঘুম পায় যে কোন কথাই তার কানে যায় না। এই নিয়ে প্রথম প্রথম স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হতে চায়নি। তারপর ছেলেটা হওয়া অবধি ঘুম যেন আরও বেড়ে গেছে তার। রাত্রে ভাল ঘুম হয়না — ছেলেটা কান্নাকাটি করে। তাই সকাল সকাল কমলা খেয়ে দেয়ে ছেলে নিয়ে শুয়ে পড়ে। অধিকাংশ দিন স্বামী কখন খেয়ে দেয়ে এসে শুয়ে পড়ে তা সে জানতেই পারে না।

কমলা নীচে বিছানা করে ছেলেকে নিয়ে থাকে। সুবীর একাই আজকাল খাটে শোয়। আজ কিন্তু কমলার মোটেই ঘুম পাচ্ছিল না। ছেলেটা ঘুমিয়ে গেছে। বাইরের ঘরে লোকজন মিটিং চলছে। সুবীর আছে, রিণীও আছে সেখানে। কমলা কি করবে ভেবে পায় না।

ছেলেটাকে নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয়। নিজের দিকে নজর দেবার আর সময় হয়ে ওঠে না। কমলা উঠে আয়নার কাছে দাঁড়ায়। চুলটা ভাল করে বাঁধা হয়নি। ধীরে ধীরে চুলটা আঁচড়ে বিনুনী করতে থাকে। ছেলে হওয়ার পর শরীরটা খুব ভেঙে গিয়েছিল। আজকাল অনেকটা সেরে উঠেছে। চুল বেঁধে সিঁথিতে পাতলা করে সিঁদুর টেনে দিল কমলা। তারপর ছোট্ট একটি টিপ পরল। একটু পাউডার ঘসে নিল মুখে গলায় বুকে বগলে। ধীরে ধীরে কাজল টেনে দিল দুইচোখে। কাপড় ব্লাউজ বদলে ফেললে। পায়ে আলতার রেখা টেনে দিল। এইবার বোধহয় ওদের মিটিং ভেঙে যাচ্ছে। এইবার খাওয়া দাওয়া সেরে সুবীর আসবে। কমলা একটা পান সেজে মুখে পুরল। ছেলেটা ঘুমুচ্ছে। মশারিটা ধরে দিল ও। তারপর খাটের বিছানাটা ঝেড়ে চাদর বদলে দিল। বেশ ধবধব করছে বিছানাটা। ওর ভারী লোভ হচ্ছে ওখানে শুয়ে পড়ে। হ্যারিকেনটার জোর কমিয়ে ও খাটে উঠে এল।

ছেলে কাঁদলে তবে নীচে যাবে। এক্ষুনি হয়ত কেঁদে উঠবে। মনে হতেই বিরক্ত হয়ে ওঠে ও। কতক্ষণে খেয়ে দেয়ে উঠবে কে জানে। হয়ত আবার শুরু হবে শলা পরামর্শ।

কমলা শুয়ে পড়ে। অধীরভাবে উৎকর্ণ হয়ে মুহূর্ত গুণতে থাকে।

খাওয়া দাওয়া সেরে সুবীর যখন ঘরে ঢুকল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। কিছুক্ষণ আগে ঘরে ধূপ জ্বালানোর সুগন্ধ তখনও ঘর থেকে মুছে যায়নি। সুবীরের নাকে গন্ধটা যেতেই ও যেন সচেতন হয়ে উঠল। চাকুন্দীর রথতলার মাঠে

একটা বিরাট জনসভার আয়োজন করতে হবে। তার সমস্ত ব্যবস্থার ভার পড়েছে সুবীরের উপর। এই জনসভায় মহিলাদেরও নিয়ে হাজির করতে হবে। সে কাজটা রিণীই করবে। মনের মধ্যে সেই চিন্তাই ঘুরছিল এতক্ষণ। এখন নাকে ধূপের গন্ধটা যেতেই ঘরের চারিদিকে ও ভাল করে চোখ মেলে দেখল। আজ বেশ ঘরটা সাজানো গোছান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সুবীর একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে খাটে বসল। কমলা উল্টোদিকে মুখ করে জড়সড় হয়ে শুয়ে আছে। সুবীরের অস্তিত্ব যেন ও টেরই পায়নি।

সুবীর ওর গায়ের উপর একটা হাত রেখে বলে, কি গো, আজ ঘুমোওনি যে। কমলা কিছু বলে না। সুবীর ওকে জোর করে ঘুরিয়ে আনে। কমলা বালিশে মুখ গুজে পড়ে থাকে।

আজ যে খাটে এসে শুলে বড়।

কেন, তোমার খাটে শুতে নেই নাকি ?

না তা বলছি না, তবে এরকমটা তো দেখা যায় না। বেশ পটের বিবির মত সেজেছ আবার।

আমার সাজার দিন বুঝি ফুরিয়ে গেছে ?

সে কি কথা। সাজবে বৈকি। সাজলে তো তোমাকে বেশ ভাল দেখায়। বরং যা তা হয়ে থাক, ভাল লাগে না।

তাই নাকি ? তুমি কাজের মানুষ। কোনদিকে তাকাবার সময় নেই। রিণীকে নিয়ে রাত দিন কত কাজ তোমার।

ও, তাই বল। তা রিণীকে নিয়ে তো কাজ করতেই হবে। ও যে আমাদের পার্টির একজন কর্মী হয়েছে।

মেয়েছেলেকে নিয়ে আবার কিসের পার্টি ? এতো কখনো দেখিনি।

দেশের কাজে ছেলে মেয়ে সবাইকে নামতে হবে। মেয়েরা যদি সাহায্য না করে, এগিয়ে না আসে তবে শুধু পুরুষেরা আন্দোলন করে সফল হতে পারবে না। সব দেশে যত আন্দোলন হয়েছে দেখবে তার পেছনে মেয়েরা ছিল—তারা নানাভাবে সাহায্য করেছে, প্রেরণা দিয়েছে। তুমি যদি পারতে তোমাকেও নিয়ে যেতাম।

আমার দরকার নেই। তবে আমার এসব ভাল লাগে না তা বলে দিলাম।

কি ভাল লাগে না ?

এইসব মেয়েদের নিয়ে সবসময় মিটিং, শলাপরামর্শ, হৈ হৈ করা।

মেয়েদের বলতে পার্টিতে রিণী ছাড়া তো এখন আর কেউ নেই। বরং তাকে যদি দেশের কাজে পাওয়া যায় তবে সেও একটা কাজের মত কাজ পেয়ে বাঁচতে পারে।

ও তাই বল, রিণীর জন্য দরদে মন কাঁদছে।

ছিঃ, তুমি অমন করে কথা বলছ কেন? তার জন্যে তো আমাদের সকলের ভাবা উচিৎ। তার জীবনটা কাটে কি ক'রে?

তবে তাকেই বিয়ে করে নিয়ে তার হিল্লে করে দিলেই তো হয়।

তুমি কি ঝগড়া করার জন্যই আজ সেজেগুজে ছিলে?

কমলা রাগে অভিমানে খাট থেকে নেমে পড়ে। সুবীর ওকে ধরতে যায়।

শোন, মনকে ওরকম ছোট কোরো না। মিছামিছি কষ্ট পাবে।

কমলা কথা না বলে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়তে যায়। ছেলেটার পায়ে ওর পাটা লেগে যাওয়ায় ট্যা ট্যা করে কাঁদতে থাকে সেটা। কমলা ওকে থামাবার চেষ্টাও করে না।

॥ ৭ ॥

কাল রাতে একা একা নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল কমলা তা ওর মনে নেই। ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে যখন টাক মেরে পড়ল তখন আর সে চুপ করে থাকতে পারেনি। কোলের মধ্যে টেনে এনে বুকের দুধ ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তারপর আর নিজের চোখের জল বাঁধ মানে নি। বুক থেকে দুধ ঝরেছিল বাচ্চার টানে, আর চোখ থেকে কেন যে সমানে জল ঝরতে থাকল তা ও বুঝতে পারে নি। অবাধ্য অশ্রুকে রুখতে ও অনেক চেষ্টা করেছিল। কোন ফোসফোসানি শব্দ আবার যেন সুবীরের কানে না যায়। তাহলে লজ্জার ওপর লজ্জা রাখার আর জায়গা থাকবে না। তথাপি নাকের জলে চোখের জলে এক হয়ে গেল—আর সেই জলে বালিশ গেল ভিজে। ভিজে বালিশের উপর শাড়ীর আঁচল চাপা দিয়ে শুল ও। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছে। উঠতে তাই বেশ বেলা হয়ে গেল আজ।

সুবীর রোজ সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ফেনাভাত খেয়ে দোকানে বেরিয়ে যায়। আর দুপুরে বারোটা একটা নাগাদ ফেরে। কাজের মরশুমে দুপুরে দোকানেই খাবার ব্যবস্থা করে নেয়—বাড়ী আর ফেরে না।

সুবীরের তাই ঘুম থেকে একটু দেরী করে ওঠাই অভ্যাস। কিন্তু আজ সে কোন্ ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছে। ঘরে জামাটা নেই। তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে সে বাড়ীতে নেই। বিছানাপত্র তুলে ঘরদোর ঝাট দিয়ে একেবারে বের হবে ভাবছিল কমলা। এমন সময় বাচ্চাটা উঠে গেল।

প্রাতঃকৃত্য সারা হয়নি। বাচ্চাটাকে বুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল। সারা বাড়ী রোদে ভরে গেছে। ভারী লজ্জা করতে লাগল ওর। তার উপর ম্লান হয়ে এলেও গতরাত্রের সাজসজ্জার চিহ্ন লেগে আছে সর্বাঙ্গে। তা যেন লজ্জার সঙ্গে কঠিন ধিক্কারে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চাইল ওকে।

সুনয়নী রান্নাঘরের দাওয়ায় ফেনাভাত রাঁধছেন। সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে ফেনাভাত খাওয়া এ অঞ্চলের রেওয়াজ। গরম গরম ফেনাভাতে আলুভাতে বা রাতের বাসী তরকারী বা দুধ গুড় দিয়ে খেয়ে যে যার কাজে যাবে। মুসলমানরা বলে নাস্তা। নাস্তা খেয়ে চাষী যাবে চাষ করতে, মজুর যাবে লোকের ঘরে কিষেন দিতে, ডাক্তার যাবে ডিস্পেনসারীতে, দোকানদার দোকানে। আর ফিরবে সেই দুপুর গড়িয়ে গেলে বেলা একটা দুটোতে। স্নান খাওয়া সেরে এক দেড় ঘণ্টা বিশ্রাম। আবার বেলা তিনটে চারটে নাগাদ কাজে বেরুবে। ফিরবে সেই পাঁচটা ছয়টা নাগাদ। অবশ্য চাষ আবাদের মরশুমে এই নিয়মের কিছু ব্যাতিক্রম ঘটে। যেমন নাস্তা খেয়ে তখন কাজে বের হলে চলে না। ভোর ভোর ক্ষেতে যেতে হয়। ক্ষেতের আলে বসে খেয়ে নিতে হয়—নাস্তা। বাড়ী থেকে ছেলেমেয়ে কেউ বয়ে নিয়ে দিয়ে আসে নাস্তা, খাবার পানি আর আগুন তামাক। হিন্দু-মুসলমান চাষী মজুর একই সঙ্গে ক্ষেতে লাঙল দেয়, ধান রোয়, ঘাস নিড়ায়, ফসল কাটে। খাবার হিন্দুর বাড়ী থেকেও আসে, মুসলমানদের বাড়ী থেকেও। একই আলে পাশাপাশি বসে খাওয়া চলে। তাই জলকে পানি, পানিকে জল, পরস্পর সকলেই বলে। হিন্দু ও খোদাতালার মার বলে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাকে আখ্যা দেয়, মুসলমানও বলে ভগবানের মার।

সুনয়নী নাস্তা রাঁধছেন। দীনেশ খেয়ে মাঠে যাবে। রমেশ যাবে চুকনগরের হাটে। আর যারা, তাদের জন্য ব্যস্ততা নেই। তারা তো বাড়ীতেই থাকবে। আধঘণ্টা একঘণ্টা দেরী হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু ওদের ভাত দেরী হলে চলবে না।

রমেশ বেশী ব্যস্ত হয়েছে। সেই সকালে চান করে উঠোনে কাপড় মেলতে মেলতে ডাকল, কৈ মা, হল তোমার ?

এই যে হ'ল বাবা।

তাড়াতাড়ি বাড়। শুকচাঁদ নৌকা নিয়ে ঘাটে এসে গেছে। দেরী হলে আজ হাটে যাওয়া হবে না। ভাঁটা আরম্ভ হয়ে যাবে।

শুকচাঁদ জাতিতে জেলে। কিন্তু আর জেলেদের মত সে জাত ব্যবসা করে না। জাত ব্যবসা ছেড়ে সে রমেশের সঙ্গে কাঁচা তরিতরকারীর ব্যবসা করে। লোকটা খুব পরিশ্রমী আর বিশ্বস্ত। নৌকা বাইতেও ওস্তাদ। মূলধন ও নৌকা

সবই রমেশের। সে শুধু খাটবে। মাসকাবারী বেতন তিরিশ টাকা আর লাভের চার ভাগের এক ভাগ।

তাতে সে যা পায় তার সংসার স্বচ্ছন্দে চলে যায়। আর এত উদার শর্তে আর কেউ ব্যবসা করতে নেবেও না। তাই শুকচাঁদ কখনো কর্তব্যে অবহেলা করে না। সময়ের আগে আগেই সে হাজির থাকে।

মা উঠান ঝাঁট দিয়ে গোয়াল পরিষ্কার করতে ঢুকেছে।

কমলা ডাকলে, মা একে একটু ধরবে?

মেয়ে এত বেলা পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। কাজকর্ম একা একা সারতে হচ্ছে। ছোট বউ অপ্রসন্ন হয়েই ছিলেন। এখন আবার মেয়ের আব্দার শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, এত বেলা পর্যন্ত শুয়ে আছিস কোন লজ্জায়! এখন আবার ছেলে ধরতে বলছিস্। এ বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বাবুয়ানী করে গায় ফুঁ দিয়ে খাওয়া আর ঘুমানো। আমি আছি দাসী বাঁদী। আর ভাবনা কি। বলে গজ গজ করতে করতে গোয়ালে ঢুকে গেলেন।

ভাত নামাতে নামাতে সুনয়নী নাতনীর গলা শুনে কমলার দিকে একবার তাকিয়ে মনে মনে হাসলেন। নাতনীর সাজগোজের চিহ্ন আর দেরী করে ঘুম থেকে ওঠা যে ইঙ্গিতটা তাঁর কাছে স্পষ্ট করে তুলল তার মাধুর্য স্নেহসিক্ত ক্ষমায় নাতনীর অপরাধটুকু মুছে দিল। কিন্তু তিনি নিরুপায়। রমেশকে এক্ষুনি ভাত দিতে হবে। তার ছেলে ধরে নাতনীকে প্রাতঃকৃত্যের সুযোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

তিনি ডাকলেন, রমেশ খেতে আয়। আমার হয়ে গেছে।

যাই মা, আমি কাপড়টা পরে তৈরী হয়ে আসছি। তুমি থালায় ভাত বেড়ে দাও। ঠাণ্ডা হতে থাক।

রিণী উত্তর ঘরের দাওয়ার মাদুর পেড়ে বসে বড় বড় কাগজে বাঁশের কলম দিয়ে কি সব লিখছে। কমলা নিরুপায় হয়ে নরম গলায় রিণীকে বললে, রিণী একে একটু ধরবি, আমি এক্ষুনি আসব।

রিণী ভীষণ ব্যস্ত। এ পর্যন্ত মোটে পাঁচখানা পোষ্টার লেখা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে আর অন্ততঃ বিশখানা লিখতেই হবে। মোট একশখানা পোষ্টার লিখে দেবার ভার তার উপর। তা বাদে গ্রামে মেয়েদের মধ্যে প্রচারেও যেতে হবে। কিছু সংখ্যক মেয়েছেলে যদি সভায় আনা যায়।

পুরানো অর্ধসাপ্তাহিক আনন্দবাজার আর সাপ্তাহিক বসুমতী এক বাণ্ডিল নিয়ে বসেছে। ভাঁড়ের মত দোয়াত আর—একটা বাঁশের কলম। বড় বড় অক্ষরে

ও লিখছে, "বিরাট জনসভা—দলে দলে যোগ দিন। বক্তা: কমরেড কেষ্ট বাড়ুজ্জে, চিত্ত বোস, সুবিমল দত্ত, আমজাদ আলী ও আরও অনেকে। স্থান—চাকুন্দী রথতলার মাঠ। তারিখ – ১৫ই বৈশাখ, শনিবার। সময়—বিকাল ৪টা।"

আর একটায় লিখছে: ধনীর শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে দুনিয়ার কৃষক মজুর এক হও।

রিণী বলে, না দিদি আমার এখানে দিও না। দেখছ না আমার এখন মরবার ফুরসৎ নেই। এক্ষুনি বীরুদা এসে যদি দশখানা পোষ্টার না পায় তবে আর রক্ষে রাখবে না।

কমলার মন মেজাজ এমনিতেই ভাল ছিল না! তার উপর সকালে উঠতে দেরী হওয়ায় লজ্জা, মার গালাগালি, এখন রিণীর কথায় রাগ যেন তার সপ্তমে চড়ে গেল। আর সেই সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল বাচ্চা ছেলেটার উপর। রাগে গরগর করতে করতে বাচ্চাটাকে একরকম আছড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল, রিণী যেখানে বসে লিখছিল তার থেকে হাত পাঁচেক দূরে। টাক মেরে কাঁদতে লাগল ছেলেটা।

রিণী খুব বিরক্ত হলেও হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি তুলে নেয় বাচ্ছাটাকে। আহা, আ, না, না, কাঁদে না, আমার সোনা বাবুটা কাঁদে না। এমনি করে থামাতে চেষ্টা করে। কোলে নিয়ে ঘুরতে থাকে।

হন্তদন্ত হয়ে বীরু কোথা থেকে এসে গেল। চেঁচিয়ে বললে, কইরে রিণী, কতগুলো হলো, খান কুড়ি হয়নি ?

রিণী একটু ঝাঁঝিয়ে উঠল, কি করে হবে ? তোমার ছেলেকে নিয়ে ঘুরবো, না পোষ্টার লিখব ?

কেন তোর দিদি কোথায় গেল ?

কি জানি। তার এখনও মুখ হাত ধোয়াই হয়নি। এই তো কেবল উঠলেন।

বিরক্তি ও হতাশায় মুখ দিয়ে একটা 'হুঁ' বেরিয়ে এল সুবীরের। ও গিয়ে একটা পিঁড়ি টেনে বসল রান্নাঘরের দাওয়ায়। সুনয়নী নাত জামাইকে খেতে দিলেন।

রমেশ খেয়ে রওনা হয়ে গেল। মা, আসছি।

এস, দুর্গা, দুর্গা।

সুবীর নীরবে খাওয়া শেষ করল। তারপর কোন কথা না বলে সোজা বেরিয়ে যেতে লাগল। কথা ছিল লেখা পোষ্টারগুলো ও নিয়ে গিয়ে হাটতলায়, খেয়াঘাটে ও চৌরাস্তার মোড়ে লটকে দেবে।

পোষ্টার লেখা হয়নি শুনে রেগে গেছে। রিণী বললে, ঠা'মা একে একটু ধরবে ? বলে সুনয়নীর কোলে ছেলেটাকে বসিয়ে দিল।

যে পাঁচখানা পোস্টার লেখা শেষ হয়েছিল সেগুলো ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে। রিণী সেগুলোকে গুটিয়ে নিয়ে ছুটল। ততক্ষণে সুবীর বাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়েছে।

রিণী কাছাকাছি এসে পেছন থেকে ডাকলে, এই যে শুনুন, কর্মীবাবু, পোষ্টারগুলো কে নিয়ে যাবে? আমাকেই কি বাজার পর্যন্ত দিয়ে আসতে হবে নাকি? তাতে ত মাটি ফেটে যাচ্ছে। এমনি করে দেশের কাজ হবে?

সুবীর দাঁড়িয়ে পড়ল। রিণীর কাছে রাগলে আরও বেশী করে ঠকতে হয়। বললে, লেখা হয়নি, তার আর কি নিয়ে যাব।

ক'খানা হল তা তো জিজ্ঞাসা করনি। যে ক'খানা হয়েছে তাই নিয়ে বিশেষ বিশেষ জায়গায় সেঁটে দিলে তো কাজ এগিয়ে যাবে। না, রাগ করে মুখ গোমড়া করে থাকলে কাজ হবে। চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া। বউ এর পরে রাগ হল, দেশের কাজ চুলোয় গেল। নাও এই পাঁচখানা হয়েছে। বাজারের দু'মাথায় দুখানা, মাঝে একখানা, খেয়াঘাটে একখানা, চৌরাস্তায় একখানা এ বেলাতেই মেরে দাও। আজ হাটের লোকের নজরে পড়বে। তাতেই তো অর্ধেক প্রচার হয়ে যাবে।

সুবীর বুঝলে এ বেলায় পোস্টার না দিলে খুবই ভুল হয়ে যাবে। পোস্টার সংখ্যায় কম হোক। কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে আজ সকালেই তা লটকে দিতে পারলে তার কার্যকারিতা হবে অদ্ভুত। এ কথাটা সুবীর আদৌ ভেবে দেখেনি। বারে বারে আঠা পোস্টার ঘাড়ে করে লাগাতে ছোটার ঝামেলার দিকটাই শুধু সে এতক্ষণ দেখছিল।

রিণীর হাত থেকে পোস্টারগুলো নিয়ে সুবীর বললে, তুমি ঠিক বলেছ। বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো।

রাজনীতি করতে গেলে মাথা ঠিক রাখতে হয়, অত ভাবাবেগে চললে রাজনীতি করা যায় না।

সুবীর চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। রিণী আবার বললে, কিগো আত্মাভিমানে লেগে গেল বুঝি।

না সত্যি কথাই তো বলেছ।

তা হলে যাও এখন পালাও। আর রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে থেকে লোকের কাজের ক্ষতি করো না।

কি রকম?

ঐ রকম আর কি। আমরা এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করলে, লোকেও কাজ ফেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকবে না?

ও, এই কথা। বলে হেসে সুবীর এগিয়ে গেল।

মাথায় বুদ্ধি এত কম হলে কি করে কি করবে তুমি।

রিণী ফিরছে। বৈঠকখানা থেকে জ্যোতিষবাবু দেখতে পেয়ে ডাকলেন রিণী মা, তোমাকে যে সকাল থেকে আজ দেখতে পাচ্ছিনে। একটু চাও খাওয়ালে না।

রিণী লজ্জিত হলো। অন্যায় হয়ে গেছে জেঠু। আমি না সকাল থেকেই সেই পোস্টারগুলো লিখতে বসে গেছি। তোমাকে চা দেবার কথা মনেই হয়নি। এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

না, মা, শোন, তোমাকে এখন আর চা করতে হবে না। তার চেয়ে চল এক কাজ করা যাক।

কি কাজ জেঠু ?

তুমি সকালে খেয়েছ ?

না।

তবে চল আমরা খেয়ে নিয়ে তোমার ঠাকুমাকে ছেড়ে দিই। এরপর আবার রোগীপত্র আসতে পারে। চা বরং বেলা ৯টা ১০টা করে একবার খেলে হবে। তোমার ঠাকুমাকে খাবার দিতে বল।

রিণী ছুটতে ছুটতে চলে গেল—ঠা'মা জেঠুকে ভাত দাও, আর আমাকেও। কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে রেখে দিল। খেয়ে দেয়ে একটানা হয়ে বসবে।

জ্যোতিষবাবু খেয়ে উঠে বললেন, রিণী মা, একটু তামাক দাও। রিণীর আজ জ্যাঠামশায়ের সেবার অনেক ত্রুটি ঘটেছে। তাই বোধ হয় জ্যোতিষবাবু তার পরবর্তী কর্তব্যটা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

রিণী আজ সকালে জেঠুর গড়গড়ার জল বদলে দেয়নি। রিণীর নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছিল। শুধু ক'খানা পোস্টার লিখতে গিয়ে সে যদি নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য কর্ম ভুলে যায় তবে তার দ্বারাই বা কাজ হবে কি করে ? তাকে আরও সব দিকে খেয়াল রেখে চটপটে হয়ে কাজ করতে হবে।

রিণী দৌড়ে গিয়ে গড়গড়ার জল পালটে তামাক সেজে কলকের আগুনে দিয়ে ফু দিতে দিতে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল।

জ্যোতিষবাবু ততক্ষণ বলরামের সঙ্গে কথা বলছেন। বলরাম বাজারে একটু দর্জির কাজ শিখছে। কিছু জমি জায়গা আছে তা সবই হাজা বিলে। নোনা জলে ডুবে গিয়ে প্রায় কোন বৎসরই ধান হয় না। তাই জমির উপর নির্ভর করে চলে না। আর কিছু আয়ের ধান্দা দেখতে হয়। এতদিন বাজারে—কাশেম

আলির দোকানে দর্জির কাজ শিখছিল। সম্প্রতি একটা পুরানো সেলাইকল কিনে নিজেই বসেছে বিশ্বাসদের দোকানের বারান্দায়।

জ্যোতিষবাবু বলছিলেন, ওর জন্য ভেবনা বলরাম। ওরকম জ্বরজারি ছেলেপিলে থাকলেই হবে। ও ঠিক ম্যালেরিয়া হয়েছে। কম্প দিয়ে জ্বর আসে। ঘাম দিয়ে ছাড়ে, মাথায় যন্ত্রণা, জল পিপাসা—ও সব ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। ও শুধু হোমিওপ্যাথিকে যাবে না। এখন ঔষধ নিয়ে যাও। আর আমি একবার দেখে কুইনিন দিয়ে দেব। তুমি দু'টো টাকা সংগ্রহ করে রেখো।

যা ভাল হয় করুন খুড়োমশাই। টাকা পয়সা বেশী খরচা করে, চিকিৎসা করার সাধ্যও তো নেই। সবই তো আপনি জানেন।

না, বেশী পয়সাকড়ি খরচ করতে হবে না। টাকা দুয়ের মত ঔষধের দাম লেগে যাবে। তা তুমি দু'চারদিন সময় নিয়ে যোগাড় কর। আমি ঔষধ দিয়ে দেব। তোমার কোন ভাবনা নেই। তারপর তোমার আর সব খবর কি বল।

খবর আর কি খুড়োমশাই, কোনরকমে দিনটা কেটে যাচ্ছে।

ধান তো আজ ক'বছরই পাওনি।

আমার জমি বলতে যে ক'বিঘে তা সবই তো ঐ হাজা বিলে। এক ছটাকও ধান পাইনে।

তা হলে চালাচ্ছ কি করে?

কাশেম আলির কাছে একটু দর্জির কাজ শিখেছিলাম। একটা পুরানো সেলাইকল কিনেছি। বিশ্বাসদের দোকানের বারান্দায় বসি। গরহাটবারে বিশেষ কিছুই হয়না। যাওয়া আসা সার। তবে হাটবারে হাটবারে পাঁচ সাত টাকা পাই। তাতেই কোনমতে চালাই।

তা পাঁচ সাত টাকা হলে নেহাৎ মন্দ না।

তা হয়। লুঙ্গি সেলাই, জামাকাপড়ে তালি আঁটা, টুপি সেলাই—এতেই তো পয়সা। এক আনা, দু আনা করে সাত আট টাকা পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু হলে কি হবে। এক ঘোলে আর কত জল সয়। ওতেই তো সব খরচ চালাতে হয়। তার উপর শচীন বিশ্বাসের দোকানের বারান্দার এক কোণে একটু বসি আর ওদের ঘরে কলটা তুলে রেখে আসি—তাই মাসে পাঁচ টাকা ভাড়া দিতে হয়।

বল কি! এর জন্যে শচীন আবার তোমার কাছে ভাড়া নেয়?

তা নইলে আর বলছি কেন খুড়োমশাই। অতবড় ব্যবসায়ী আমার মত মরা গরীবকে পড়ে থাকা বারান্দার এককোণে একটু বসতে দেয়—তার জন্যে পাঁচটা টাকা না নিলে তাদের চলে না।

দেখ গরীবকে শোষণ না করলে বড়লোক বড়লোক হয় না। হাটের ইজারাদার শুনেছি যে হারে তোলা তুলছে তাতে গরীব চাষীদের খুব কষ্ট হচ্ছে।

এক কুড়ি বেগুন নিয়ে হাটে গেলে চার পাঁচটা বেগুন তোলা না নিয়ে ছাড়বে না।

আন্দোলন ছাড়া এসব অত্যাচার বন্ধ হবার কোন উপায় নেই, বলরাম। শচীন বিশ্বাস তো আবার সিনেমা বসিয়ে গরীবদের চোষার নতুন কল পেতেছে। এত পাড়াগাঁয়ে সিনেমার কি দরকার।

সে তো ঠিক কথা খুড়োমশাই। লোকে খেতে পাচ্ছে না অথচ সিনেমা দেখতে যাচ্ছে। ছেলেরা পয়সা চুরি করে সিনেমা দেখছে।

কৃষকদের সংঘবন্ধ করতে হবে। আন্দোলন করে সিনেমা বন্ধ করতে হবে। হাট তোলা বন্ধ করতে হবে, আর ঐ দোয়ানে খালে বাঁধ বাঁধতে হবে যাতে ঐ হাজা বিলে আবার প্রতি বছর চাষ হয়। নৈলে চাষীদের বাঁচার পথ নেই।

খালে বাঁধ দিয়ে আবাদ করতে পারলে তো দেশের লোক বেঁচে যেত। কিন্তু কি করে হবে খুড়োমশাই? আবাদ না হলে তো জমিদারের ভাল। খাজনা বাকীর দায়ে জমি খাস করে নিচেহ। নোতুন করে বন্দোবস্ত দিচ্ছে জেলেদের কাছে। আমাকে বনমালী কচ্ছিল, বলরাম তোমার জমিতে একটা খানা খুড়ে রাখ না কেন। বছরে একশ টাকা করে দেব।

খবরদার, অমন কাজও করো না বলরাম। চাষের জমি নষ্ট করে গর্ত খুঁড়তে যেয়ো না।

আবাদ হলে কি গর্ত খুঁড়ি খুড়োমশাই, কিন্তু এমনি খেতে পাইনে। খাজনা পাতি দিয়ে জমি রাখি কি করে।

এতদিন যেমন করে রেখছ। আর একটা বছর রাখো। এইবারই বাঁধ বেঁধে ফেলতে হবে। চাষীরা সংঘবন্ধ হলে সব হবে। একতা চাই। আমরা কৃষক সমিতি গড়ে তুলছি। এই অঞ্চলের সব কৃষকদের একজোট করতে হবে। কোন জমিদারের ক্ষমতা নেই একতাবন্ধ হলে কৃষকদের কিছু করে। শোননি এই শনিবার মিটিং হবে চাকুন্দীর মাঠে। সভায় কিন্তু যাওয়া চাই।

যাব খুড়োমশাই।

হাটের বেলা হচ্ছিল। বলরাম উঠে পড়ে। ঔষধটা বাড়ীতে দিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে হাটে যেতে হবে। হাতে পয়সাকড়ি একেবারে নেই। ঔষধটার দাম পর্যন্ত দেওয়া হল না। তেল, নুন, কিছু চাল কেরোসিন – সবই আজ হাটের উপর নির্ভর করছে।

জ্যোতিষবাবুর আরও কথা বলার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বলরাম জোর করে উঠে পড়ল—হাটের বেলা হয়ে যাচ্ছে খুড়োমশাই, আজকে উঠি। মিটিং-এ ঠিক যাবো।

জ্যোতিষবাবু ঠিক কথা বলেছেন, খালে বাঁধ দিতে না পারলে এ অঞ্চলের চাষীদের বাঁচার কোন পথ নেই। কিন্তু সে বাঁধ কি সত্যি সত্যি হবে? জমিদার বাধা দেবে—থানা পুলিশ করবে, কত হৈ হুজ্জুৎ হবে। বলরামের ভরসা হয় না।—

আজ হাটবার। রোগীপত্র বেশী হবে না। লোকজন সব হাটে যাবে। যার নেহাৎ বাড়াবাড়ি সে ছাড়া কেউ হাট কামাই করে ঔষধ নিতে আসবে না। জ্যোতিষবাবুর মনের মধ্যেও মিটিংটা সফল করার চিন্তাই ঘুরছে বেশী করে।

রিণী মা, কি করছ তুমি?

এই যে জেঠু, আমি পোস্টারগুলো লিখছি।

ক'খানা হলো?

পাঁচখানা লিখে বীরুদার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। হাটের এ মাথায়, ও মাথায় মাঝখানে, খেয়াঘাট ও চৌরাস্তার মোড়ে দেবার জন্যে। আরও খান পাঁচেক হল প্রায়।

তুমি বসে বসে লিখে ফেল। আমি একবার হাট থেকে ঘুরে আসি।

তুমি আবার হাটে যাবে জেঠু?

যাই একবার। হাটে গেলে বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়। বিভিন্ন গ্রামের মোড়লদের সঙ্গে দেখা পেলে বলে আসব তারা যেন লোকজন নিয়ে দলে দলে মিটিং আসে। আর হাটে একটা ঢেড়া দিতে বলে আসি।

সকাল সকাল ফিরবে কিন্তু।

হ্যারে ফিরব। বারোটা একটা নাগাদ ফিরে পড়ব, বলে জ্যোতিষবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

॥ ৮ ॥

রিণীর আজ ক'দিন যে কি হয়েছে সে নিজেই কিছু বুঝতে পারে না। সবসময় মনের মধ্যে কি যেন একটা অস্থিরতা। শুয়ে ঘুম হয় না। প্রায় সারারাত ছটফট করে কাটে। সারা মন জুড়ে এক অসীম শূন্যতা। সমস্তদিন ও বেশী করে নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে। সামনের দিনের জনসভার সব খুঁটিনাটি ব্যবস্থা তারই নির্দেশমত হচ্ছে। পোস্টার লেখা, হ্যাণ্ডবিলের ড্রাফট করে ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা, বিলিকরার ব্যবস্থা, গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ—কোথায় কে কি করবে—সবকিছুর পুংখানুপুংখ নির্দেশ দিয়েছে রিণী। আর সেইমত কাজ হচ্ছে

কিনা তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব খোঁজও রাখছে। আর এজন্য ওকে সুবীরের সঙ্গে, জেঠামশায়ের সঙ্গে, অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে দিনের অধিকাংশ সময় এমন কি রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত কাটাতে হয়। কিন্তু তারপর যে সময়টুকু থাকে তাও যে কাটে না। মনের মধ্যে হু হু করে যায়। কি চায় মন তা সে জানে না। অন্ততঃ খুব স্পষ্ট নয় তার কাছে। আজ সে যা কাজ পেয়েছে তাতে তার খুব ভাল লাগছে।

সুবীরের বন্ধু মন্মথ, মনিরুদ্দি, নন্দ, অনিল, ভোলা, সুবল—এইসব যুবক কর্মীগুলো তার নির্দেশ বিনাবাক্যে মাথা পেতে নিয়ে ছুটছে। মন্মথ ভিন্ন সবাই ওকে দিদি বলে ডাকে - যদিও ও অনেকেরই বয়সে ছোট।

সেদিন সুবলের দেখা করার কথা ছিল সন্ধ্যা ছ'টায়।

সে এল রাত আটটার পর।

বাইরের ঘরে আরও কয়েকজন কর্মী আছে। আছেন জ্যোতিষবাবু এবং সুবীরও। সুবল সামনে এসে দাঁড়াতেই রিণী বললে, এখন ক'টা বাজে সুবল।

ঘড়িতো নেই, তা রাত আটটা নটা হবে।

তোমার ক'টায় খবর দেবার কথা ছিল ?

সন্ধ্যে ছ'টার মধ্যে।

তোমার ঐ খবরটার জন্য আমরা দু' ঘণ্টা বসে আছি। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। সময়ের মূল্যজ্ঞান যার নেই, তার দ্বারা দেশের কাজ হয় না। অন্ততঃ কর্মী হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের কর্মী তালিকায় তোমার নাম থাকবে না। বাইরের থেকে যতটা সাহায্য করা সম্ভব তাই করবে তুমি।

সুবল মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের মধ্যে আর কেউ কোন কথা বলছে না।

সুবীরের বন্ধু সুবল। সে তখন বলল, এবারের মত ওকে ক্ষমা করলে হয়। আমাদের সব কর্মীরা এখনও খুব সচেতন নয়। কাজের মধ্যে দিয়ে ওরা তৈরী হয়ে যাবে।

এই দুর্বলতার ভেতর দিয়ে দলীয় শৃংখলায় ফাটল ধরবে। আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। পৃথিবীর সবদেশের সব আন্দোলনের ইতিহাসে সেই কথাই বলে। দলের ভেতর যদি লৌহদৃঢ় শৃংখলা না থাকে তবে জনসাধারণকে তুমি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে নিয়ে যাবে কিসের জোরে। দেখ, জ্যাঠামশাই কি বলেন।

রিণী ঠিকই বলেছে। আমাদের দলীয় আদর্শ হবে কঠোর শৃংখলাপরায়ণতা। তবে আমরা এখনও একটা সুসংবদ্ধ দল গড়তে পারিনি। এবং তা করতে আরও

কিছুদিন সময় লাগবে। ততদিন তোমরা যারা আজ কাজ করে যাচ্ছ সকলের কাজেরই আমরা নোট রাখব। আর তাই দেখে আমরা তোমাদের সাধারণ কর্মী, সভাকর্মী ইত্যাদি হিসাবে দলভুক্ত করে নেব। সুবল এখন যেমন কাজ করে যাচ্ছ যাবে। এমন অবহেলা আর কখনও করো না সুবল। আর এদের কাজের নোট রাখার দায়িত্ব রইল রিণীমার উপর।

সেদিন থেকে রিণীর আর একটা কাজ বেড়ে গেছে। কাকে কি কাজ দেওয়া হল এবং সে নিষ্ঠার সঙ্গে সেই কাজ সময়মত কতটা সফলতার সঙ্গে করতে পারল তার ডাইরী রাখা।

এত কাজ করেও তার সময় ফুরায় না। দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর সে কি করবে ভেবে পায় না। সুবীর তখন বাড়ী থাকে না। জ্যাঠামশাই একটু বিশ্রাম করেন। কাকীমাও এই সময় ঘরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেন। দিদি কমলাও ছেলেকে নিয়ে ঘরে দরজা দেয়। আর ওদের সঙ্গে রিণীর তেমন জমেও না। কমলা তো বড় একটা কথাবার্তাই বলে না তার সঙ্গে।

একমাত্র ঠাকুরমা সুনয়নী দেবী এই বুড়ো বয়সেও না ঘুমিয়ে এই বারান্দায় মাদুর পেতে চোখে চশমা এঁটে কাঁথা সেলাই করতে বসেন।

রিণী গিয়ে বসে ঠাকুরমার কাছে। বলে, ঠা'মা আমায় কাঁথা সেলাই করা শিখিয়ে দাও না। তুমি কেমন সুন্দর সুন্দর ফুল তুলতে পার কাঁথায়।

শিখবি? শেখ না। আমি মরে গেলে এ বাড়ীতে আর কাঁথা থাকবে না। সব কম্বল কিনে গায়ে দিতে হবে তোদের। এইসব শিল্পকাজ আজকালকার মেয়েরা আর শিখতে চায়না।

আমি শিখতে চাই ঠা'মা। আমাকে দেখিয়ে দাও!

তবে যা আর একটা সুঁচ আর সুতোর কৌটা নিয়ে আয়। রিণী সেলাই করতে বসে যায়। সুনয়নী দেখিয়ে দেন কেমন করে সুঁচ ধরে ফোঁড় তুলতে হয়।

মধ্যমার অগ্রভাগে একটা ক্যাপ পরিয়ে দেন। নৈলে সুঁচের মুখ লেগে আঙুলের ডগা ফুটো হয়ে যায়।

রিণী সুঁচে সুতো পুরে ফোঁড় তোলে। এমন কিছু কঠিন কাজ না। একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে ফোঁড় তুললেই হয়। দেখতে দেখতে রিণী একটা ত্রিভুজ তুলে ফেলল কাঁথার উপর। তবে বেশ কষ্ট হয়। কোমর পিঠ ব্যথা হয়ে যায়। চোখেও বেশ টান পড়ে। বোধ হয় অভ্যেস নেই তাই। ওর মনে হয় কাঁথাটা জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ে। নরম কাঁথাটাকে ওর খুব ভাল লাগে। আজ একটা কাঁথা বের করে ও জড়িয়ে ধরে ঘুমাবে। ভাবতেই ওর যেন কেমন রোমাঞ্চ

লাগে। ও চোখ বুজে দেয়ালটায় হেলান দিয়ে বসে। ওর নিশ্বাসটা কেমন দ্রুত বইতে থাকে।

সুনয়নী বলেন, কিরে, হয়ে গেল তোর সেলাই করা। তবে তো তোরা কাঁথা সেলাই করেছিস।

না, ঠা'মা বড় কষ্ট হয়। পিঠটা কেমন ব্যথা করে যায়।

এই বয়সে পিঠ ব্যথা করে। বলিস কি। দেখ তো, আমি বুড়ো হয়েছি, তবু তো কোন কষ্ট হয় না।

তোমার সঙ্গে আমার কথা। তুমি এখনও যা সংসারের কাজ কর, আমরা তার এক কণাও পারবো না।

রিণী আর বসতে পারে না। ঘরের ভেতর চলে যায়। এখনই ছেলেরা আসবে। তাদের নানা জনকে নানা কাজ দেওয়া আছে। কে কতটা করল বলবে। আর কি করতে হবে সব বলে দিতে হবে। চুলটা বেঁধে নিতে হবে। ও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। নিজের বুকের দিকে ওর নজর পড়ে। বুকটা বিশ্রী রকম উঁচু হয়ে আছে। ওর ভারী খারাপ লাগে। ভাল করে এটে বেঁধে নিয়ে তারপর ব্লাউজ পরবে। হাত দিয়ে বুক দুটো চেপে চেপে গায়ের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চায় ও। ছেলেগুলো চুপি চুপি ওর বুকের দিকে তাকায়। ও বুঝতে পারে। আর স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে ওর কেমন আটকে যায়। অবশ্য বুক দুটো চেপে দিলেও ফুলে ওঠে। আজ থেকে একটা চাদর গায়ে দিয়ে গিয়ে বসবে। ঠোঁটটাও ওর ভারী বিশ্রী লাল। কত মেয়ের ঠোঁট তো কালো। তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হয় না। ওর কেন তেমন হলো না। ওর নিজেকেই নিজের চুমু খেতে ইচ্ছে করে। ও উপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে জিভ দিয়ে চাটতে থাকে।

হঠাৎ ওর যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। এ সব কি ভাবছে ও। এসব ভাববার অবসর কোথা তার? আর কেনই বা ভাববে সে? জীবনের খিড়কীর দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে। সদর দরজাও এতদিন বন্ধ ছিল। সে ছিল বন্দিনী। আজ সদর দরজা খুলে গেছে। সে এই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। সামনে তার মহান কর্তব্য। দেশের অগণিত নিপীড়িত জনসাধারণের মুক্তির সংগ্রামে তার সামিল হবার ডাক এসেছে। সে সেই ডাকে সাড়া দেবে—মনপ্রাণ দিয়ে সাড়া দেবে। ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য ও চঞ্চলতা ত্যাগ করে তাকে জেগে উঠতে হবে সেই মহান ব্রতে।

দেহ মনের জড়তা ভাঙতে দু-চার বার বৈঠক দিয়ে নেয় রিণী। তারপর চটপট কাপড় পরে নিয়ে কাগজপত্র হাতে বেরিয়ে পড়ে। জ্যাঠামশাইকে হাত মুখ

ধোবার জল দিয়ে তামাক সেজে দিয়ে ও গুছিয়ে বসবে। কেউ যেন এসে না দেখে যে সে প্রস্তুত নয়।

মন্মথ এসে খবর দিল, সব আয়োজন সম্পূর্ণ। আর কি করতে হবে বল।

মন্মথর কাছ থেকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনে নিয়ে খুসী হয়ে উঠল রিণী। এই তো চাই।

কাল বাদে পরশু সভা। কোন গ্রাম থেকে কে জনগণের মিছিল পরিচালনা করে নিয়ে যাবে সব ঠিক হয়ে গেছে। সভার আয়োজনের ব্যাপারেও কে কি করবে, সব ব্যবস্থা পাকা এবং সকলেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন।

ইতিমধ্যে সুবীর, অনিল, দুলাল, নন্দ এরাও এসে গেছে।

কিন্তু একটা কথা ভাই সব। তোমরা তো সকলেই আমাদের প্রোগ্রাম জান। যাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম তারাও নিশ্চয়ই জানে।

অনিল বললে, তা জানে বইকি। আমরা তো গোপনে কিছু করছি না। সোচ্চার হয়ে প্রচার করছি আমরা কি চাই। কি আমাদের দাবী।

তা হলে তোমরা কি মনে কর তারা নির্বিঘ্নে আমাদের প্রোগ্রাম সফল করতে দেবে? তারা কি এতই বোকা, এতই দুর্বল?

দুলাল বললে, কি করবে তারা, দিদি। আমরা হাজার লোক, তারা কয়জন?

সুসংবদ্ধ না থাকলে, প্রস্তুত না থাকলে একশ লোকও একটা দু'টো লোকের হাতে নাকাল হতে পারে।

নন্দ দলের মধ্যে হৃষ্টপুষ্ট। নিয়মিত কুস্তি লড়ে, হা-ডু-ডু খেলে। ফুটবল ও পেটায়।

চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে ওর। উত্তেজিতভাবে বললে। আমরা কাপুরুষ নই দিদি। আসুক না কে আসবে, অমন দু' পাঁচটার মাথা একা এই নন্দ গুঁড়ো করে দেবে। নন্দর বজ্রমুষ্টি হাতদুটো উপরে উঠে এল।

তা জানি নন্দদা। তবে শারীরিক বলের দ্বারা এ সংগ্রামে জেতা যাবে না। চাই বুদ্ধিবল, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা চাই। ওরা হয়ত এমন কাজ করবে যাতে আমরা উত্তেজিত হয়ে ওদের কাউকে খুন জখম করি। আর তা হলেই ওদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোন্ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ প্রয়োজন তা কেষ্টবাবুর মত নেতার নির্দেশ না নিয়ে কেউ যেন উত্তেজিত হয়ো না, বা বলপ্রয়োগ করে বসো না। কেউ গালি দিলেও তাকে শান্তভাবে বোঝাতে চেষ্টা করবে।

জ্যোতিষবাবু বললেন, রিণী ঠিকই বলেছে, তোমরা সহসা সংযম হারাবে না। সংযমই প্রকৃত শক্তি।

আর একটা কথা আমার মনে হয়, জেঠু।

বল।

প্রতিপক্ষ আমাদের কার্যসূচী ব্যর্থ করার জন্য কি ভাবে তৈরী হচ্ছে তা আমাদের গোপনে খোঁজ রাখা এবং তদনুরূপ তৈরী থাকা দরকার। কারণ আমাদের প্রতিপক্ষ খুবই প্রবল। অর্থ এবং রাজশক্তি তাদের পক্ষে। আমাদের একটা গোয়েন্দা শাখা প্রয়োজন।

সুবীর বলল, কথাটার যৌক্তিকতা অস্বীকার করি না। তবে তার জন্য উপযুক্ত লোক বাছাই করাও তাদের ঠিকমতো ট্রেনিং দেওয়া চাই। নতুবা হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশী।

জ্যোতিষবাবু বললেন, আমাদের সংগঠন আগে দানা বাঁধুক ভাল করে, তখন ও সব কথা ভাবা যাবে। তা বাদে আমরা জনগণের ঐক্যের উপর বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল। গোয়েন্দার উপর নির্ভর করে গণআন্দোলন করা চলে না।

তা ঠিক জেঠু, তবে রাজনীতিতে গোয়েন্দার ভূমিকা চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে যেমন ছিল, তেমনি আছে হিটলারের জার্মানীতে, আবার স্টালিনের রাশিয়াতেও। সংগঠনের ওটাও একটা অংশ হিসাবে সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠতে ক্ষতি কি ?

আচ্ছা, তোমার প্রস্তাব কেষ্টবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে কি ভাবে রূপায়িত করা যায় দেখা যাবে।

এই অঞ্চলে সংগঠনের যাবতীয় দায়িত্ব জ্যোতিষবাবুর উপর। তিনি সে দায়িত্ব পালন করছেন রিণীকে সামনে রেখে। ওকে এগিয়ে দিয়ে ওকে তিনি তৈরী করে নিতে চান। আসলে জ্যোতিষবাবু রিণীর চেয়েও খুশী হয়েছেন বেশী। তিনি যেন অকূলে কূল পেয়েছেন। নিজের স্ত্রী ছেলেমেয়ে কিছু নেই। মা মরা এই ভাইঝিটিকে তিনি কোলে পিঠে মানুষ করেছেন। বিয়ে দিয়েছিলেন মনের মত দেখে। লেখাপড়াও মোটামুটি শিখিয়েছিলেন। তাই রিণীর ভাগ্য বিপর্যয়ে তিনি বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। কি যে করবেন ওকে নিয়ে কিছুই ভেবে পেতেন না।

একদিন সুনয়নীকে নিভৃতে বলেছিলেন, কি করি বলো তো মা। সুনয়নী তার এই জেষ্ঠ্যপুত্রকে জানেন, যেমন রাশভারী তেমনি একগুঁয়ে। দেশের লোক তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করে। বহু সময় সামাজিক নানা অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বজ্রগম্ভীর প্রতিবাদ করেছেন। ভবিষ্যৎ ভাবেন না, একাই হাজার লোকের বিরুদ্ধে এগিয়ে যান। তবে মায়ের অমতে কোন কাজ করেন না। অবশ্য মাকে জিজ্ঞাসা করে যে সব

কাজে এগিয়ে যান তা নয়। তবে জিজ্ঞাসা যখন করেন তখন তাঁর মতের বিরুদ্ধে যান না।

সুনয়নীও কথা কম বলেন। আর এই বড় ছেলে কিছু জিজ্ঞাসা করলে ভেবে চিন্তে উত্তর দেন।

জ্যোতিষবাবুর গলার স্বরে সুনয়নী চমকে উঠলেন। ছেলে তো অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে। তবে তার স্বরে এমন কাতরতা ও বেদনা তো ঝরে পড়ে না।

উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি রে, কি হয়েছে তোর ?

জ্যোতিষবাবু ম্লান হেসে বললেন, আমার আবার কি হবে মা ? বলছিলাম রিণীর কথা।

কেন, রিণীর আবার কি হল ? আমাকে তো কিছু বলেনি।

তোমাকে আবার ও কি বলবে ? ওর আর একটা বিয়ে দিলে হয় ?

বিধবা বিয়ে ? অনেক দূরে থেকে যেন একটা মৃদু স্বর ভেসে এল।

হ্যাঁ মা, আইনে তো কোনো বাধা নেই। মধ্যিমাঝে দু' একটা কোথাও কোথাও হয়ও তো।

আমাদের সমাজে কোথাও হয়েছে কি ?

না, মা, তেমন তো শুনিনি।

অন্য সমাজে যা দু'একটা হয়েছে, তারা এক ঘরে হয়ে আছে, তাই না ?

হ্যাঁ, মা। রিণীর জন্য আমরাও না হয় এক ঘরে হয়ে থাকবো। পারব না ?

তোমার ভাইদের মতামত জান ?

না, মা। তাদের মতামত পরে জিজ্ঞাসা করব। তাদের যদি অমত থাকে, তবে আমি রিণীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাব। তারপর বিয়ে দেব। এক ঘরে হয়ে থাকতে হয় আমি থাকব।

রিণী এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, তার মতামত জান ?

তোমার অনুমতি পেলে তবেই তো জানার চেষ্টা করব।

সে যদি অমত করে ?

অমত করলে হবে না। কিন্তু রাজী হলে তখন যদি তোমার অমত হয় তবে সে খুব আঘাত পাবে।

ঠিক বলেছ। কিন্তু বিধবা বিবাহ দিলে তা সুখের হয়েছে বলে তো শুনিনি। সাধারণতঃ যারা বিধবা বিবাহ করতে রাজী হয় তারা চালচুলোহীন। সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা নেই। হয়ত কারো বউ মরে গেছে, মা-হারা ছেলেপুলে আছে কতকগুলো।

এমন কিছু না কিছু থাকে। তারপর সমাজ থেকে প্রায় একঘরে হয়ে তারা আরও অসুবিধায় পড়ে। ফলে তাদের সংসারে অশান্তি ও তিক্ততা বাড়ে। এইসব সহ্য করে মনের শান্তিতে ঘরসংসার করা সহজ নয়।

তা ঠিক, তবে—

তবে যদি এমন ছেলে জোটে। আর তাদের মধ্যে ভাব-ভালবাসা হয়ে বিয়ে হয়—তবে সুখশান্তি থাকলেও থাকতে পারে হয়ত।

জ্যোতিষবাবু অবাক হন। বলেন, মা তুমি এত বোঝ কি করে। এভাবে তো কোনদিন ভেবে দেখি নি। তবে ও চিন্তা এখন থাক।

তাই ভাল, বলে সুনয়নী অন্যত্র গেলেন।

কিন্তু জ্যোতিষবাবুর মনে শান্তি নেই। তার চোখের সামনে মেয়েটি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে—এ তিনি সহ্য করতে পারেন না। কিছু একটা কাজের মধ্যে মেয়েটিকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে হয়ত সে আবার সজীব হয়ে উঠতে পারে।

ওকে নার্সিং পড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ও জ্যাঠামশাইকে ছেড়ে, বাড়ী ছেড়ে যেতে চায় না। অবশেষে নিজের ডাক্তারীর মধ্যে ওকে টেনে নিয়েছিলেন। তথাপি তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমন উৎসাহ আনতে পারেননি ওর মধ্যে। এখন এই দেশের কাজ নিয়ে রিণী সত্যিই মেতে উঠেছে। জ্যোতিষবাবুও তাই অকৃত্রিম উৎসাহে তাকে এগিয়ে দিয়েছেন।

সভার একদিন আগেই সব আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু রিণীর হঠাৎ শরীরটা খারাপ হয়ে পড়েছে।

রিণীর মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই। সভায় যাওয়া হয়নি বলে নয়। আজ কি হয় এই ভেবে। অবশ্য আর কারো মনে তেমন কোন চিন্তা নেই। কিন্তু রিণী যেন ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। আজকের সভা থেকে শুরু হবে প্রত্যক্ষ আন্দোলন। সিনেমা বন্ধের আন্দোলন, হাট তোলা বন্ধের আন্দোলন। সিনেমা ও হাটের মালিক শচীন বিশ্বাস, বংশী সাহা ও মোকছেদ আলি—কি ভাবে এর মোকাবিলা করবে, না বুঝতে পারলেও যেন রিণী নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

ওরা কি ভাবছে তা জানার জন্য ও গোপনে লাগিয়েছে বলরামকে। বলরাম শচীন বিশ্বাসের দোকানের বারান্দায় বসে দর্জির কাজ করে। ও একটা আভাস সংগ্রহ করলেও করতে পারে। অবশ্য বলরামকে দিয়ে গোপনে খবর সংগ্রহ করার কথা ও কাউকে বলেনি। জ্যোতিষবাবু ও সুবীর পর্যন্তও কিছু জানে না। কিন্তু

বলরাম কালও তার মেয়ের জন্য ঔষধ নিয়ে গেছে — আজ আর ঔষধ নিতে আসেনি। সেও কোন খবর পায়নি তাই।

একা একা বিছানায় শুয়ে কিছুই ভাল লাগছে না রিণীর। পেটের ব্যথাটা একটু কমেছে বটে, কিন্তু পেটের নাড়িভুড়ি যেন টেনে কে বের করে নিচ্ছে।

রিণীর কল্পনায় ভেসে উঠছে এতক্ষণে মিটিং শুরু হয়ে গেছে। কতলোক জুটেছে। হয়ত এবার কেষ্টদা বক্তৃতা করতে উঠেছেন। সুবীর কেষ্টদার নাম ঘোষণা করে দিলে চারিদিকে জোর হাততালি পড়ছে।

কেষ্টদা বক্তৃতা করছেন। কি বলছেন তিনি? হয়ত বলছেন পাড়াগাঁয়ের বুকে এই সিনেমা বন্ধ করে দিতে হবে। সিনেমার নাম করে দরিদ্র চাষী মজুরদের শোষণ করা হচ্ছে। ছেলেরা চুরি করে পয়সা জোগাড় করছে — চুরি করে ঘরের ধান চাল বিক্রি করে এনে সিনেমা দেখছে। আর মোটা লাভ লুটছে দু' তিন জন ধনী ব্যক্তি। কাল থেকে আমরা পালা করে সিনেমার সামনে পিকেটিং করব।

হয়ত এমন সময় পুলিশ এসে লাঠিচার্জ করে সভা ভেঙ্গে দিচ্ছে। কেষ্টদা, সুবীর, জ্যাঠামশাই সবাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কি যে ওদের হচ্ছে কে জানে।

॥ ৯ ॥

সেদিন অধিক রাত্রি, জ্যোতিষবাবু ফিরে এলেন। সুনয়নীর একটু ঘুম ধরে গিয়েছিলো। রিণী জেগে শুধু এপাশ ওপাশ করছে। জ্যোতিষবাবু ডাকলেন, মা, মাগো।

সুনয়নী উঠে বসলেন। তোমরা এসে গেছ. একেবারে হাত মুখ ধুয়ে এস। আমি ভাত দিচ্ছি।

না, মা আর কেউ আসেনি। আমি একা। এত রাত্রে আর খাব না। তুমি খেয়েছ তো?

না, বাবা। আমি তো আজ খাব না। আমার তো একাদশী। ও, তবে শুয়ে পড়।

ইতিমধ্যে রিণী উঠে এসে বললে, এত রাতে কি করে এলে জেঠু। এত দেরী হল কেন? মিটিং এ কোন গোলমাল হয়নি তো?

না, মা,। কোন গোলমাল কিছু হয়নি। খুব ভালভাবে মিটিং হয়ে গেল। বহু লোক এসেছিল।

তবে এত রাত্রি করলে কেন ?

মিটিং-এর পর বিষ্টুবাবুর বাড়ী সব কর্মীরা বসে আবার কার্যপদ্ধতি ঠিক করা হল। আগামীকাল থেকে সিনেমা হলের সামনে পিকেটিং করা হবে। কেষ্ট-বাবুই প্রথম দল পিকেটারদের নেতৃত্ব দেবেন। ওরা আজ বিষ্টুবাবুর বাড়ীতেই রয়ে গেলেন।

তুমিও রয়ে গেলে না কেন ? এতরাত্রে আসতে তোমার ভয় করল না ? খেয়া পেরুলে কি করে ?

জ্যোতিষবাবু হেসে বললেন, না, ভয় করবে কেন ? কিসের ভয় ? আর ভুবনকে বলাই ছিল, ফিরতে রাত হতে পারে। সে যেন ঘাটে থাকে। আর না এলে তোমরাও চিন্তা করতে না ?

চিন্তা তো সবসময় করছি। আমার ঘুমই ধরেনি। বীরুদা আসেনি ?

না। সেও ওদের সঙ্গে আছে।

তোমাকে তামাক দেব, জেঠু ?

না, থাক। এত রাতে তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমার কাছে বিড়ি আছে।

পরদিন দুপুরের পর জ্যোতিষবাবু বেরিয়ে গেলেন। পিকেটারদের দলে তিনি থাকবেন না। তবে কি হয় একবার গিয়ে দেখতে হবে। বাড়ীতে বসে থাকতে পারলেন না।

রিণীর আজ শরীরটা অনেকটা ভাল। পেটব্যথা নেই। কিন্তু হাঁটাচলা সম্ভব নয়। গোটা তলপেটটা ব্যাথা হয়ে আছে। সারতে এখনো দিন দুই লাগবে। মনের মধ্যে উদ্বেগ নিয়ে এমনি চুপচাপ শুয়ে বসে থাকা রিণীর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

আজই তা হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু। এরা পিকেটিং করে সিনেমা বন্ধ করে দেবে। আর মালিক পক্ষ চুপ করে বসে থাকবে।

তা নিশ্চয় হবে না।

আজ নিশ্চয়ই কিছু না কিছু গ্রেপ্তার হবে। সুবীরও সেই দলে থাকবে হয়ত। জেলে যাওয়া অবশ্য ওর অভ্যেস আছে। ভয় পায় না। তবে স্বদেশী করে জেলে যাওয়া এক কথা, আর সিনেমা বন্ধ করে জেলে যাওয়া এক কথা। এ সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়ছে, তাদের উপর দলে দলে

পুলিশের একটা শ্রদ্ধা আছে। তাই উপরওয়ালার হুকুম না হলে তাদের উপর ওরা তেমন অত্যাচার করতে চায় না। কিন্তু এদের ওরা সে চোখে দেখবে কেন ?

তা বাদে সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাদের একটু খাতির করতো। তাদের পেছনে তখন দেশবরেণ্য নেতারা। সেও একটা কারণ ছিল তাদের সমীহ করার। বাইরে যতই হম্বিতম্বি দেখাক, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, সুভাষচন্দ্র—এঁদের সরকার মনে মনে ভয় করত।

সুবীরের কাছেই শুনেছে, দমদম সেন্ট্রাল জেলে খাওয়া দাওয়ার অব্যবস্থা দূর করার জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থাপনার ভার সত্যগ্রহীরা নিজেদের হাতেই নিল। সেন্ট্রাল জেলে দু'হাজার বন্দীর মধ্যে পাঁচশ সাধারণ কয়েদী, পনেরো'শ সত্যাগ্রহী। এরা একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ, একই লক্ষ্যের সংগ্রামী পথিক। এদের সংঘশক্তিকে কোন সরকারই অবহেলা করতে পারে না।

নিজেদের মধ্যে কঠিন শৃংখলা আনতে এরা বারোটি ওয়ার্ডে ভাগ করে নিল সর্বসত্যাগ্রহীদের। প্রতি ওয়ার্ডের নেতা নির্বাচিত হল। উচ্ছৃংখল আচরণের বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। জেলের মধ্যে যেন আর একটা সরকার বসে গেল। বিচারের পর অপরাধী অনুতপ্ত না হলে পাঁচ থেকে পঁচিশ ঘা বেত।

কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যের একটা মোটা অংশ পেছন দরজা দিয়ে ছোট বড় জেলকর্মীদের ঘরে গিয়ে উঠত। সত্যাগ্রহীদের তত্ত্বাবধানে সে পথ রুদ্ধ হল।

একঘেয়ে কারাগার জীবনে বৈচিত্র্য আনতে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সাংস্কৃতিক কার্যসূচী নিলেন সত্যাগ্রহীরা। শুরু হ'ল ছোটখাট পালাগান নিয়ে অভিনয়। সে গল্প সুবীরের মুখে শুনে রিণা তো হেসেই বাঁচে না। খুলনা ওয়ার্ডে ওরা নাকি একদিন কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করে। সুবীর সেজেছিল কৃষ্ণ।

রিণীর সকৌতুক মন্তব্য, তা পছন্দটার তারিফ করতে হয়। পেন্ট করার আর দরকার হল না।

সে তো নিশ্চয়ই। জেলখানায় আবার পেন্ট করার ব্যবস্থা কোথায়। ষোল-আনা অকৃত্রিম অভিনয় যাকে বলে। বাগেরহাটের হরিপদ হল রাধা। ওকে যা সুন্দর দেখতে ছিল। থালা বাটি বাজিয়ে কনসার্ট, আর গামছা দিয়ে ড্রেস।

থাক আর বলতে হবে না। সে যে কি অভিনয় হয়েছিল তা আয়োজনেই বোঝা যাচ্ছে। হেসে গড়িয়ে পড়ে রিণী।

সুবীর গম্ভীর হয়ে বলে, হাসছ কেন ? রীতিমত প্রতিযোগিতা হ'ল সব ওয়ার্ডের মধ্যে। আমাদের খুলনা ওয়ার্ডই ফার্স্ট হয়ে গেল।

রিণীর অবস্থা কাহিল। পেটটা চেপে ধরেছে। হাসতে হাসতে পেটে খিল

ধরে গেল। অতি কষ্টে বলে, কৃষ্ণের গলার ফুলের মালাটা কি দিয়ে করলে? জুতো দিয়ে? বলে আবার ভুক ভুক করে হেসে ওঠে। এবার সুবীরও হেসে ফেলে।

মাঝে মাঝে কংগ্রেসের কর্তাব্যক্তিরা আসতেন সত্যাগ্রহীদের সাথে দেখা করতে। জেলের গেট থেকে তাঁরা সত্যাগ্রহীদের সাথে দেখা করে কথা বলে যেতেন। ভিতরে ঢুকতে পেতেন না। সত্যাগ্রহীদের অভাব অভিযোগ শুনতেন। যথাসম্ভব পূরণ করার চেষ্টাও করতেন। একদিন দেশপ্রিয় এলেন। স্বদেশীরা ঘিরে ধরল তাঁকে। মশার কামড়ে বাঁচিনে। দেশপ্রিয় বললেন, উপায় নেই ভাই। মশা আর ইংরেজ উভয়ের বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। তবে তিনি কাপড় কাচার জন্যে প্রত্যেককে একখানা সাবানের ব্যবস্থা করে গেলেন কংগ্রেস থেকে।

পুজোর আগে এলেন সুভাষ বসু। সবাই ধরল, পুজো করতে চাই। কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনা করে ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রতিমা এল বাইরে থেকে। মহাষ্টমীর দিন কংগ্রেসের তরফ থেকে সব কয়েদী ও স্বদেশীদের লুচি মিষ্টি দই মাংস খাবার ব্যবস্থা হল। এদিকে হচ্ছে গীতা পাঠ, ওদিকে হচ্ছে চণ্ডীপাঠ। রামশরণ মিশ্র গীতা পড়তে পড়তে কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনা করছেন। ব্যাখ্যা করতে করতে ভাবে বিভোর হয়ে অশ্রু বিসর্জন করছেন। বিজয়া দশমীতে বাইরের কংগ্রেসীরা এসে প্রতিমা নিয়ে গেল নিরঞ্জন দিতে।

হঠাৎ রিণীর খেয়াল হ'ল। সন্ধ্যা ঘুরে গেছে। সে কতক্ষণ একা একা অন্ধকারে এই বাইরের ঘরে বসে আছে।

কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে।

কে? রিণী জিজ্ঞাসা করে।

আমি বলরাম, দিদিমণি, বলরাম হাঁপাতে থাকে।

খবর কি? কোথা থেকে আসছ?

চুকনগর থিকে।

রিণীর বুকটা কাঁপছে, নিশ্চয়ই দুঃসংবাদ। একটু থেমে বলে, কি হয়েছে বল।

শচীন বিশ্বাসের গুণ্ডারা কেষ্টবাবুর মাথা ফাটিয়ে দিছে। সিনেমা হোতি পারেনি। পিকেটিং দেখে কেউ আসেনি। ফেরার সময় সন্ধ্যের পর আমবাগানের আঁধারে গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেষ্টবাবুর মাথা কেটে গেছে। আর কারো কিছু হয়নি।

এখন ও'রা আছেন কোথায়?

বিষ্টুবাবুর বাড়ী আইসে ওষুধ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে নিছে। তারপর সবাই

মিলে গ্রামে গ্রামে ঘুরতি গেছে। বড়বাবু সুবীরবাবুও আছে সেই সাথে। ফিরতি পারবেন না। তাই তো খবর পাঠালেন।

আচ্ছা তুমি যাও। কাল সকালে আর একবার খবর দিয়ে যাবে।

রিণী ভেতর বাড়ী গেল। কিছু একটা হবে সে আশংকা ছিল। আর কি হ'ল না জেনে উদ্বেগও ছিল প্রচণ্ড। এখন ভাবনা কি করে খবরটা ঠাকুরমাকে দেওয়া যায়। তাঁকে জানানোর জন্যই তো খবর পাঠানো। নৈলে মা বুড়ো মানুষ ভাববেন। কাল ঐ কারণেই অত রাত্তিরে বাড়ী ফিরেছিলেন জ্যাঠামণি।

সুনয়নী সন্ধ্যাহ্নিক সেরে পিছন ফিরে দেখেন রিণী। কিরে, কিছু বলবি ? সন্দিগ্ধ সন্ধানী চোখ বুড়ীর।

চল না ঠাকুমা। আমরা ঘরে গিয়ে বসব। একা একা ভাল লাগছে না। রিণীর গলায় একটু আবদারের সুর।

চল্। গীতা শুনাবি আমাকে।

ঘরে এসে প্রদীপের আলোয় জুত করে বসে বই খোলে রিণী। তৃতীয় অধ্যায় পড়া শুরু করে। একটানা পড়তে পড়তে তিরিশের শ্লোকে এসে বলে, জান ঠাকুমা 'যুধ্যস্ব' মানে যুদ্ধ কর। আমাদেরও যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে।

সুনয়নী অবাক হন। তোদের আবার কিসের যুদ্ধ !

তাও জান না। তবে আর তুমি কি জান। ঐ যে কেষ্টকাকু আসেন—উনি, জ্যাঠামণি, বীরুদা—আরও অনেকে চাষীদের মাঝে কাজ করতে চান। ওদের বুঝিয়ে বলেন কারা তাদের শত্রু। কাদের জন্য তাদের এই দুঃখ কষ্ট দুর্গতি। চাষী মজুরকে এক হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, যুদ্ধ করতে হবে। সেই যুদ্ধের সেনাপতি কেষ্টকাকু, জ্যাঠামণি, বীরুদা। আর সেই যত চাষী মজুর সব সৈন্য – সবাই যোদ্ধা। এরা হ'ল পাণ্ডবপক্ষ। আর কৌরবপক্ষে আছে জমিদার, ধনী মালিক—এদের সঙ্গে আছে শক্তিমান ধনুর্ধর সরকার।

আর তুই কি ? তুই বুঝি সারথি ? কার রথের সারথি হবি তুই ? বীরুর নাকি ?

কথাটা বলেই সুনয়নী চমকে উঠলেন। একি বললেন তিনি। নাতনীর সঙ্গে রসিকতা। কিন্তু নাতনী যে তার বিধবা। ভুলে গেছলেন তিনি। আর কারই বা মনে থাকে। দিব্যি শাড়ী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যোতিব তাকে কিছুতেই থান পরতে দেবে না। এই কচি মেয়ে কি থান পরে বেড়াবে। তাতে ওর পিতৃপুরুষ আমরা নরকস্থ হই হব। সম্ভব হলে আবার ওর বিয়ে দেবার কথাও ভাবে সে।

তবু সবীরকে নিয়ে রসিকতা করা মোটেই ঠিক হয়নি। এমনিতে দেশের কাজ

উপলক্ষে সুবীরের সঙ্গে রিণীর মেলা-মেশা সকলের চোখে ভাল ঠেকছে না। কমলা তো এই নিয়ে ভাল করে কথা বলে না রিণীর সাথে। তবু উনি রিণীকে বারণ করতে পারেননি। জ্যোতিষ নিজে যার মধ্যে আছে সেখানে তিনি বাধা দিতে চাননি। তা বাদে দেশের কাজে নেমে রিণীর মধ্যে যেন আবার প্রাণের সাড়া জেগেছে। মুখে হাসি ফুটেছে। তার আগে যেন ওর দিকে তাকানই যেত না।

ঠা'মার মন্তব্যে রিণীও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। বুকের মধ্যে একটা কম্পন অনুভব করছিল ও। তবে কি ঠাকু'মা সুবীরের সঙ্গে ওর মেলামেশায় সন্দেহ করেছেন কিছু।

ও কিছু বলতে পারেনি। ও মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শক্ত হয়ে উঠতে চাইল। বেশী নরম হলে সকলেই পায়ে দলে। কেন, কি অন্যায় করেছে সে। সে কি সকলের সঙ্গে মিলে দেশের কাজে হাত লাগাতে পারে না।

কিন্তু ও কথা বলতে চাইলেও, বলতে পারল না। তার চেয়ে যেন সুনয়নীর কথাটা ও খেয়ালই করে নি এইভাবে ঐ শ্লোকটা নিয়েই কথা বলতে চাইল।

বললে, খুব কঠিন কাজ। তাই না ঠা'মা। আমরা কি অমনিভাবে যুদ্ধ করতে পারব?

পারলেই হবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ তো তাই বলেছেন। ঠাকুরের ই'চ্ছায় সব হয়। আমরা বৃথা আমার আমার করি। তাইতো এত দুঃখ পাই।

তুমি পার ঠা'মা? মায়ামমতা নেই, শোকদুঃখ নেই, কামনা বাসনা নেই এমনি করে কাজ করা, বেঁচে থাকা যায়? জয়লাভের আশা না রাখলে কি যুদ্ধ করা যায়?

না গেলে কি ঠাকুর এমনি বলেছেন। পারার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যুদ্ধ করতে গেলে অনেক সময় ক্ষয়ক্ষতি হবে, পরাজয় হবে—তাতে যেন ভেঙ্গে না পড়। সেই জন্যই ঐ রকম বুদ্ধি নিয়ে, ভগবানের উপর সব ফলাফল ভালমন্দ ছেড়ে দিয়ে কাজ করতে হবে।

তুমি ঠিক বলেছ ঠা'মা। আঘাত সহ্য করে টি'কে থাকতে গেলে কারো উপর নির্ভর করতে হয়।

সুনয়নী চুপ করে থাকেন। যেন ঠাকুরকে স্মরণ করছেন। রিণীও কিছু সময় চুপ করে থাকে।

কারো বুকে মাথা রেখে চোখ বুজে তার উপর সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে তার কথামত শুধু কাজ করে যাও—এর চেয়ে শান্তি আর নেই। কিন্তু যার উপর নির্ভর করব সে যেন একটা রক্ত মাংসের মানুষ হয়—তার হৃদয় যেন দরদ আর ভালবাসায় পূর্ণ থাকে—সে যেন হয় আকাশের মত উদার আর পৃথিবীর মত সহনশীল।

কি সব অবাস্তব ভাবনা ভেবে চলেছে রিণী। হঠাৎ ওর খেয়াল হয়। মানুষের ভালবাসার জন্য মনটা ছটফট করে। কিন্তু সে ভালবাসার মূল্য কি? এত নশ্বর যে জীবন তার স্নেহভালবাসার উপর তুমি কতক্ষণ নির্ভর করবে।

ঐ সব আজেবাজে ভেবে লাভ কি। যা সামনে পাব তাই ধরে ভেসে যাব। যা কাজ থাকবে তাই করে যাব। যে ক'দিন যে ভাবে কাটে কাটবে। তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা করার কোন অর্থ নেই। সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নিতে হবে হাসিমুখে। আর মানুষের ভাল থাকার জন্য যদি কিছু করে যাওয়া যায়—সেই হল মানুষের একমাত্র সান্ত্বনা। হঠাৎ রিণী সচকিত হয়ে ওঠে। যেটা এখনই বলতে হবে সেটা বলা হয়নি। ও বললে, ঠা'মা জান আজ আর জ্যাঠামণি বাড়ী আসবে না। খবর পাঠিয়েছে। সুনয়নী ব্যগ্র হয়ে বললেন, কেন, কিছু হয়েছে নাকি।

না, ঠা'মা। তার কিছু হয়নি। তবে শচীন বিশ্বাস গুণ্ডা লাগিয়ে কেষ্ট-বাবুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

এ্যাঃ। কেষ্ট বেঁচে আছে তো?

রিণী হেসে ফেলে সুনয়নীর উদ্বেগ দেখে। না ঠা'মা তোমার অত ভাবনার কিছু নেই। আসলে কিছুই হয়নি। সামান্য একটু আঁচড়ে গেছে মাত্র।

তবে তার জন্য বাড়ী আসবে না কেন? আমাকে ভাড়াচ্ছিস।

না, তুমি বিশ্বাস করো। তোমাকে কখন ভাড়াতে পারি। আজ সারারাত ওদের খুব কাজ। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই কথা বলে কাল হাজার হাজার লোক জড়ো করে শচীন বিশ্বাসকে শিক্ষা দিতে হবে। ওর সিনেমা চিরদিন বন্ধ করে দিতে হবে। তাই তো বলছিলাম বড়লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ আমাদের শুরু হয়ে গেছে।

আচ্ছা ঠা'মা, আমরা এই যুদ্ধে জয়ী হতে পারব?

সত্যের জয়, ধর্মের জয় একদিন হবেই।

সুনয়নী উঠে পড়লেন। বললেন, তুই বসে বসে পড়। আমি একটু রান্নাঘর থেকে আসছি। আজ কমলা রান্না করছে। ওর মা'র শরীরটা তেমন ভাল নয়। আবার হয়ত ছেলেমেয়ে হবে। আজ ক'দিন মাথা ঘোরে, গা বমি বমি করে, খেতে পারে না। বুড়ীর হয়েছে যত জ্বালা। সবদিক না দেখলে চলে না। এত বড় সংসার অথচ কাজের লোক ঐ একটা বউ। কমলা অবশ্য খানিকটা করে। তাও ঘর জামাই পাওয়া গেছিল বলে রক্ষে। তা নৈলে কি হ'ত কে জানে।

রিণীর মনে হ'ল, ঠা'মা মুখে যাই বলুক, ছেলের জন্যে, নাতজামাইয়ের জন্য বুড়ী মনে মনে উতলা হয়ে উঠেছে। আর সেটাই গোপন করতে উঠে গেল।

রিণীরও আর পড়তে ভাল লাগে না। কোন কিছু করতেই ভাল লাগে না। এখন ওরা কোন গ্রামে বেড়াচ্ছে, কি করছে কে জানে।

মাঝে মাঝে এমন এক একটা ভুল করে বসে যার জন্যে ওর নিজের উপর ভারী রাগ হয়। বলরাম এসেছিল। বললেই হত তুমি রাত্রি দশটা নাগাদ আর একবার খবর দিয়ে যেও কি হচ্ছে। মনেও হয়েছিল, কিন্তু বলতে পারে নি। মনের উদ্বেগটা কারো চোখে ধরা পড়ে যায় তা সে চায় না। ভয় ঠিক নয়, লজ্জাও নয়। মোটের উপর এমন একটা ভাব বজায় রাখা দরকার বলে মনে হয় যাকে বোধহয় গীতায় বলেছে 'বিগত জ্বর'।

ঠিকই তো। এই যে অস্থিরতা, উদ্বেগ এ তো একরকম মানসিক জ্বর। নির্মম হলেই বিগত জ্বর হওয়া যায়। কারো প্রতি, কোন কিছুর প্রতি মায়া নেই, মমতা নেই। তার মানে জীবনের প্রতিও না। তবে আমি বাঁচব কেন, কাজ করব কেন। এই সৃষ্টি তবে কেন।

কথাগুলো যুক্তিহীন মনে হয় রিণীর। সত্যকে তুমি কি দিয়ে চিনবে—যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে, না হৃদয়ের উপলব্ধি দিয়ে। এই যে তার মনটা আকুপাকু করছে কি হচ্ছে না হচ্ছে জানার জন্য, এর চেয়ে সত্য কি আছে। এই যে তার হৃদয় নিঃসঙ্গতা ও একাকীত্বের বেদনায় ছটফট করছে এ যদি সত্য না হয় তবে সত্য কি? চোখের জল, মুখের হাসি যদি মিথ্যে হয় তবে সত্যকে খুঁজতে যাব কোথা।

রিণী উঠে পড়ে। বইটা মুড়ে তুলে রাখে। বিছানাটা ঝেড়ে ঠিকঠাক করে নেয়। হঠাৎ ওর মনে পড়ে আজ ওর চুল বাঁধা হয়নি। রাত্রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধতে দেখলে ঠাম্মা বকবে। ও দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চিরুণী তুলে নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে ওর মনে হয় আজ সন্ধ্যায় ও জামা কাপড় বদলায়নি। সমস্ত শরীর দিয়ে একটা তীব্র ঘামের গন্ধ বেরুচ্ছে। ওর কেমন ঘৃণা করতে লাগল।

ও চুলে চিরুণীটা গেঁথে রেখে ঝট করে জামাটা খুলে ফেলল। আর অমনি অনাবৃত বুক থেকে দুটো জ্বলন্ত হিংস্র চোখ যেন একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে রইল। ও তাড়াতাড়ি জামাটা বুকে চেপে দিয়ে আর একটা জামা খুঁজতে লাগল। বগলের ঘামে ভেজা জামাটার একটা তীব্র গন্ধ যাতে ওর গা ঘিনঘিন করে উঠছিল তাই যেন এখন একটা নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে। খাটের বাজুতে বুকটা চেপে ধরে ও সেই নেশার ঝোঁকটা সামলে নিতে চাইল। বাইরে কে যেন ডাকছে। একটা আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে ওকে ফিরে আসতে হয়। ও জামা পাল্টে চুলটা বিনুনী করতে করতে বেরিয়ে আসে।

সুনয়নী বললেন, ওরা তো আজ আসবে না। তোর কাকার ফিরতে তো এখনও অনেক দেরী? তোরা আর সবাই খেয়ে নে। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়। তোর কাকা এলে খাইয়ে দিয়ে আমি শোব।

কমলা রান্নাঘরের দাওয়ায় ওর ছেলেটাকে দুধ দিচ্ছে। পেচ্ছাব করে জেগে গেছে। দুধ খেতে খেতে এক্ষুণি আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

রিণী গিয়ে আসন পেড়ে নিয়ে বসল। তাই দাও ঠাঁমা। আমারও আজ খুব ঘুম পাচ্ছে। ভাবছিলাম শুয়ে পড়ি।

সুনয়নী সকলের খাবার গুছিয়ে দিচ্ছেন! আর সবাই ঘরের ভিতরেই বসে গেছে।

কমলা আজকাল খুবই কম কথা বলে রিণীর সঙ্গে। আজ কিন্তু নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলে। কি হয়েছে রে রিণী। ঠাঁমা যে বলছে ওরা আজ বাড়ী আসবে না।

মারপিট হয়েছে, মাথাটাথা ফেটে গেছে। আসবে কি করে?

কার মাথা ফেটেছে? মারল কে?

মেরেছে শচীন বিশ্বাসের লোকেরা। কেষ্টবাবু না কা'র মাথা ফেটেছে।

কে বললো?

ঐ যে একটা লোক এসেছিল। সেই বলে গেল।

কখন এসেছিল?

এসেছিল সেই সন্ধ্যের আগে আগে।

তা তুই তো এতক্ষণ বলিস নি কিছু।

তার আর বলব কি। এই তো শুনলে।

রিণীর কথায় কমলার ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে ওকে দু'ঘা বসিয়ে দেয়, ওরই জন্য তো সুবীর আবার পাগলের মত এইসব করে বেড়াচ্ছে। দিব্যি বেশ সংসার ধর্মে মন দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করছিল। আবার সব কাজকর্ম ফেলে যেমন বাউণ্ডুলে ছিল, তেমনি বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়াচ্ছে। দেশের কাজ করছে। দেশের কাজ না ছাই। বলে, রিণীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার জন্যই ওর দেশের কাজ।

আর কি হবে দেশের কাজ করে। বউ ছেলেপিলের পেটের ভাত হবে? দাঁড়াবার তো একবিন্দু জায়গা নেই। শ্বশুরবাড়ী ঘর-জামাই হয়ে আছে। ঘেন্না পিত্তিও নেই।

ও-কি মানুষ। মানুষ হলে কেউ ঘর জামাই থাকে। যার না আছে চালচুলো,

না আছে মুরোদ এমনি ছেলের সাথে কেউ মেয়ের বিয়ে দেয়। ঐ জ্যাঠার জন্যই তো। বড় জ্যাঠার উপর ভীষণ রাগ হয় কমলার।

না, ওর কপাল। কপালে তার এই ছিল। সবাই মিলে তাকে শাস্তি দিচ্ছে, ঐ বড় জ্যাঠা। বাবাও তেমনি। যার হাতে সে পড়েছে, সেও। রিণী। না কে? ক্রোধ আর অসহায়তায় কমলার ভিতরটা যেন জ্বলতে থাকে।

গুম মেরে থাকে ও।

রিণী বুঝতে পারে দিদি রেগে গেছে। ওকে একটু জব্দ করতেই ও চাইছে। কেন ও অমন করবে তার সঙ্গে। যেমন ওর ছোট মন তেমনি ও শাস্তি পাক। আসল কথাটা যা ও জানতে চাইছে তা ওকে কিছুতেই বলবে না আজ। অন্ততঃ একটা রাত্রি না ঘুমিয়ে ছটফট করুক।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে কমলা আবার বললে, আর কারো কিছু হয়েছে কিনা বললি নে তো। জ্যাঠামশার কিছু হয়নি?

তেমন তো কিছু লোকটা বলল না।

তবে তিনি এলেন না কেন?

তিনি সকলের বড়। ওদের আহত ফেলে রেখে তিনি আসেন কি করে।

তারও মাথা ফেটেছে নাকি?

কার?

জানিনে। তুই দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্ছিস।

অতিকষ্টে হাসি চেপে রিণী বলে, ও বীরুদার কথা বলছ?

তা হয়ত ফাটতেও পারে। সে যখন নেতা হয়ে উঠেছে, তখন তাকে কি আর ছেড়েছে।

তুই জিজ্ঞেস করিসনি তার কথা?

বয়ে গেছে আমার জনে জনের অত খবর নিতে। আর জিজ্ঞেস করলেই কি সবার খবর সে দিতে পারত?

তা জিজ্ঞেস করবি কেন? তোর জন্যেই তো সে ঐ সব হাঙ্গামার মধ্যে যায়। তোর কাছে বাহাদুরী দেখাবার জন্য।

রিণীর বেশ মজা লাগছিল। তাই সে রাগ করলো না। বললে, ওটা তোমার ভুল ধারণা। ছোটবেলা থেকে সে ঐ সব করে বেড়াচ্ছে। দু' দুবার জেল খাটা হয়ে গেছে তার দেশের কাজ করতে যেয়ে। দেশের কাজে বীরত্ব দেখাতে যে যাবে তার আমি কি করব। ক্ষমতা থাকে আঁচলে বেঁধে রাখলে পার।

স্বামীকে বশে রাখতে না পারার অক্ষমতা ও অপমানে সে নিজেই জ্বলছিল—

সেই জ্বালার উপর নুনের ছিটে দিল রিণী। অসহ্য ক্রোধে ও বলতে যাচ্ছিল, তুই কেমন সতী, তোর কত জোর, কত ক্ষমতা—তা তো সবাই জানে। তোর মত ধুপসী রাঢ় হয়ে—

সুনয়নী বললেন, তোদের দু' জনকেই কি বারান্দায় দেব নাকি?

কমলা বলে উঠল, আমি খাব না ঠা'মা। আমার ক্ষিধে নেই।

কেন, কি হ'ল আবার তোর?

রিণী বলে উঠল, রাগ হয়েছে।

কেন, কি-সে রাগ হ'ল আবার?

ঐ যে বীরুদা আজ বাড়ী আসবে না। সেই জন্যে তার উপর রাগ।

ও এই কথা। তা আসুক না নাতজামাই। আমি ভাল করে বকে দেব। যাতে আর কখনো বাইরে রাত না কাটায়। নে দুটি খেয়ে নে। ছেলেপিলের মা—রাত উপোস করে থাকতে নেই। বারান্দায় দেব নাকি?

না, আমি ঘরে যাচ্ছি।

রিণী বললে আমিও না হয় ঘরে যাচ্ছি ঠা'মা। নৈলে তুমি বুড়ো মানুষ ঘর বারান্দা করতে তোমার কষ্ট হবে।

কমলা ছেলে বুকে করে কোন কথা না বলে হন্ হন্ করে ওর ঘরে চলে গেল। যেন ওকে শুইয়ে রেখে এখনি আসবে। কিন্তু রিণী থাকতে আর ফিরল না।

সুনয়নী মাঝে মাঝে ডেকে চলেছেন, ও কমলা, কি করছিস্ এতক্ষণ। একটু তাড়াতাড়ি আসবি তো?

॥ ১০ ॥

গ্রামের জনা বিশেক কর্মী, আগে আগে কেষ্টবাবু ও জ্যোতিষবাবু পাশাপাশি, সুবীর সকলের শেষে, সেই শ্লোগান দিচ্ছে, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। কেষ্টবাবুর জয়ধ্বনি দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আজকের জয় অনিবার্য, রিণীর তা জানাই ছিল, অভ্যর্থনারও একটা ব্যবস্থা সে করে রেখেছে। এক ঝুড়ি কৃষ্ণচূড়া ফুল পাড়ি ভেঙ্গে রেখেছে, আর একটা লাল গোলাপ।

এগিয়ে গিয়ে ফুলগুলো ছড়িয়ে দিল ও সকলের মাথায়। কেষ্টবাবু এক হাতে

ওকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। কেষ্টবাবুর হাতে ও তুলে দিল লাল গোলাপটা। কেষ্টবাবু বললেন, প্রথম যুদ্ধে আমাদের জয় হল, মা।

আমি সব শুনেছি, কাকু।

কার কাছে শুনলে?

আমি সব খবর রেখেছি।

বেশ, বেশ, আমার অনেক সময় মনে হয়েছে তোমাকে সব খুঁটিনাটি জানাই। কিন্তু সময় করে উঠতে পারি নি। তুমি খুব উদ্বিগ্ন থাকতে, তাই না?

তা একটু থাকতাম বই কি? তবে জেঠু মাঝে মাঝে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছেন।

ও তাই বুঝি। তা যাক, এখন রণক্লান্ত সন্তানকে কি খাওয়াবে বল দেখি, তবেই বুঝি, মা।

আগে বসুন না স্থির হয়ে। দেখা যাক কি ব্যবস্থা করা যায়।

বাইরের ঘরে সবাই বসে পড়লেন। কেষ্টবাবুর মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সারারাত্র ঘুম নেই। গ্রামে গ্রামে ঘোরা। আজ দশ পনের হাজার লোক নিয়ে ঘেরাও করা, সময়ে খাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। এখন বিকাল হয়ে গেছে।

দু'বালতি জল, গামছা আর চৌকি পেতে দিয়ে গেল রিণী। সবাই হাত মুখ ধুয়ে নেবে। যদি এমন সময় ওরা ফিরে আসে তবে কি ভাবে কি করা যাবে তা মোটামুটি ভেবেই রেখেছিল রিণী। সুবীরকে ডেকে নিয়ে গোটা কয়েক শুকনো নারকেল ভেঙ্গে কাটারি দিয়ে ফালি কেটে তোলাল, কাগজের ঠোঙায় সকলের জন্য মুড়ি, নারকেল আর খেজুর গুড়ের দিশী চিনি। সুবীরই সব বয়ে বয়ে এনে দিল। গুছিয়ে দিলেন সুনয়নী, রিণী এল নিজের হাতে চা করে নিয়ে।

এত অল্প সময়ে যে এতসব ব্যবস্থা হবে সে কেষ্টবাবু তো দূরের কথা, জ্যোতিষবাবুও ভাবতে পারেন নি। তাই সব চেয়ে খুশী হয়ে উঠলেন তিনি। এদের কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা না হলে তার খুবই খারাপ লাগতো। কিন্তু এই অ-বেলায় কি ব্যবস্থাই বা হতে পারবে। তা তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না।

খেতে খেতে কেষ্টবাবু বললেন, অসময়ে খেতে চেয়ে ভাবছিলাম হয়ত না ভেবে-চিন্তে তোমাকে বিব্রত করে বসলাম। তা দেখছি, তোমাকে ঠকানো গেলনা, মনে হয় তুমি তৈরীই ছিলে।

তা খানিকটা প্রস্তুতি ছিল বৈকি। আপনারা যে এসে পড়বেন তা তো জানাই ছিল।

কিন্তু, কখন আসব, কতজন আসব তা তো আর জানতে না।

মোটামুটি ভেবে নিয়েছিলাম সন্ধ্যার মুখে এসে পড়বেন। তবে কতজন আসবেন ধারণা ছিল না। ভেবে নিয়েছিলাম দশ বিশ জন হতে পারেন।

জ্যোতিষবাবু কিছু বলছেন না। স্নেহে আরে প্রশংসায় বুকখানা ভরে গেছে তার। ছোট থেকে যাকে বুকে করে মানুষ করেছেন তাকে যেন নূতন করে আবিস্কার করছেন। মনের পাত্রটা তার এমন কানায় কানায় ভরে ছিল যেন তা থেকে কিছু ঢালতে গেলেই অপচয় অনিবার্য। তাই নিমগ্ন হবার গভীর তৃপ্তি নিয়ে তিনি নীরব হয়ে আছেন।

কেষ্টবাবুই আবার বললেন. এবার জ্যোতিষবাবুকে উদ্দেশ্য করে, জানেন দাদা, মা আমাদের কি দিয়ে অভিনন্দন করেছেন? লাল ফুল দিয়ে—আমার হাতে দিয়েছেন একটা লাল গোলাপ। লাল রংটা কিসের প্রতীক জানেন তো?

সংগ্রামের। আর সাদা হল শান্তির, সন্ধির। জ্যোতিষবাবু মন্তব্য করলেন। শান্তি নয়, সন্ধি নয়, সংগ্রাম, নিরন্তর সংগ্রাম। ইনক্লাব জিন্দাবাদ। বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে যান কেষ্টবাবু।

রিণী বেরিয়ে গিয়েছিল। জ্যেঠামণির তামাক সেজে আনতে। কলকেয় ফুঁ দিয়ে গড় গড়াটার মাথায় বসিয়ে দিয়ে বললে, তা আমার কি নিন্দে হচ্ছিল, কাকু? আমায় দেখে সবাই চুপ করে গেলেন।

কেষ্টবাবু হেসে ফেললেন, তোমার নিন্দে করি সে হিম্মৎ নেই, মা, এমন করে যে খাওয়াতে জানে তার যদি নিন্দে করতে হয়, তবে থাক পড়ে দেশের কাজ। আমার দরকার নেই ওসব করে। বলছিলাম কি জান, তুমি আজ বিজয়ের দিনে আমাদের লাল ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা করলে কেন।

লালই তো সংগ্রামের প্রতীক, কাকু।

তবে আজকের সংগ্রামে তো আমরা জয়ী—অনিল বলে উঠে।

তার মানে এই নয় যে এখানেই আমাদের সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল। বরং বলা যেতে পারে আজকের জয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের সংগ্রাম শুরু হল।

কেষ্টবাবু সমর্থন জানালেন, ঠিক বলেছ। আজকের সংগ্রামের জন্য যেমন আমাদের লেগেছে প্রস্তুত হতে, তেমনি আজ থেকে শুরু হবে সামনের দিনের—প্রস্তুতি।

সে তো বটেই। জ্যোতিষবাবু বললেন, আজকের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগনের মধ্যে যে উত্তেজনা, যে ঐক্য চেতনা এসেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে। শিথিল হতে দেওয়া যাবে না—আজই পরবর্তী সংগ্রাম ধারার কথা ভাবা দরকার।

ইতিপূর্বে জনসভায় এবং গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্যের মাধ্যমে আমরা আমাদের

সংগ্রাম সূচীর একটা আভাস জনগনের সামনে উপস্থিত করেছি। আমরা চাই জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে লড়তে। এখন প্রশ্ন হল কোথা থেকে আমরা আন্দোলন সুরু করব, কোন ইস্যুকে ধরে।

জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হলে সব চেয়ে বড় ইস্যু হবে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন, জ্যোতিষবাবু বললেন।

তা বটে। তবে খাজনা বন্ধ আন্দোলনের জন্য চাই দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, তা বাদে খাজনা বন্ধ আন্দোলন করলে শুধু জমিদার নয় সরকারের গায়েও সরাসরি হাত পড়বে—সরকারের রাজস্ব-প্রাপ্তি বিঘ্নিত হবে। আমরা এখনও এমন শক্তি অর্জন করতে পারিনি যে সেই ঝুঁকি নিতে যাওয়া সমীচীন হবে। আরও একটা দিক আছে এবং সেইটিই বড় দিক। সব মৌজার জনসাধারণ খাজনা বন্ধের আন্দোলনের সামিল হতে চাইবে না। হাজা অঞ্চলের জনসাধারণ এই আন্দোলনকে যেমন মনে প্রাণে সমর্থন করবে, যে অঞ্চলে মোটামুটি ফসল হয় সেখানকার জনগন তেমন সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিতে এগিয়ে আসবে না। ফলে আমরা যেটুকু ঐক্য চেতনা আমরা আনতে পেরেছি তা নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ যেখানে সরাসরি শোষিত হচ্ছে সেখানে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে তবেই তো সে সহজে জেগে উঠবে। এখন আপনারা ভেবে বের করুন কি নিয়ে আন্দোলন করা যায়।

আপনিই বলুন। আমরা বরং যদি কোন অসুবিধা মনে করি তা নিয়ে আলোচনা করব।

কেষ্টবাবু বললেন, আমি ভাবছিলাম হাট তোলা বন্ধ আন্দোলন করার কথা। হাটের মালিক জমিদার। জমিদার হাট ইজারা দেয় ইজারাদারকে; সে সব চাষী বিক্রেতার কাছ থেকেই জুলুম করে তোলা আদায় করে। এতে সব চাষী ভাইএর সমর্থন মিলতে পারে। জমিদারের গায়েও হাত দেওয়া হবে।

এ সম্বন্ধে পার্টির উপর তলার নির্দেশ কিছু নেই কি?

অমন করে নির্দেশ পাঠাবার রীতি নেই। আমরা যারা ক্ষেত্রে কাজ করছি, আমরাই স্থির করবো কিভাবে কি নিয়ে আন্দোলন করা হবে। আর তাই হওয়া উচিৎ নয় কি?

জ্যোতিষবাবু এবং উপস্থিত সকলেই স্বীকার করে যে তাই হওয়া উচিৎ।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির করা হল হাট তোলা আন্দোলনই করা হবে। বিস্তারিত কার্যসূচী গ্রহণের জন্য আরও একদিন পরে সবাই সমবেত হবে। প্রত্যেক গ্রামসভা থেকে সক্রিয় সমীঁরা সেই সভায় জমায়েত হবে। উপস্থিত সকলের উপর ভার দেওয়া হ'ল কে কোন গ্রাম সভার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে, সবাই উঠে পড়ল।

রিণী একটু আগেই উঠে গেছে, সন্ধ্যে দেবার কাজটা তার, তার উপর হ্যারিকেন বাতিগুলো পরিষ্কার করে তেল দিয়ে ধরিয়ে নিতে হবে। সুনয়নীদেবী হ্যারিকেন ধরাতে পারেন না। ও সব কলকব্জার ব্যাপার দেখলে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়। তার ছোট বেলায় রেড়ীর তেলের বাতি জ্বলত, কি সুন্দর শান্ত সেই আলো, এইসব বিদেশী কলকব্জা আর বিদেশী তেল এর প্রতি তাঁর একটা প্রচণ্ড বীতশ্রদ্ধা। কোন দিন তিনি হ্যারিকেন জ্বালার চেষ্টাও করে দেখেন নি। কেরোসিন তেলের গন্ধটাও তার কাছে প্রায় অসহ্য। উপায় নেই, তাই কেরোসিন বাতিতে কাজকর্ম করতে হয়। তথাপি সুবিধা পেলেই তিনি সরষের তেলের পিদিম জেবলে নেন।

বাড়ীর আর কেউ হ্যারিকেন ধরালে আলো ভাল হয় না। বাতিটা আর কেউ সুন্দর করে তুলতে পারে না। একদিকটা উঁচু হয়ে যাবে, নয়ত দু কোণ উঁচু হয়ে থাকবে। মুহূর্তের মধ্যে কাঁচটায় কালি জমে আর দেখার মত থাকবে না। জ্যোতিষবাবু ভয়ানক বিরক্ত হন আলোটা ধবধবে সুন্দর না হলে, তাই রিণীকে নিতে হয়েছে এ কাজটা। কাঁচটা গোবর বা বালি দিয়ে মেজে ধুয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে, বাতি ছেটে পরিস্কার করে তেল দিয়ে হ্যারিকেন ধরিয়ে নিয়ে এল রিণী।

জ্যোতিষবাবু ও কেষ্টবাবু গেছেন চান করতে। সন্ধ্যে বেলায় গা ধোওয়া গরমের দিনগুলোতে রিণীরও অভ্যেস।

ওদের ফেরার মধ্যে তাকেও গা ধুয়ে তৈরী হয়ে চা করে আনতে হবে। আর একবার তামাক দিতে হবে জেঠুকে।

চায়ের পর আবার সান্ধ্য আসর বসবে, ভাঙ্গবে রাত দশটায়। কোন কোন দিন এগারটা বারোটা হয়ে যায় ভাঙ্গতে। আজ অবশ্য কেষ্টবাবু বলে রেখেছেন রাত দশটার মধ্যে শুয়ে পড়বেন। আজ সবাই ক্লান্ত।

কেষ্টবাবু বললেন, আমাদের আগামী আন্দোলন সম্পর্কে মায়ের কোন মতামত নেওয়া হয়নি কিন্তু দাদা, কথাটা জ্যোতিষবাবুকে লক্ষ্য করেই বলা। তবে তিনি কোন মন্তব্য করার আগেই রিণী বলে উঠল, এ আপনার ভারী অন্যায়, কাকু। আপনি সব সময় অমনি করে বলেন। আমি কি বুঝি. আমি আবার কি বলব।

এবার জ্যোতিষবাবুই বললেন, না রিণী, তোমার মতামতকে আমরা যথেষ্ট মূল্য দেই। তা বাদে বয়সে এমনকি বিদ্যায়ও যারা ছোট তাদের কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখবার আছে। তোমার দ্বিধার কোন কারণ নেই। তুমি নিঃসংকোচে তোমার মতামত জানাবে। কোন সময়ে তার দ্বারা হয়ত আমরা খুবই উপকৃত হব।

আর আলোচনার প্রয়োজনই তো তাই। অনেক সময় অনেক জিনিষই তো আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়।

এবারের আন্দোলনে আমাদের জয়লাভ কিন্তু সহজ হবে না কাকু। আদৌ জয়লাভ হবে কিনা সন্দেহ, রিণী বলল।

কেষ্টবাবু, জ্যোতিষবাবু, সুবীর কেউ কোন কথা বলছেন না। একমুহূর্ত নীরব থেকে কেষ্টবাবু বললেন, শুনেছেন দাদা, রিণী মা কি বলছে ?

জ্যোতিষবাবু গড়গড়ায় একটা টান মেরে বললেন, আচ্ছা রিণী, জয়লাভ বলতে তুমি কি বোঝ ?

রিণী বললে, হাটে তোলা বন্ধ হলে তবেই মনে করব আমাদের আন্দোলন জয়যুক্ত হল।

আমরা কিন্তু তা মনে করিনে। জনগণ যেদিন ভাবতে শিখবে যে এই তোলা আদায় করা তাদের উপর অন্যায় শোষণ ছাড়া আর কিছু নয়, সেই দিন আমাদের আন্দোলন সফল হল মনে করব। জনগণের মধ্যে এই চেতনা এনে দিতে পারাতেই আমাদের সফলতা।

সুবীর উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আমরা এভাবে জিনিষটা ভাবিনি কোনদিন।

এই গণ-চেতনার জাগরণের জয়গান গেয়েছেন কবি—তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয় · ···। সেই তিমির বিদায় করার সাধনাই আমাদের।

কেষ্টবাবু গুনগুন করে গানটা ধরলেন। রিণীও সুর মেলাল। গানটা থামলে জ্যোতিষবাবু বললেন, আমি কি ভাবছি জানেন ? এবারে সংগ্রামটা বেশ কঠিন হবে। কাজেই কে কে করতে যাবে, কে কে নেতৃত্ব দেবে তা যেমন স্থির করতে হবে, তেমনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থারও একটা ছক তৈরী করে নিতে হবে। সংগে সংগে গ্রামে গ্রামে যে কৃষক সংগঠন হয়েছে তাকে সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। এই আন্দোলনের প্রস্তুতির সংগে সংগে সেই সংগঠনের প্রাথমিক কাজগুলোও শেষ করে নিতে হবে।

কেষ্টবাবু বললেন, আন্দোলনের পুরোভাগে তো থাকতেই হবে আমাকে। সেটা বুঝতে পারছি। আমি ভাবছি আপনার অনুপস্থিতিতে পরের কাজগুলো চালানোর কথা।

সে কাজ আপনাকেই করতে হবে। সংগে থাকবে সুবীর আর রিণী। আমার পরিবর্তে মাঝে মাঝে চিত্ত, সুবিমল বা আমজাদ আসবে।

সুবীর বললে, তাহলে কেষ্টদার কারাবাস কি এবার অবধারিত।

হ্যাঁ, ভাই, আমাকে এবার ওরা কিছুদিনের জন্য অন্ততঃ ঢোকাবেই। বলেই

হঠাৎ রিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, না কি বল, মা ? তুমি কথা বলছ না কেন ? মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি ?

না, মন খারাপ করলে তো চলবে না। তবে আন্দোলন করুন বা নাই করুন, কোন-না-কোন অজুহাতে ওরা অল্পদিনের মধ্যেই আপনাকে গ্রেপ্তার করবেই।

আজও তো করতে পারত ? সুবীর বললে।

তা পারত। তবে দশ পনের হাজার লোকের মাঝ থেকে গ্রেপ্তার করতে যাওয়ার ঝুঁকি ওরা নিতে চায় নি। বিশেষ জরুরী কারণ না থাকলে বোধ হয় তা নেওয়া যায় না উপরিওয়ালার নির্দেশ ছাড়া। আমি ঠিক জানি নে। ঐ রকমই নাকি আলোচনা হয়েছে পুলিশের সাথে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কামাল মিঞাকে নিয়ে শচীন বিশ্বাস তো কাল রাতেই থানায় গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মনসুর আলি দারোগার পরামর্শেই তো আজ ওরা ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে নিয়েছে আর সিনেমাও বন্ধ রাখতে চেয়েছে।

তুমি জানলে কি করে রিণী ? সুবীর অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে ?

একটা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেই বলল।

কে সে ?

এ প্রশ্ন তোমার জিজ্ঞাসা করা ঠিক হয় নি বীরুদা।

কেষ্টবাবু বললেন, ঠিক। তোমার এ কৌতুহল নিন্দনীয়। কোন সংগ্রামী সাথীর পক্ষে আরও নিন্দনীয়। রিণী মাও একটু বেশী বলে ফেলেছে। প্রয়োজনের বেশী কোন খবর জানা থাকলেও গল্প করে বলবে না, কোন সাথীর কাছেও না। তবে এটা ঠিক দাদা। রিণীমা যে বাড়ী বসেও এত খবর রাখতে পেরেছে, এতে আমি নিঃসন্দেহে তাকে আপনার সহকারী হিসেবে অনুমোদন করতে পারি।

সে তো ঠিকই। ও তো আমার অন্ধের যষ্টি, ও না হলে আমার এক দণ্ডও চলে না। একটু থেমে বললেন, তাই বোধ হয় ভগবান ওকে আমার কাছেই রেখে দিলেন। গলার স্বরের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠল।

কি কথায় কি কথা এসে গেল। রিণী উঠে চলে গেল। জ্যেঠামশায়ের এই ক্ষতস্থানটা যে কত গভীর তা তো তার অজানা নয়।

সুবীরও উঠে গেল। এখন আর কোন কথা তোলা যায় না। কেষ্টবাবু নীরবে একটা বিড়ি ধরালেন।

রিণী প্রাণপণে ঘুমাতে চায়। আর যতই ঘুমাতে চায়, ততই ঘুম পায় না। বিছানায় ছটফট করে কেটে যায় সারা রাত। ও জানে মিছিমিছি দুশ্চিন্তা করার, উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। উদ্বেগটা যে কিসের জন্য তাও জানে না। যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু ঘটছে তার একটা মোটামুটি ছক ওর মনের মধ্যে ছিল। আর প্রায় সব সেই মতই হচ্ছে, ও হয়েছে। তবু সে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। তবু কিছুতেই সে ঘুমাতে পারে না।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয় সে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। কোন গন্তব্য নেই বলে সামনে একটা পথ দেখেই সে দলে মিলে এগিয়ে চলেছে। এ পথের পরিচয় তার অজানা, লক্ষ্যও অজানা। শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা মনের মধ্যে জন্মেছে। তারা সংগ্রাম করছে নিপীড়িত মানুষের জন্যে। তাদের মুক্তির জন্যে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সমাজ-ব্যবস্থা আবর্তিত হচ্ছে, আর তা হচ্ছে তাদেরই স্বার্থে। নিরন্তর সংগ্রাম করে অগণিত লোকের অধিকার কেড়ে নিতে হবে তাদের কাছ থেকে। রিণীও সেই নিপীড়িতদের একজন। সমাজের কঠিন অদৃশ্য হাত তাকে পিষে মেরে ফেলছে। তা থেকে তার বাঁচার পথ নেই। এই নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেতে হবে যুগ যুগ ধরে—শত সহস্র বৎসর ধরে। হয়ত তার ফলে একদিন অর্জিত হবে কাঙ্ক্ষিত অধিকার। তার মত হাজার হাজার সংগ্রামীর আত্মদানের ভিতর একদিন অর্জিত হবে নিপীড়িত মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা।

কাল কেষ্টবাবু জেল থেকে বের হয়েছেন। অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলেন জ্যোতিষবাবু। রিণীকে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানকার একদল কর্মীকে নিয়ে জ্যোতিষবাবু জেল গেট থেকে কেষ্টবাবু ও তার সঙ্গীদের নিয়ে গেলেন গান্ধী পার্কে।

কথায় কথায় কেষ্টবাবু বলেছিলেন, সংগ্রামী মানুষকে হতাশ হতে নেই। হতাশা পাপ। দুর্বলতা, ভীরুতা, উদ্বেগ সব পরিহার করতে হবে। তোমরা ইতিহাস পড়বে—ইংলণ্ডের ইতিহাস, ফ্রান্সের ইতিহাস, রাশিয়ার ইতিহাস। সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাস। ধীরে ধীরে কি ভাবে এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হচ্ছে তার ইতিহাস। ইতিহাসই বলে দেবে তোমাদের সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। আমাদের সংগ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে দুর্বল শোষিত মানুষের যে সামগ্রিক সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে ইতিহাসের রাস্তা ধরে—আমাদের সংগ্রাম সেই সংগ্রামেরই অংগ। তাই আমাদের সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই। এর আপাত কোন

'ব্যর্থতা' প্রকৃত ব্যর্থতা নয়। 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা, জানি গো জানি তাও হয়নি হারা।'

তিনমাস জেল খেটেছেন কেষ্টবাবু। ছয় মাস ছিলেন হাজতে। বেরিয়ে এলেন সেই হাসিমুখ। সেই প্রাণবন্ত চেহারা। তেমনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। এমন একটি লোক, যাকে দেখলে আর কোন সংশয়, কোন দুর্বলতা থাকে না।

হাটতোলা বন্ধ পিকেটিং এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কেষ্টবাবু নিজে। সিনেমা বন্ধ আন্দোলনে মার খেলেন তিনি। তার মাথা ফাটল। হাটতোলা বন্ধ আন্দোলনে তিনি জেল খাটলেন—এমনি করে তার ভাবমূর্তিটা হয়ত উঁচু করে তুলতে চেয়েছিলেন। তাতে ভবিষ্যতে বৃহত্তর কাজের সুবিধা হবে—যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন।

অনিল, দুলাল, ভোলা, পুলিন, সুবল—এমনি করে প্রায় প্রতি গ্রামসভা থেকে একজন দু'জন বেছে নিয়ে পনেরো ষোলো জনের একটা দলের নেতৃত্ব নিয়ে পিকেটিং করতে গেলেন চুকনগর বাজারে। আগে থেকেই ঘোষণা করা ছিল কবে তা করবেন। গ্রামে গ্রামে ছোট খাট সভায় আলোচনার মাধ্যমে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা হয়েছিল দিন পনেরো ধরে—তাদের সমর্থনও ছিল পুরোপুরি।

কাজেই প্রত্যাশা মত পুলিশ এল। গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল গোটা দলটিকে। রিণী, জ্যোতিষবাবু, সুবীর এরাও গিয়েছিল। দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখল। এদের পাশ দিয়েই কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল সকলকে। কেষ্টবাবু কারো দিকে তাকাননি। রিণীর দিকে একবার চোখটা ফিরালেও সে চোখে কোন ভাষা ছিল না। যেন তিনি ওকে চেনেনই না।

যে সব কর্মী বাইরে রইলেন তাদের মধ্যে তত্ত্বগত শিক্ষার কার্যক্রম নিলেন জ্যোতিষবাবু। ছেলেরা মার্ক্সসীয় দর্শনের নানা বই পড়ে। পরে ছোটদের রাজনীতি, গোর্কীর মা, সংস্কৃতির রূপান্তর, কমিউনিষ্ট পার্টির ইতিহাস। আলোচনাচক্রে যোগ দেয়। গ্রামে গ্রামে জনসাধারণকে বোঝায়।

কেষ্টবাবু বের না হওয়া পর্যন্ত আর কোন আন্দোলনে নামার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু পার্টির নির্দেশ এল। ১৯৪০ সাল। পাট চাষ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। কৃষকদের স্বার্থ এখানে জড়িত। চুপ করে থাকা চলবে না।

আবার সুবীরের উপর ভার পড়ল জনসভার আয়োজনের। যশোরের উকিল কমরেড চিত্ত বোস এলেন। হাজার হাজার কৃষক সমবেত হলেন তালতলার মাঠে।

পুলিশ যথারীতি একপাশে বসে সভা শুনে গেল। নির্বিঘ্নে সভা শেষ হ'ল। সরকারের পাট চাষ আইন কেউ মানবে না। গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে হবে। কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এই আইনের বিরুদ্ধে।

ক'দিন আগে রিণী সুবীরকে ঠাট্টা করে বলেছিল, এবার তোমার ডাক পড়বে, দেখা যাচ্ছে।

কেন ?

তুমি দিন দিন বড় বিপজ্জনক হয়ে উঠছ। যে ভাবে লোককে চট করে বুঝিয়ে দলে টেনে নিচ্ছ তাতে তোমাকে বাইরে রাখা আর চলে না। তুমি ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছ।

কার কাছে ? তোমার কাছে বুঝি ?

আমার কাছে হলেই বা আমি আর কি করতে পারি। তবে সরকার তো আর আমার মত অবলা নয়। সে ঠিক যেমন কুকুর তেমনি মুগুর মেরে ছাড়বে।

সরকারের অস্ত্রকে ভয় করিনে। ওর ধার পরীক্ষা করা আছে। তোমার অস্ত্রকেই ভয়। তুমি আজকাল যেভাবে জপতপ শুরু করেছ।

তাতে কার কি ক্ষতি ?

মার্ক্সবাদীরা পুজো পার্বণ, দেব-দেবতায় বিশ্বাসী নয়। মানুষই তাদের দেবতা। মানুষের সেবাই তাদের ব্রত।

পুজোই সেবার শক্তি দেয়।

নতুন ভাষ্য শুনলাম।

ভাষ্য করবার অধিকার কেড়ে নিলে আমি অন্ততঃ সে দলে নেই। যাক, তোমার ব্যাখ্যাটি শুনি।

মানবসেবার সাথে দেবপূজার কোন বিরোধ দেখি না। যদি না সেই পুজো এমন একটা শ্রেণীর সৃষ্টি করে, যে শ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ করতে থাকে।

সুবীর ভাবতে থাকে। কথাটা অযৌক্তিক মনে হয় না। কিন্তু ওর তর্ক করার সাহস নেই। মার্ক্সীয় দর্শন নিয়ে ওদের পড়াশোনা প্রায় কিছুই নেই। তবু ওর মনে হয় শ্রেণী-সংগ্রামের মূলকথা বোধহয় ওর চেয়ে রিণীই ভাল বোঝে।

ও প্রসঙ্গ পালটে দেয়। কিন্তু আমাকে জেলে পাঠানোতে তোমার এত আগ্রহ কেন ?

মনে কর তুমিও আমার কাছে একটা শ্রেণী মাত্র। শোষক শ্রেণী। তোমাকে বিশ্বাস করি নে। আমার চক্ষুশূল। বলে হেসে ফেলে।

সুবীরও হাসতে চায়, কিন্তু পারে না। ওকে নিয়ে হয়ত সত্যিই রিণী অস্বস্তি বোধ করছে। মনের মধ্যে কোথায় যেন টনটন করে ওঠে।

আজকাল রিণী যেন ওকে খানিকটা এড়িয়ে চলতে চায়, ওর মনে হয়। তেমন ঘনিষ্ট হয়ে কথাবার্তা বলতে চায় না। অপর কেউ না থাকলে কোন-না-কোন অজুহাতে পালাতে চায়।

সুবীর যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিল, আমি শোষণ করছি তোমাকে? সে কি করে সম্ভব?

দু'টো চোখ দিয়ে সব সময় তো শোষণ করে চলেছ। যে কেউ লক্ষ্য করলে ধরতে পারবে। আমার হয়েছে জ্বালা।

সুবীর অপরাধীর মতো মুখ করে বসেছিল। কিছু বলতে পারেনি। রিণীও আর হাল্কা হয়ে উঠতে পারে নি।

মম্মথ এসেছিল। ওদের দুজনকে বসে থাকতে দেখে কি ভেবেছিল কে জানে।

কি তোমরা দু'জন যে বোবা হয়ে বসে আছ। না কি ভাব যেখানে গভীর, ভাষা সেখানে মূক।

হ্যাঁ মম্মথদা, এবারকার ভাব বড় গভীর। এবারকার আন্দোলনে যিনি নেতৃত্ব দিতে পারতেন তিনি তো কারান্তরালে। তাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছি।

তার জন্যে অত চিন্তার কি আছে। কালকের জনসভার তো সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে আছে। যেভাবে প্রচার হয়েছে এবার বিশ হাজার লোক জুটবে। চিত্তদা, আমজাদ ভাই এরা সবাই আসবেন, চাষীদের বুঝিয়ে বলবেন সব। আমাদের অত ভাবনার কি আছে?

তোমরা সরকারের আইন না মানার জন্যে লোককে উস্কানি দেবে আর সরকার বুঝি চুপ করে বসে থাকবেন?

জেল খাটতে হবে? তা ওর জন্য তো তৈরী হয়ে আছি।

তা একে একে সবাই জেলে গিয়ে নাম কিনলে এদিকে যে আগুন নিভে যাবে।

আবার ফিরে এসে আগুন জ্বালতে হবে।

কত কাঠ খড় পোড়াতে হয় একটু আগুন জ্বালতে গেলে তার হিসাব ভুলে যেও না।

তা আর কি করা যাবে।

তাই ভাবছিলাম।

কি ভাবছিলে?

ভাবছিলাম জ্যাঠামশায়কে বাইরে রাখতে হবে। কালকের সভায় ওকে একটু অন্তরালে রাখতে হবে। সভাপতির আসনে ওকে বসান বা কর্মকর্তা হিসাবে দেখান যাবে না। দূর থেকে নির্দেশ দিয়ে যাবেন। সেইমত কাজ করতে হবে।

ভাল কথা। তবে বীরুদাকে তো আর অন্তরালে রাখা যাবে না। বলে হাসল মম্মথ। হয়ত ওর ধারণা সুবীরের আসন্ন গ্রেপ্তার ইত্যাদি ভেবে রিণী চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

রিণী সে ইঙ্গিতটাকে আমল দিল না। সহজ স্বাভাবিকভাবে বলল, তাই তো বলছিলাম বীরুদাকে, এবার তোমাকে যেতে হবে। তার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নাও।

কখনও কখনও অনেক কথা ভবিষ্যৎবাণীর মত ফলে যায়। বিশেষ করে অপরের সম্পর্কে আমাদের কথা যদি এমনি সত্য হয় তবে আমরা খুশী হই, তা সে খারাপ ভবিষ্যৎবাণী হলেও। ওতে একটা আত্মতৃপ্তি আছে। আমার কথা খেটে গেছে অতএব······এমনি একটা ভাব। ভবিষ্যৎ বলার মত আমার দূর দৃষ্টি আছে, এই গর্ববোধে আমরা স্ফীত হই।

সুবীর সম্পর্কে রিণীর ভবিষ্যদ্‌বাণী যে এমনি ভাবে খেটে যাবে সে তা নিজেও সত্যি ভাবে নি। আর খাটল বলে খুসী হতে চেয়েও সে খুসী হতে পারে নি। সুবীরকে নিয়ে সত্যিই সে স্বস্তি পাচ্ছিল না। সর্বদা সবাই যেন চোখের তীরে তাকে বিদ্ধ করছে। মনে মনে ও চাইছিল ও যেন দূরে সরে যায়। মাঝে মাঝে দেখা হোক। তাতে সকলের এত ঘুমের ব্যাঘাত হবে না। কিছু দিনের জন্যে দূরে যাবার সব চাইতে ভাল ব্যবস্থা জেল। রিণী যেন মনে প্রাণে চাইছিল অন্তত কিছুদিন সুবীরের জেল হোক।

অথচ সেই জনসভার পরদিন ভোরে যখন ব্যাপারটা ঘটল তখন রিণীর যে কি হ'ল তা সে নিজেই বুঝতে পারে না। ভোর থেকে পুলিশ এসেছিল সুবীরকে গ্রেপ্তার করতে। জ্যোতিষবাবু সুবীরকে ডেকে দিয়েছেন। পালিয়ে থেকে লাভ নেই। এমন গুরুতর কিছু অপরাধ হয়নি। অল্পস্বল্প শাস্তি যা হয় তা মেনে নেওয়াই সঙ্গত।

রিণী যখন উঠল তখন সুবীরকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারী আইনের বিরুদ্ধে জনতাকে উস্কানি দেবার জন্যে তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। আছে আরো দশ বারো জনের বিরুদ্ধে। তার মধ্যে মন্মথও আছে।

সুবীর পিছন ফিরে তাকাল। রিণীকে দেখল। হেসে ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ আমি যাচ্ছি। তুমি যা চাইছিলে তাই হল। সুখে থাক। ভাবটা যেন এই রকম। অন্ততঃ রিণীর তাই মনে হল। যেন ওরই হাতের উদ্যত ছড়িটা কেড়ে নিয়ে সে ওকে সপাং করে এক চাবুক বসিয়ে দিল। রিণী সুবীরকে হাসির প্রত্যুত্তরে হাসি দিয়ে বিদায় জানাতে পারেনি।

শুধু তাই নয় আরও এক কাণ্ড ঘটে গেল। তাতে সে নিজেই আশ্চর্য হল সব চেয়ে বেশী। আশ্চর্য ও লজ্জিত।

কমলা কাঁদছিল। ঠাকুরমা ওকে—সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। ইতস্ততঃ করে রিণীও একপায় দু'পায় সেখানে হাজির হল। মনে হল ওরও কিছু বলা উচিত। এমন

সময় কোন অভিমান, কোন তিক্ততা মনে রাখা উচিত নয়। কিন্তু বলতে গিয়ে ও নিজেই কেঁদে ফেলল। আর তারই জন্য ওর লজ্জার অবধি রইল না।

এই তো সেদিন শুকচাঁদের মা এসেছিল। শুকচাঁদ জেলে রিণীর বাবার সাথে নৌকায় কাঁচা মাল চালানী ব্যবসাই শুধু করে না, বাড়ীতে যখন থাকে তখনও ওদের বাড়ীর নানা কাজ দিন মজুরীতে করে দেয়। এই জেলে ঘরটার সাথে ওদের খুব দহরম মহরম। তবে রিণীর সঙ্গে এদের জমে না। জমে কমলার সঙ্গে, ছোটবউয়ের সঙ্গে। ঠাকুমার সঙ্গেও দু' চারটে কথাবার্তা হয় এদের।

শুকচাঁদের মা কমলাকে বলছে, কি গো নাতনী। নাতজামাই কেমন ঘানি টানতিছে? শুনি নাকি ফাটকে ওগার সব ঘানি টানতি হয়। আর কি কষ্ট বল দিকি। নাতনীর নরম বুকি মাথা রাখি ঘুমুবে, তা না করে জেলখানার ধুলোয় মসা তাড়াতিছে। তা তোকেও বলি বাপু, ভাতাররে অত আলগা দিতে নেই। আজ হ্যানে মিটিং, কাল স্যানে মিটিং কেনরে বাপু। বেশ তো ব্যবসাপাতি দেখতিছিলি।

তারপর কমলার সাথে আরও কিছুক্ষণ ফুসফুস করে কি কথা হয়। রিণীর কানে আসে না। একবার তাকিয়ে দেখতে পায় তারই দিকে চোখ মটকে বুড়ি কি যেন ইঙ্গিত করছে।

এদের এই ফোপরদালালি রিণীর অসহ্য। যতই উঠাবসা থাক না। এদের কাজ ও কথা নিয়ে জেলে বুড়ী মাথা গলাতে আসবে—এটা রীতিমত অপমানকর। আসলে ছোটলোকের সাথে অতটা মাখামাখি না করাই ভাল।

কমলার উপর রিণী বিরক্ত হয়ে ওঠে। এমনিতেই ওর কাণ্ডকারখানা একদম ভাল লাগে না রিণীর। কেমন ছেলেমানুষী করে। যতসব ছোটলোকের সঙ্গে ওর ভাব। সুখ দুঃখের কথা বলার আর লোক পায় না।

গুম হয়ে আছে কাল থেকে। একটা কথাও বলেনি কমলা ওর সাথে। জ্যাঠামশায় কমলাকে কিছু বলেন নি। রিণীকে শুধু বললেন, রিণী মা, তুমি যাবে নাকি? আজ কেষ্টবাবু জেল থেকে বের হবেন। আমরা যাব তাকে অভ্যর্থনা করতে। ঐ সাথে সুবীরের সঙ্গে দেখা করে আসব। যাও যদি তৈরী হয়ে নাও।

অর্থাৎ জ্যোতিষবাবু রিণীকে সঙ্গে নিয়েই যেতে চান। আর রিণী যে যেতে চাইবে তাও তিনি জানেন। কিন্তু তিনি একবারও কমলাকে কিছুই বললেন না। সুবীরকে দেখিয়ে আনার জন্য তিনি তো কমলাকেও নিয়ে যেতে পারতেন। বরং তাকেই তাঁর ডাকা উচিত ছিল।

রিণীরও খারাপ লাগে। সুবীরের খবর জানার জন্য, তাকে দেখার জন্য কমলার খুব ব্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। জ্যাঠামশায় তাকে নিয়ে যাবার কোন প্রস্তাব করছেন না। অথচ রিণীকে ডাকছেন। এতে রিণীর ভাল লাগলেও কেমন সংকোচ হয়েছিল। কেমন যেন খারাপ দেখায় ব্যাপারটা। দেশের কাজের সঙ্গে সংস্রব নাই বা থাকল কমলার। কিন্তু স্ত্রী-হিসাবে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার তারই তো বেশী প্রয়োজন।

রিণী একজন কর্মী। আর একজন জেল-আটকানো সহকর্মীকে দেখতে যাবে সে। যাবে তাদের জেল থেকে ছাড়া পাওয়া নেতাকে অভ্যর্থনা করতে। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং কর্তব্যও। তবু রিণীর কেমন লাগে। কমলার প্রতি কেমন যেন অন্যায় করা হচ্ছে। খানিকটা নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে। সে মুখ ফুটে বলতে পারে না। কাউকে নিয়ে নিজে দেখা করতে যাওয়ার তার ক্ষমতা নেই। স্বাধীনতাও নেই। রিণীর কেমন যেন মনে হয় কমলাকে না ডাকার জন্য সেই হয়ত খানিকটা দায়ী। সে যদি আজ দূরে থাকত, এসব কাজের মধ্যে না থাকত, ধর শ্বশুর বাড়ীতে থাকত, তবে এমনি সময় এলে হয়ত জ্যাঠামশায় কমলাকে সঙ্গে নিতেন। সে সঙ্গে হয়ত ঠাকুরমাকেও নিয়ে যেতেন। কোন ক্ষতি ছিল না। আর সেইটাই তো হওয়া উচিত। দেশের কাজের নিরিখে তো সব বিচার করা যাবে না। তার বাইরে যে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে তা উপেক্ষা করলে দেশ থাকে কোথায়? তখন দেশের কাজের কোন কথাই ওঠে না। পরিবার থেকে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন মানুষ থাকতে পারে। তবে সে মানুষ নিয়ে দেশও নয়। তার জন্য বা তার দ্বারা দেশের কাজও নয়। সুবীর তো শুধু সুবীর নয়, গোটা সুবীরকে খুঁজতে গেলে যেতে হবে ঐ কমলার কাছে, তার ছেলের কাছে। আরও অনেকের কাছে যাদেরকে বাদ দিলে সুবীরের অস্তিত্ব থাকে না।

রিণী তো কমলাকে সঙ্গে নিতে জ্যাঠামশায়কে নিষেধ করেনি। তবু সে আছে বলেই যেন কমলা বাদ পড়ে যাচ্ছে। শুধু আজকের যাওয়া থেকেই নয়। সুবীরের জীবনের ঘনিষ্ঠ অংশীদারী থেকেও।

কিন্তু রিণী কিছুতেই বলতে পারেনি ওর জ্যাঠামশায়কে যে কমলাকেও সঙ্গে নিলে ভাল হয়। কেন পারে নি এ জিনিষটা রিণীর কাছে স্পষ্ট নয়। দেশের কাজে কমলার চেয়ে রিণীর গুরুত্ব অনেক বেশী, কমলার সেখানে বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই বলাই চলে। তাতে রিণীর গৌরব করার কি আছে।

কিন্তু রিণীর দুর্ভাগ্যের প্রতি কটাক্ষ করে যারা আনন্দ পায়, তারা দেখুক তার জীবনেও বৃহত্তর সার্থকতা আছে। আর সে দলে কি কমলাও নেই?

তবু কমলার প্রতি ওর একটা সহানুভূতি আছে। ও যদি আজ কমলা হত...

ওর তবে কেমন লাগত ? ও আশা করেছিল খুলনা থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই কমলা তার কাছে এসে দাঁড়াবে। তখন সে কিছু জিজ্ঞাসা করতেই বলবে. বীরুদা ভাল আছে, তুমি কোন চিন্তা করো না, দিদি। আর তো কটা দিন, আগামী মাসের সাতাশ তারিখে সেও তো ছাড়া পাবে।

তারপর আরও বলে রাখবে, সেদিন কিন্তু দিদি তোমাকে একটা মালা গেঁথে রাখতে হবে। বীরুদা বাড়ী আসছে। আমরা এগিয়ে যাব রাস্তায়। তোমাকে আগে যেতে হবে। সেখানে তোমাকেই পরিয়ে দিতে হবে তার গলায় জয়মাল্য। বীরুদা আমাদের কত গর্বের। তোমার মত ক'জনের স্বামী দেশের কাজের জন্য জেল খেটেছে ? তুমি অমন মুখ গোমড়া করে থাক কেন ? তোমার আজ কত গর্ব. কত গৌরব করা উচিত।

কিন্তু কিছুই বলা হল না। কমলা হয়ত রাগ করেই হবে. একবারও কাছেই এল না। মুখ অন্ধকার করে দূরে দূরে ঘুরছে। তাকে গায়ে পড়ে সুবীরের খবর দিতে গেলে সে হয়ত অপমান করে ছাড়বে। রিণী এবার বিরক্ত হয়ে ওঠে। এমনি করে যেন আর পারা যায় না।

জেলখানার লোহার গেটের এপারে ছিল এরা। ওপারে সুবীর আর সঙ্গীরা। একি চেহারা হয়েছে সুবীরের। ভয়ানক রোগা হয়ে গেছে। হাল্কাভাবে ঠাট্টা রসিকতা করে কথা বলবে ও ভেবেছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুতেই তা পারে নি। সুবীরের চেহারা দেখে আর ঠাট্টা করার কথা মনেই হয় নি। বরং স্বাভাবিক ভাবে কথা বলাই কঠিন হয়ে পড়েছিল।

বরং সুবীরই খুব স্বাভাবিক ভাবে হাসি হাসি মুখে কথা বলছিল। কি দেখছ, জেলখানায় ভালমন্দ খেয়ে চেহারাটা বেশ ফিরিয়ে ফেলেছি, কি বল ? সাধে কি আর লোকে জেলখানাকে শ্বশুরবাড়ী বলে ?

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এমন শ্বশুরবাড়ি আর কিছুদিন থাকলে আর বাড়ি ফিরতে হবে না।

কথাগুলো বলতে গিয়ে রিণীকে কষ্টে নিজেকে সংযত রাখতে হয়েছিল।

জেলখানার যেখানে সুবীর আর মন্মথকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তার পাশেই থাকত সিন্ধধান। গন্ধে থাকা যায় না। ওরা আপত্তি করেছিল। ফলে জেল কোড ভঙ্গের কেস লিখলেন জেলার সাহেব। সুপারিটেণ্ডেণ্ট যথারীতি সব শুনে হুকুম দিলেন দোতলায় নেটে এদের থাকতে দাও সাতদিন। ছারপোকার অত্যাচারে একদিনও ঘুমাতে পারেনি ওরা। ওজন কমে গেল। হাসপাতালের খাওয়া দেওয়া হ'ল ওদের। তবু ওদের অবশ্য দুঃখ নেই। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা

শুধু দেশসেবকই নয়, প্রতিটি মানুষের পবিত্র কর্তব্য, প্রতিকার হোক আর নাই হোক শাস্তির ভয়ে তারা সে কর্তব্য পালনে বিরত হয়নি। এই তাদের সান্ত্বনা, তাদের গর্ব।

দেশের কাজ যারা করে তাদের বাড়ি নেই, ঘর নেই, আপনজন, আত্মীয় পরিজন কেউ নেই। অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে একটু নিশ্চিত শান্তি, দু'দণ্ড নিরুদ্বেগ তৃপ্তি নেই। কিন্তু তথাপি তারাও তো মানুষ। একটুখানি স্নেহভালবাসা, এক বিন্দু দরদ ও সান্ত্বনার জন্য মাঝে মাঝে তারা যে কত কাতর হয়ে ওঠে তা যদি জানতে—কথাটা একদিন সুবীরই বলেছিল। বলেছিল রিণীরই একটা কটাক্ষের উত্তরে। রিণী ওর স্বদেশ প্রেমকে একটা মুখোশ বলে বিদ্রূপ করতে চেয়েছিল। কোন নারীর অবৈধ প্রেমাকাঙ্ক্ষাই ওর লক্ষ্য।

হঠাৎ কেন যে রিণী ওকে এমন কথা বলতে গিয়েছিল তা ও নিজেই জানে না। আসলে মা'ঝ মাঝে নিজেরই মনের অস্থিরতায় ছটফট করতে করতে ও যাকে পায় তাকেই আঘাত করতে চায়। আর সবচেয়ে বেশী আঘাত করে সুবীরকে। এমনি আঘাত করে ও নিজের মনের জ্বালা কমাতে চায়। অথচ ফল হয় উল্টো।

বৈধ-অবৈধ, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে রিণী মাথা ঘামাতে চায় না। মানুষের সৃষ্ট শত সহস্র শৃংখলের মত মানুষের স্বাধীন সত্বাকে পিষে মারার ঐ অপকৌশলগুলো কেউ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিলে ও বরং খুশী হয়। ও যদি তাদের মত ওগুলোকে অস্বীকার করতে পারত—মাঝে মাঝে ঐ বিদ্রোহের ভাবটা মধ্যে মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায়। কিন্তু পরক্ষণেই ও ভীষণ ক্লান্তি-বোধ করে। একটা অপরাধ বোধ, একটা অসহায়তা, একটা ভীতি ওকে অবসন্ন করে তোলে। ও তখন নিজের কাছ থেকে নিজেই পালিয়ে বাঁচতে চায়।

আসলে ও নিজের মনের প্রকৃত ছবিটা চোখ মেলে দেখার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না। ওখানে হয়ত কোন বীভৎস জীব বাসা বেঁধে আছে। তার চেহারা দেখলে হয়ত ও নিজেই মূর্চ্ছা যাবে।

পুলিস বেশীক্ষণ থাকতে দেয়নি ওদের। সুবীরদের দলটাকে তারা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ওরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রইল কেষ্টবাবুরা ছাড়া না পাওয়া পর্যন্ত। জেলঘেটের অনতিদূরে অশ্বত্থ গাছটার গোড়ায় ওরা সবাই বসেছিল।

ওরা আলোচনা করেছিল কেষ্টবাবু জেল গেটের বাইরে এলে কে তাঁকে সর্বপ্রথম মালা পরিয়ে অভিনন্দিত করবে।

জ্যোতিষবাবু বললেন, এই কাজটা রিণী মায়ের হাত দিয়েই করা হবে। সকলেই এ প্রস্তাব সমর্থন করলো।

এ কোন কেনা মালা নয়। মালাটা রিণীর হাতেরই তৈরী। কেষ্টবাবুকে রিণী শ্রদ্ধা করে। সেই শ্রদ্ধার সুতো দিয়ে গাঁথা এ মালা। তাকেই আবার তা পরিয়ে দিতে হবে। রিণীর মনের মধ্যের সব জড়তা যেন এক মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল।

কেষ্টবাবু হাসতে হাসতে রিণীর হাত থেকে মালাটা নিজেই পরে নিয়ে বললেন, আমার মায়ের হাতের এই মালার যেন যোগ্য হতে পারি আমি।

এমন সম্মান দিয়ে কথা বলেন কেষ্টবাবু ওকে যাতে ও বড়ই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ও তো সে সম্মানের উপযুক্ত নয়। ও তো নিজের মনকে জানে। সেখানে দেশপ্রেম আছে কিনা তা ও জানে না। উদ্দেশ্যহীন নিষ্কর্মা দিন যাপনের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ও দেশের কাজে যোগ দিয়েছে।

কিন্তু সেদিন কেষ্টবাবুর কথায় ও এক নোতুন প্রেরণা লাভ করেছে। ওর মনের সব দ্বিধা দুর্বলতা কেটে গেছে যেন। কিছু হোক না হোক এ কাজে ও আত্মনিয়োগ করবে—সবাইকে প্রেরণা দিয়ে যাবে। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি না হলে তার প্রকৃত মুক্তি নেই। মানুষকে সর্বপ্রথম খেয়ে পরে মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার অর্জন করতে হবে। তারপর অন্য কথা—তার হাজারো সমস্যার সমাধানের কথা আসবে। ব্যক্তিগত সামান্য সুখদুঃখের কথা ভাববার তার আগে আমাদের অবসর নেই যতদিন না মানুষকে সেই অধিকার এনে দেওয়া যাচ্ছে। সেই অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জীবনপাত করতে হবে। বিফল হলেও সে সংগ্রাম বিফল হবে না। সেই কথাই কেষ্টবাবু সেদিন বলেছেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা, জানি গো জানি তাও হয়নি হারা।'

জ্যেঠামশায় ডাকছেন। 'যাই জেঠু' বলে রিণী উঠে পড়ে। কাছে গেলে হেসে বললেন, কই আজ বিকেলে তো অনেকক্ষণ তামাক খাওয়াও নি।

ওঃ তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। এক্ষুণি আনছি। বলে লজ্জিত মুখে ছুটে যায় রিণী।

ফিরে এলে জ্যোতিষবাবু আবার বলেন, আজ রাত্রে হয়ত কেষ্টবাবু আসবেন। এইবার আমাদের আসল কাজ সুরু করতে হবে। ক্ষেত্র প্রায় প্রস্তুত হয়ে এসেছে।

রিণী জিজ্ঞাসুনেত্রে তাকিয়ে থাকে। আসল কাজটা কি তা যেন সে মনে করতে পারছে না।

সে কথা খানিকটা অনুমান করেই যেন জ্যোতিষবাবু বলেন, আমাদের বাড়ির সামনে এই যে প্রকাণ্ড বিল—এই বিলে প্রায় বছর ধান হয় না তা তো জান। শুধু ডাঙ্গার কোলে সামান্য কিছু রোয়া ধান তাও সব বছর সমান হয় না। আর এই ধান কেন হয় না তাও নিশ্চয়ই জান।

সন্ন্যাসীর খাল দিয়ে নোনা জল ঢুকে সব ধান মেরে দিয়ে যায়। নোনা জলে ডুবে ধান লাল হয়ে যায়। আর সেই সাথে নোনা কাঁকড়া এসে ছেয়ে যায় সারা ক্ষেত। যা দু চারটে চারা বাঁচতে চায় তাও কেটে দেয় ঐ কাঁকড়াগুলো।

সেইজন্য এই বিলের চারপাশে আট দশ খানা গ্রামের মানুষকে বাঁচাতে হলে, এই বিলে আবাদ করতে হলে সর্বপ্রথম ঐ নোনা জলকে আটকাতে হবে। বাঁধ দিতে হবে ঐ দোয়ানে খালে।

অতবড় খালে বাঁধ দেওয়া কি সহজ হবে! ও—ওতো একটা নদীর মত।

সহজ তো নয়। তবে মানুষ চেষ্টা করলে কি না পারে। এতগুলো গ্রামের লোক সমবেত হয়ে যদি লেগে যায় তবে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে।

রিণী ঠিক জিনিষটা ধারণা করতে পারে না। ও চুপ করে ভাবতে থাকে। তবে এইসব গ্রামের সাধারণ মানুষ যে খুবই দরিদ্র এবং অতিকষ্টে জীবন যাপন করে তা ও জানে। এইসব বিলে ধান জন্মাতে না পারলে চাষীদের অবস্থার কোন কালেই উন্নতি হবে না। গ্রামে গ্রামে কিছু ঘোরাঘুরি করে ও বুঝতে পেরেছে অধিকাংশ লোক বিলের পাতি ঘাস আর নোনা কাঁকড়া সিদ্ধ করে খায়। বছরে আট ন' মাস এদের একবেলা ভাতও জোট না।

জ্যোতিষবাবু আবার বললেন, সুধীর তো আর ক'দিনের মধ্যেই বেরিয়ে আসবে। তখন আর একটা বড় সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। আর সেই সম্মেলনেই প্রতিজ্ঞা নিতে হবে বাঁধ বন্দী আন্দোলনের। সামনে বেশ কার্নি দিন আসছে, রিণী, যখন আমাদের আহার নিদ্রা ত্যাগ করে কাজ করতে হবে। তার জন্য প্রস্তুত হও।

একটু চমকে ওঠে রিণী। জ্যোতিষবাবু কোনদিন প্রত্যক্ষভাবে রিণীকে এমনি করে আহ্বান করেন না। হয়ত তিনি তাঁর মনের দ্বিধাটার খোঁজ রাখেন, নয়ত সামনের সংগ্রামটা এতই গুরুতর যে উনি মনে মনে বিচলিত বোধ করছেন। রিণী চিন্তিত হয়ে ওঠে।

গড়গড়াটা রেখে জ্যোতিষবাবু বলেন, যাই একবার ও পাড়ায় গোপালের ছেলেটাকে দেখে আসি। তুমি এদিকটায় খেয়াল রেখো। কেউ যদি আসে বসতে বলো বলে ফতুয়াটা কাঁধে ফেলে ছোট্ট ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন।

॥ ১২ ॥

গ্রামে পাশকরা ডাক্তার নেই। এক সেই চুকনগর, আর এদিকে ডুমুরিয়া বাজার। দু'দিকেই তিনমাইল পথ যেতে হবে ডাক্তার ডাকতে হলে। তারপর ফি দিতে হবে

চার টাকা, ছয় টাকা। গ্রামের অবস্থাপন্ন দু' একজন লোক বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া কেউ অত দূর থেকে এবং পয়সা ব্যয় করে ডাক্তার ডাকতে পারে না।

জ্যোতিষবাবুর মত আর ও দু'চার জন গ্রাম্য কোয়াক ডাক্তার কবিরাজ আছেন এ গ্রামে ও গ্রামে। তাদের কারো দু' টাকা, করে ও একটাকা ফি। একমাত্র জ্যোতিষবাবুর কোন ফি নেই। যে যা দেয় তাই নেন। না দিলেও কিছু বলেন না। সময় সময় কিছু ঔষধের দাম চান মাত্র।

জ্যোতিষবাবুর কাছে তাই বছরের যে সময়টা জ্বর-জ্বালা খুব বেশী হয় তখন বেশ রোগীর ভীড়। তবে আজকাল জ্যোতিষবাবুর রোগী দেখার কাজটা খুব বেড়ে গেছে। আগে ডাকতে এলে সহসা যেতে চাইতেন না। রোগীর অবস্থা শুনে তেমন গুরুতর কিছু না বুঝলে ঔষধ দিয়ে বিদায় করতেন। আজকাল ঠিক উল্টোটা হয়েছে। রোগীর ঔষধ দিয়ে নিজেই বলে দেন আচ্ছা সময় মত আমি একবার গিয়ে দেখে আসব। তারপর ডিসপেন্সারীর ভিড়টা কমলেই ব্যাগ হাতে কোন না কোন দিকে বেরিয়ে পড়েন। কোন কোন দিন ফিরতে একটা দু'টো হয়ে যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রামে দু' তিন মাইল পর্যন্ত রোগী দেখতে যান।

যতক্ষণ উনি না থাকেন ততক্ষণ রিণীকে ডিসপেন্সারীতে থাকতে হয়। রোগীপত্র এলে প্রাথমিকভাবে রিণীই দু' এক মাত্রা ঔষধ দিয়ে দেয়। কেউ বা জ্যোতিষবাবুর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করে। কেউ বলে, দিদি, তুমি এখন একটু ঔষধ দিয়ে দাও। যদি না কমে তবে আমি বিকেলবেলা আবার আসব।

রিণী হয়ত বলে, আমি ঔষধ দিলে তোমার বিশ্বাস হবে?

বল কি দিদি। তুমি সেই ছোটবেলা থেকে খুড়োমহাশয়ের ঔষধ দেওয়া শিখতেছ। আমরা কি আর দেখতিছি নে।

রিণীও যতটা পারে বসে না থেকে রোগী বিদায় করে।

সেদিন পাঁচু সর্দার ছুটতে ছুটতে এল। ওর ছেলেটার ভীষণ জ্বর। জ্বরে ছটফট করছে। আর ঘন ঘন জল খাচ্ছে।

সর্দার খুব ঘাবড়ে গেছে। কি হবে দিদি। আর তো বসতে পারি নে। খুড়ো মশাই কনে গেছে।

রিণী বললে, কোথা থেকে কোথায় যাবেন তা জানিনে। তবে পাশাপাশি গ্রামে চার পাঁচটা রোগী দেখে তবে ফিরবেন। ফিরতে বেশ বেলা হবে বলেছেন।

কোনদিকে যাবেন তা কিছু কয়ে যান নি? কাছাকাছি হলে না হয় দৌড়ে যাতাম।

একবার বলছিলেন জিয়েলতলার নাছিম মিঞার বাড়ী যাবেন আগে। তার মাইয়েডার ভেদবমি হচ্ছে। মিঞা ছুটে আইছিল।

তা দিদি, তুমি একটা উপায় কর। তুমি দু' এক ফোঁটা ওষুধ দাও। তাই এখন খাওয়াতি লাগি। তারপর দুপোরের পরে আবার আসবানে এট্টু ওষুধ পড়ুক। ছ্যামড়াডা যে ছটফট করতেছে।

রিণী একোনাইট তিরিশ শক্তি চারমাত্রা দিল। এক ঘণ্টা অন্তর খাবে। দুপুরের পরই যেন আবার চলে আসে। জ্যোতিষবাবু ফিরে এলে বললে, জেঠু, পাঁচুসর্দার এসেছিল। ওর ছেলেটার ভীষণ জ্বর। ঘন ঘন জল খাচ্ছে। ঘামছে। কিন্তু জ্বর কমছে না। ছটফট করছে। আবার কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। সে তো ওষুধ না দিলেই ছাড়বে না।

তা কি ওষুধ দিলে ?

একোনাইট দিয়েছি।

তা কিছুটা কাজ হবে মনে হয়। তবে একটু ভুল করেছ। আর্সেনিক দিলে ঠিক হত। আর্সেনিকে অস্থিরতা, জ্বালা, তৃষ্ণা, অবসাদ প্রায় সবগুলো লক্ষণই আছে। একমাত্রাতেই রোগী আরাম হয়ে যেত। আচ্ছা আসুক, দেখা যাক। তরুণ জ্বর দেখলে অন্ততঃ তিনটে ওষুধের কথা চিন্তা করে তবে একটা দেবে— ব্রাওনিয়া, একোনাইট আর আর্সেনিক।

খাওয়া-দাওয়া সেরে জ্যোতিষবাবু এসে বাইরের ঘরে বসেছেন। রিণী এল তামাক সেজে নিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে। বেলা গড়িয়ে দুটো আড়াইটে বেজে গেছে। এমন সময় পাঁচু সর্দার আবার এসে হাজির। এবার মুখখানা হাসিখুসী। আগের মত উদ্বেগের ছায়া নেই।

বেশ লম্বা চওড়া মানুষ পাচু সর্দার। মাথায় বাবরী চুল। শরীরটা যেন মাংসপেশী দিয়ে গড়া। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাকানো মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠেছে। তবে ইদানীং যেন গলা বুকের হাড়গুলো বেরিয়ে গেছে।

ঘরবাড়ী বলতে তালপাতায় ছাওয়া একখানা কুঁড়ে ঘর। তারই একপাশে ছোট্ট একটু রান্নার জায়গা। জমি জায়গা দু' চার বিঘে যা ছিল তাও অজন্মার জন্য খাজনা বাকী পড়ায় খাস হয়ে গেছে। এখন আর কিছু নেই। কি করে পাঁচুর চলে বলা মুস্কিল। সব কাজ পাঁচু পারে না বা করতে চায় না। ধান পাট কাটার মরশুমে দু' চার জন সঙ্গী সাথী জুটিয়ে যেদিকে ফসল হয়েছে সেইদিকে চলে যায়। দাওয়ালের কাজটা ও পারে ভাল। কাজটা ওর পছন্দও।

লম্বা ধারালো হেসো বা কাস্তে চালাতে ওর জুড়ি নেই। এক এক পোচে এক এক গোছা ধান বা এক এক পাজা পাট ছিন্নমূল হয়ে ওর হাতের মুঠোয় বা কাঁধের উপর ঢলে পড়ে। ওর ভারী আনন্দ হয়।

বছরের অবশিষ্ট সময় কখনও কীর্তন গেয়ে কখনও বা বাউল গান গেয়ে এখানে ওখানে ঘুরে দিন কাটায়। মাঝে মাঝে দিন কতকের জন্যে কোথায় উধাও হয়ে যায় কেউ জানে না।

পাঁচুর সংসারে ওর বউ, দুয়ার চারটে ছেলেমেয়ে। একটা গাই গরু। এছাড়া আর কিছু সম্পত্তি আছে পাঁচুর। দুইখানা বড় রামদা। কালীর খাঁড়ার মত। দু'খানা মজবুত বেতের ঢাল। আর একগাছা সড়কি। মাঝে মাঝে ওগুলোতে ধার দিতে বসে পাঁচু।

যশোর, খুলনা, ফরিদপুর তিন জেলাতে পাঁচুর যাতায়াত। যেখানে জমিজমা নিয়ে কাইজে লড়াই—সেখানেই একপক্ষে পাঁচু সর্দার সেনাপতি। লড়াই ও সর্দারি করতে করতে ওর উপাধি বিশ্বাস থেকে সর্দার হয়ে গেছে।

লোকে বলে বছরে দু'দশটা লড়াই এ সর্দারি করে যা পায়, তাতেই ওর সংসার চলে যায়। দু একবার জেল হাজত খাটতেও হয়েছে। কেউ কেউ বলে অভাবে পড়লে পাঁচু দিন কয়েক উধাও হয়ে যায়। দূরে কোথাও গিয়ে দু'একটা ডাকাতি করে কিছু রোজগার করে আনে। তবে লোকটার ওদিকে লোভ নেই। পুলিশের খাতায় পাঁচু সর্দার লেঠেল হিসাবেই খ্যাত, ডাকাত হিসাবে নয়। বরং পুলিশ ওকে একটু সমীহ করেই চলে।

মায়ের পুজো দিয়ে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে বাঁ হাতে ঢাল, ডান হাতে সড়কি, কোমরে রামদা নিয়ে রণহুংকার দিয়ে এগিয়ে যায় পাঁচুসর্দার। বিপক্ষ সড়কির পাল্লার মধ্যে এলে হাঁটু গেড়ে বসে। গায়ের লোম, মাথার চুল সব খাড়া হয়ে ওঠে।

অব্যর্থ লক্ষ্যে একটাকে ফুঁড়ে ফেলে হুংকার দিয়ে ওঠে পাঁচু—জয় মা কালী। এক লাফে সামনে রামদার এক ঝোপে আহত শত্রুর মাথাটা কেটে নিতে হবে।

পাঁচু তারপর ওটাকে এক মুহূর্তে উঁচু করে ধরে দেখিয়ে নেবে সকলকে। আবার হুংকার ছাড়বে, আর শালারা আগো, জয় মা কালী।

বিপক্ষের 'আল্লা-হো-আকবর' থেমে যায়। ভয়ে পিছন ফিরে পালাতে থাকে। কাটামুণ্ডু দেখে ওদের মনোবল ভেঙে যায় স্বপক্ষের মনোবল যায় বেড়ে। তারা এগিয়ে আসে রৈ রৈ করে।

তারপর পিছন ফিরে ছুটতে থাকা শত্রুর দু'চারটে নির্ঝঞ্ঝাটে ফুঁড়ে ফেলো। আর মাথাগুলো কেটে নিয়ে চক্ষের নিমেষে চম্পট দাও। মাথাগুলো কেটে আনা দরকার, যাতে কেউ মৃত-ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে না পারে।

পাঁচু সর্দারের হুকুম, স্বপক্ষের কেউ পিছন ফিরে উল্টোদিকে পালাতে পারবে

না। তা হলে তাকেই শেষ করে দেওয়া হবে। দলের দ্'চার জন যদি পড়েও যায় বিপক্ষের সড়্কির ঘায়ে, তব্ পালান যাবে না। যে পড়ে যাবে তাকে পিছন দিকে টেনে সরিয়ে নিতে হবে।

পাঁচুর তখন অন্যর্প। অথচ এমনিতে লোকটা বিনয়ী, নম্র, নিতান্ত সাদাসিদে ভাল মান্ষ।

জ্যোতিষবাব্ বললেন, কি সর্দার, খবর কি? কেমন আছে তোমার ছেলে?

অনেকটা সুবিধে হয়েছে খ্ড়ো। আগের থিকে অনেকটা ভাল আছে। জ্বরটা একটু কমেছে, জ্বালা যন্ত্রণাও একটু কম মনে হচ্ছে। তখন তো আপ্নি থাকেন নি। দিদিমণি ব্ললে জিয়োল তলায় গেছো, ফিরতি সেই দ্পোর গড়ে যাবে। আমি বলি, তাইলে উপায় কি। তুমি ওষ্ধ দাও, দিদি। তা দিদি আমার ডাক্তার হয়ে উঠেছে।

হ্যাঁ, তা ও আজকাল ওষ্ধপত্র মোটাম্টি দিতে শিখেছে।

তা আর শেখবে না। ছোটবেলা থেকে আপ্নি হাতে করে শিক্ষে দেচ্ছ। তা ভগোবান ওরে গরীবগ্লোর সেবা করতি পাঠায়েছে। আপ্নি দ্ঃখ্ করো না খ্ড়ো।

না দ্ঃখ করার কি আছে। বড় কাজের জন্য যারা আসে, তাদের অনেক দ্ঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়। ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। তোমাদের দিদি এখন দেশের কাজে লেগে গেছে। শোন সর্দার, তোমাদেরও এসে দেশের কাজে লাগতি হবে।

পাঁচু বলে, আমরা আর কি কাজে লাগবো খ্ড়ো। লেহাপড়া জানি নে। বিদ্যে তো ঐ একটাই শিখেছিলাম। তা যদি দরকার হয় বলো খ্ড়ো, কোন শালার মাথা কাটি আনলি যদি মানবের উপগার হয় তো এই পাঁচু পেছপা হবে না। আপনার হ্কুম পালি জান দেবে এই পাঁচু।

লেখাপড়ার কোন দরকার নেই, পাঁচু। লড়াই করতি হবে। তুমি লেঠেল মান্ষ, বীর, সারাজীবন মান্ষের সাথে লড়াই করেছ, এবার লড়াই করতে হবে নোনা জলের সাথে। তা না হলি এই বিল আবাদ হবে না। মান্ষের বাঁচার আর কোন পথ নেই।

তা যা করতি হয় বলবা খ্ড়ো। পাঁচো আগোতে জানে, পেছোতে জানে না। সে গ্র্র হ্কুম পাঁচোর নেই। বলতে বলতে পাঁচুর মনে ভাবের উদয় হয়—ও গ্ন-গ্ন করে স্বর ধরে—

গ্র্ আমার উপায় বল না
জনমদ্ঃখী কপালপোড়া ভবে এই পাঁচো একজনা।

হঠাৎ পাঁচুর যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। বলে, খুড়ো সে সব কথা পরে হবে। এখন একবার আমার দোরে যে যাতি হয়। ছেনে-ডারে দেহেশুনে এট্টু ওষুধ করে দিয়ে আসতি হবে।

আচ্ছা যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। কোন ভয় নেই।

পরান মণ্ডল এসে হাজির।

কি খবর মোড়ল ?

খপোর ভাল। বেয়ানের যে সন্ধ্যের মার সে কি প্যাটব্যাথা। কিছুতি কিছু হয় না। পাতামুঠো করলাম, নুন সরষে খাওয়ালাম। কেরমেই বাড়তি লাগে। আসে দেখি তুমি বাড়ী নেই। রানুদিদিরি ধরে ওষুধ নিয়ে গেলাম। কি কব জ্যাঠা। খাওয়ানের সাথে সাথে য্যানো আগুনি জল প'লো। রুগী ঘোম প'ল।

তবে আবার এখন এলে কেন ? রোগী তো ভাল হয়ে গেছে।

পরান যেন একটু লজ্জা পায়। লজ্জিত মুখে বলে, ঘোমের থেকে উঠে কেবল খাতি চাচ্ছে। তা আমি কই, জ্যাঠার কাছে আগে শুনে আসি, কি খাতি দেয় না দেয়।

তা ভালই করেছ। আজ আর ভাত দেয়া যাবে না। কি খেতে দেওয়া যায় বল দেখি রিণী মা। রিণী ইতিমধ্যে এসে বসেছিল।

রিণী বললে, ডাবের জল, আর বার্লি খেয়ে থাক আজ। কাল তখন গরম ভাতে জল ঢেলে কাঁচা ঠটে কলা আর থানকুনি পাতার ঝোল দিয়ে খাবে।

তাই করগে পরান। তোমার দিদি যা বলল।

ওষুধ আর লাগবে না, জ্যাঠা ?

না। বেশী ওষুধ খাওয়া ভাল নাকি। কাল ভাত খাবার পর কোন অসুবিধে হলে সেইমত ওষুধ দেওয়া যাবে।

পরান আর পাঁচু উভয়েই উঠে পড়ল। বেরুতে গিয়ে পাঁচু ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, আমি তাইলে গেলাম। আপুনি কিন্তুক তাড়াতাড়ি আসো খুড়ো।

আচ্ছা দাঁড়াও, সর্দার তুমি এক কাজ কর। দু'মাত্রা ওষুধ নিয়ে যাও। আমার তো জান, নানা ভ্যাজাল। একটু দেরী হতে পারে। সন্ধ্যের আগে একবার দেখে আসব। এই ওষুধ দিলাম। আমি যেতে যেতে রোগী ভাল হয়ে যাবে দেখবে। শিশি এনেছ ?

না তো খুড়ো। আপনারে নিয়ে যাব বুলে আইছি।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি মোড়া করে দিচ্ছি।

ওষুধের পুরিয়া দু'টো হাতে নিয়ে তবু পাঁচু একটু দাঁড়িয়ে থাকে। জ্যোতিষবাবু বলেন, কি সর্দার, কিছু বলবে ?

না, বলছিলাম ওষধের দামডা········।

জ্যোতিষবাবু হেসে ওঠেন, এই কথা। যখন পার দিও। ওর জন্যে ভেব না, আর আটআনা পয়সা দিলেই হবে।

পাঁচু আর কথা বলতে পারে না। ধীরে ধীরে নেমে চলে যায়।

॥ ১৩ ॥

জমিদার বারীন ঘোষের নায়েব হরিশ চাটুজ্যে ধবধবে ফরাসের উপর বসে গড়গড়া টানছেন। সামনে বেঞ্চিতে হেলান দিয়ে বসে আছে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট কামাল মিঞা আর চুকনগর হাটের ইজারাদার শচীন বিশ্বাস। কাছারীতে গোপন বৈঠক চলছে।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার বারীন ঘোষের স্বনামধন্য নায়েব হরিশ চাটুজ্যে। এতদঞ্চলে হরিশ চাটুজ্যের নামে ভয় পায় না এমন লোক খুব কমই আছে। হরিশ চাটুজ্যে দিনকে রাত, রাতকে দিন করতে ওস্তাদ। বাকী খাজনার দায়ে পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে প্রজাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নানাপ্রকার লাঞ্ছনা এমনকি জুতামারা পর্যন্ত কোন প্রকার অত্যাচারে তিনি পরাঙমুখ নন। ইদানীং অত্যাচারের মাত্রাটা অনেক কমে গেছে। এখন তার নোতুন নীতি। তিন বছর খাজনা বাকী পড়লেই জমি খাস করে নেন। নোতুন বন্দোবস্ত দেন। বেশীর ভাগ জেলেদের মধ্যে। কারণ নোনা বিলে প্রায়ই ধান হয় না। জেলেরা ঘেরী দিয়ে মাছ ধরে। ওদের তাই জমি বন্দোবস্ত নেবার আগ্রহ বেশী। এই সুযোগে হরিশ চাটুজ্যে বেশ কিছু সেলামী পেয়ে যান। আর বন্দোবস্ত তো বেশীর ভাগ কাগজে কলমে নয়, মুখে মুখে। ওঠবন্দী ব্যবস্থা। যে গুলো মুখে মুখে বন্দোবস্ত তার সব সেলামীটাই হরিশ চাটুজ্যে পান এবং সুবিধামত বছরে বছরে নজরানা না পেলে লোক বদলে দেন। জমিদার জানেন জমি খাস হয়ে পড়ে আছে। আর লেখাপড়া যেগুলো হয় তাও অস্থায়ী— বছর বছর ব্যবস্থা করে নিতে হয়। অর্থাৎ হরিশ চাটুজ্যের বার্ষিক পাওনাটা ঠিকই থাকে।

বাঁ হাতে গড়গড়ার নলটা সরিয়ে ধরে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমার অগ্রভাগ দিয়ে গোঁফজোড়া শাসন করতে করতে নায়েব মশাই বললেন—তা হলে বিশ্বেস মশাই, কি বুঝছেন?

আমি তো কিছু ভাল বুঝছি না, নায়েব মশাই।

কেন ?

এতবড় কৃষক সম্মেলন এ অঞ্চলে কেউ কখনো দেখেছেন কি ?

তা নাই বা হ'লো, তাতে হয়েছে কি ?

জমিদার, জোতদার, ইজারাদার এদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে সব কৃষক শ্রমিক। এরপর কি আর চাষাভুষোরা আমাদের মানবে ?

হরিশ চাটুজ্যে কথাটা শুনে বোধ হয় একটু কৌতুকবোধ করলেন। একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর চোখ দুটো ছোট করে কামাল মিঞার দিকে চেয়ে বললেন, কি, কামাল মিঞা কি বলেন ? আপনিও কি বিশ্বেস মশায়ের মত ঘাবড়ে গেলেন নাকি ?

আপনাদের আশীর্বাদে কামাল ঘাবড়াবার ছেলে নয় নায়েব মশাই। বিশ্বেস মশাই তো সেই সিনেমাবন্ধের সময় বিশ পঁচিশজন ছেলে ছোকরা দেখেই ঘাবড়ে অস্থির। এমন এক ভুল কাজ করে ফেললেন যে সিনেমাটা বন্ধই হয়ে গেল।

সিনেমাটা বন্ধ হয়ে যাক সেটা যে কামাল মিঞারও আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং তিনিই যে শচীনবাবুকে বিপথে চালিত করেছিলেন সে কথা বেমালুম চেপে গেলেন। মোছলমান যুবক ছেলে পিলে সিনেমার নাচ গান দেখে বয়ে যাক এটা তিনি চাননি। তারই পরামর্শ ও কৌশলে সেদিন শচীনবাবুকে যথেষ্ট অপমান স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হয়েছিল।

তবে কামাল মিঞাই আবার হাটে তোলা খাজনা বন্ধ আন্দোলনের সময় নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়ে আন্দোলন বানচাল করে দিয়েছেন। শচীন বিশ্বাস কামালের বুদ্ধি ও প্রতিপত্তির কথা ভালই জানেন। থানার দারোগা থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সব মুসলমান। কামাল তাদের বিশ্বাসভাজন এবং সর্বত্র তার গতিও অবাধ।

মুহূর্ত থেমে কামাল একটু আত্মপ্রসাদের হাসি মেখে বলেন, তবে যখন হাটের তোলা বন্ধ করতে গিয়েছিল তখন দিয়েছি উচিত শিক্ষা দিয়ে। ছোটবড় সবগুলোকে জেলের ঘানি টানতে হয়েছে।

নায়েব মশায়ও স্মিত হাসিতে কামাল মিঞাকে আপ্যায়িত করেন। লীগের শাসনে এখন মুসলমানদের সর্বত্র প্রতিপত্তি। একজন হিন্দু জমিদারের কথা যেখানে ম্যাজিস্ট্রেট শুনতে চান না, সেখানে একজন ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেন্টের কথায় কাজ হয়ে যায়। একথা চতুর নায়েব ভাল করেই জানেন। ঘটনা যা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে সবই তিনি খবর রাখেন। তবু এদের ডেকে বসেছেন এদের একটু খুসী রাখতে, দলে রাখতে। এবার যা ঘটতে যাচ্ছে তাতে এদের গায়ে মোটেই হাত পড়বে না। পড়বে জমিদারের গায়ে এবং বিশেষভাবে স্বার্থ নষ্ট হবে নায়েবের।

নায়েবমশাই বলে উঠলেন, তবে আর আপনার ভাবনা কি বিশ্বেস। কামাল ভাই যখন আপনার ডান হাত।

বিশ্বাস মশাই স্বীকার করেন। তা যা বলেছেন। ভাই সাহেব সব সময় আমার পাশে আছেন। ক্ষতি কিছু করতে পারবে না। তবে দিন দিন এইসব ছোটলোকেরা আর আমাদের মানতে চাইবে না।

আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন বিশ্বেস মশাই। ও সব ভেড়ার পালকে আমার চেনা আছে। ওদের চুকে কথা বললেন তো ওরা মাথায় উঠে বসবে। ডাটের সঙ্গে কাজ করে যান। আইন আছে, পুলিশ আছে। দরকার হলে বলবেন, জমিদারের লেঠেল বরকন্দাজরা শুধু শুধু পয়সা খায় না। তবে ওদের নেতাদের সঙ্গে অবস্থা বুঝে ব্যবহার করতে হবে। ওদের নাচাচ্ছে কারা খবর রাখেন?

তা একটু আধটু রাখি বই কি। পালের গোদা তো সেই কেষ্ট চক্রবর্তী। আরে বাপু, তুই ও তো ছোট হলেও একটা জমিদারের ছেলে। কোথায় বিষয় সম্পত্তি দেখবি—ভালভাবে থাকবি; তা নয় এই সব চাষাভুষোদের নিয়ে দল পাকিয়ে এদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছিস।

কামাল মিঞা বলেন, নেতা হতে চায়। গান্ধী, সুভাষ বোস, জিন্না হতে চায় আর কি? ওই যে বলে না বামুন হয়ে চাঁদ ধরবার ইচ্ছে।

নায়েব মশাই অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বলেন চাঁদ আর ধরতে হবে না বাছাধনের। এবার বেশী লাফালাফি করলে সে ব্যবস্থা করে দেব। ওই যে বলে না উঁইপোকার পাখনা ওঠে মরিবার তরে। তা যাক এদিকে কে কে খুব বেড়ে উঠেছে তাই বলুন শুনি।

শচীনবাবু বলেন, এদিকের মধ্যে ঐ যে জ্যোতিষ ডাক্তারের ভাইঝি-জামাই সুবীর। অনেকবার জেলটেল খেটেছে। লজ্জাও নেই, ঘর জামাই হয়ে আছে। ওই হচ্ছে সর্দার। যত সব যুবক ছোকরার দল ওর কথায় ওঠে বসে। তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়ল এমনিভাবে কামালকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ভাল কথা কামাল ভাই, আপনাদের জহির মোড়লের ছেলে মনিরুদ্দিও যে ঐ দলে ভিড়েছে।

ঈষৎ লজ্জার ভাবটা কাটিয়ে কামাল এবার যে উত্তর দিল তার জন্য বিশ্বাস মশাই বা নায়েব মশাই কেউ বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না।

কামাল বললেন, জ্যোতিষডাক্তারের রাঁঢ় ভাইঝিটার গন্ধে মনিরুদ্দি কেন আরও অনেকেই ঐ দলে ঘুরছে সে খবর বিশ্বেস মশায় না রাখলেও আমি রাখি। একটা কিছু ঘটে গেলে তখন কিন্তু দোষ দিতে পারবেন না নায়েব মশায়, তা কিন্তু বলে রাখছি।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই ঘোষেদের এস্টেটে আজ তিরিশ বছর নায়েবী করে কাটল হরিশ চাটুজ্যের। পাঁচ বছর আগে কোন মোছলমান প্রজা নায়েবের মুখের উপর কোন হিন্দুকন্যা সম্বন্ধে এমন ইঙ্গিত করলে তাকে আর কাছারী থেকে ফিরতে হত না। কামালের কথাগুলো যেন চাবুক মারল হরিশ চাটুজ্যের সেই দুর্দান্ত অহংকারী সত্বাকে। ক্রোধে চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল নায়েবের। কিন্তু সংযত হতে হ'ল। উপায় নেই। জামানা বদলে গেছে। লীগের রাজত্ব। কামাল মিঞাকে এই ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেওয়া তো দূরের কথা চটানোও চলবে না।

গড়গড়ায় ধোঁয়া ছেড়ে মুখের ভাবটা সামাল দিলেন নায়েব। আর কামালের কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে শচীনবাবুকে বললেন, মেয়েরাও এই আন্দোলনে নামছে। একটা রীতিমত আন্দোলনই বলতে হবে। একটু ভাবিয়ে তুললেনই বটে। যাক তবে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করলেন তো শুনলাম যশোরের নেতা সৈয়দ নওসের আলি সাহেব।

নায়েবের ইঙ্গিতটা বক্র, অর্থাৎ মিঞারাই তো এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। নায়েবের হিন্দুত্বের মর্যাদায় আঘাত করেছে কামাল, তার জ্বালাটা রি রি করছে সর্বাঙ্গে।

কামাল অতটা বুঝতে পারলেন কিনা বোঝা গেল না। তবে বললেন, নওশের আলি মোছলেম লীগের সমর্থক নন। উনি বরং কংগ্রেসী ঘেঁসা।

নায়েব কৃত্রিম বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, তাই নাকি ? বলেন কি কামাল মিঞা। এযে বিশ্বাসই হয় না। মুসলমান হয়ে মোসলেম লীগকে মানে না—সে কি। জাতীয়তাবাদী মুসলমান নামে মুসলমান হলেও জন্মে মুসলমান কিনা কে জানে। ছিঃ ছিঃ।

এতক্ষণে নায়েবের মনের জ্বালা মিটল। একজন মুসলমান নেতাকে কামাল-এর মুখের উপর কৌশলে বেজন্মা বলে ইঙ্গিত করতে পেরে যেন তিনি অপমানের প্রতিশোধ নিলেন।

কামালেরও এবার ভাল লাগে নি, যদিও প্রতিবাদের জুতসই কোন ভাষা সে খুঁজে পেল না। শচীন বিশ্বাস একটা অশুভ কিছুর আশংকায় মনে মনে শংকিত হয়ে উঠলেন।

দারোয়ান এসে সেলাম দিল। কালাচাঁদ এসেছে।

এখানে নিয়ে এস।

যে সব জেলেরা জোয়ার বিলের জমি বন্দোবস্ত নিয়ে বা না নিয়ে মাছ ধরে খাচ্ছে কালাচাঁদ তাদের সর্দার। নায়েব মশাই ওকে কালু বলেই ডাকেন। লোনাজলে

ফসল মরা জমি খাস হোক বা না হোক তলে তলে একটা মৌখিক বন্দোবস্ত দিতে কালুই নায়েবের উপযুক্ত সহায় এবং সে কারণেই তার খুব প্রিয়পাত্র। আজ কিন্তু নায়েব ওকে একটু অতিরিক্ত সম্মান দেখিয়ে বললেন, বস, কালাচাঁদ। বলে একটা চৌকি দেখিয়ে দিলেন।

নায়েবের সামনে দাওয়ায় মাটীতে বসাই এদের অভ্যাস। কালু তাই ইতস্ততঃ করতে থাকে।

কি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস।

নায়েবের ব্যবহারে আজ ভদ্রতার অভাব নেই। কিন্তু যে সস্নেহ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে কালু পরিচিত তা একান্তই অনুপস্থিত। কালুর সঙ্গে তিনি হেসে রসেই কথা বলেন। তার সম্পূর্ণ বিপরীত। ওর সঙ্গে এমন গম্ভীর ভাবে তিনি কখনই কথা বলেন নি।

কালু জড়সড় হয়ে বসল।

এ কয়দিন তোমাদের খুব খাটাখাটনী গেল, কি বল, কালাচাঁদ?

তা যা বলেছেন হুজুর। চোপর দিন রাত কাজ আর কাজ। এটু ঘুমুতি পারি নে বাবু।

সম্মেলনে তোমাদের কি কি কাজ ছিল?

এই ধরুন গে বাবু, রান্নার কাঠ চেরাই করা, জল তোলা, পাতা ফেলা। আমার গে একজন সর্দার ছেলো। সে যে কাজে যখন লাগতি বলত তক্ষুণি তাই করতি হতো।

কে তোমাদের সর্দার হয়েছিল।

কেন ঐ যে পাঁচো সর্দার গো, সেই যে লেঠেল পাঁচো। লেঠেল না, ডাকাত?

ঐ হলো গো বাবু। কেউ বলে লেঠেল, কেউ বলে ডাকাত।

হুঁ, তা বেশ খাওয়া দাওয়া হল এ কদিন, কি বলো।

তা যা হোক হল আর কি!

কি কি খেতে দিত।

ভাত, ডাল, একটা ঘ্যাট আর তেঁতুলির টক।

মাছ, মাংস কিছু ছিল না? তবে এত খাটা-খাটুনী করে কি খেলে?

মাছ, মাংস কনে পাব বাবু। ডাল ভাত তাই জোটে না। চাল ডাল সব গেরামে গেরামে মেগে আনে ছেল।

তারপর মিটিং-এ কি হল?

অনেক বাবুরা এয়েলো। সব বক্তৃতা হ'ল। জেলার কিলি জোয়ানে খাজে

বাঁধ দিবে—যাতে নোনা জলে আর ধান মারতি না পারে। বিলি আবার কি বছর আবাদ হবে। মানষির আর অভাব থাকবে না।

হুঁ, কিন্তু তোদের উপায় কি হবে? তোরা মাছ ধরবি কোথায়?

যাতি হবে বড় গাংএ। আর কি করব?

বড় গাংএ মাছ ধরে তোদের পোষাবে? সে সাজসরঞ্জাম তোদের কোথায়?

তা তো বুঝতিছি বাবু, কি করব।

কি করবি মানে? তুই বিলির জমি বন্দোবস্ত নিস্‌নি জমিদারের কাছ থেকে?

তা তো নিছি বাবু। নিছি তো পাঁচ দশ বিঘে। মাছ ধরি গোটা বিলি। যাগের জমি তারা যদি আবাদ করে তা আমরা কি করতি পারি।

আবাদ করে করুক না। বাঁধ দেবে কোন আইনে? এটা কি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি?

তা এত লোক যদি বাঁধ দেয় আমরা কি ঠেকাতি পারি?

কেন পারবি নে? দেশে আইন নেই? জমিদার নেই? গবরমেণ্ট নেই?

তোরা যদি বাঁচতি চাস তো বাঁধ বাঁধা ঠেকাতি হবে। আর মরতি চাস তো যা পারিস করগে যা।

কালাচাঁদ মাথা হেট করে বসে থাকে। জোয়ারের সময় নদীর মাছ বিলে এসে ওঠে। ভাঁটার আগে ঘেরা দিলে সহজে প্রচুর মাছ ধরতে পারে ওরা। সে সুযোগ নষ্ট হবে বিলে আবাদ হতে শুরু করলে। জেলেদের কষ্ট হবে তাতে সন্দেহ নেই। বড়নদীতে মাছ ধরার পরিশ্রমও বেশী, সাজসরঞ্জাম লাগে অনেক। কিন্তু হাজার হাজার কৃষকের বিপক্ষে ক'ঘর জেলেরা দাঁড়াবে কি করে।

কালাচাঁদ চুপ করে থাকে। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। নায়েবের প্রস্তাবে 'না' বলাও কঠিন। 'হ্যাঁ' বলাও কঠিন। গরীব জেলেদের উভয়দিকে মরণ। নায়েব চটলেও অসুবিধা, চাষীরা চটলেও অসুবিধা। ভেবে দেখা দরকার কার হাতে মরা ভাল—রাবণের হাতে, না রামের হাতে।

নায়েব কালাচাঁদের মনের অবস্থা টের পান। এমতাবস্থায় ওকে সময় দেওয়া প্রয়োজন। বলেন, তুমি এক কাজ কর কালাচাঁদ, আজ তোমাকে কিছু স্থির করতে বলছি না। বাড়ী যাও, গিয়ে সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে দিন কয়েক পরে আমাকে জানিয়ে যেও। তবে দেরী করো না। আমাকে তো আবার সেইভাবে কাজ করতে হবে।

কালাচাঁদ উঠে পড়ে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলে, আসি তবে বাবু। দেখি সগলের সাথে পরামশো করে।

হ্যাঁ, দেখো। তবে মনে রেখো তোমরা যদি বাধা না দাও, তবু জমিদার চুপ করে থাকবে না। সে যা করার করবে। তবে তোমরা তা হলে আর বিলের দিকে যেও না। আর যদি বাধা দিতে চাও তবে তোমাদের কোন ভয় নেই। যা করার জমিদারই করবে। তোমরা উপলক্ষ্য মাত্র। দরকার মত কাগজপত্রে দু'একটা সই দেবে, আর মামলা মোকদ্দমা হলে দু'একদিন সদরে যেতে হবে।

কালাচাঁদ চলে গেল। নায়েব মশায় মুচকি হেসে বললেন, কেমন বুঝলেন কামাল মিঞা ?

কামাল বললেন, শেষে যে ডোজটা দিলেন এতেই কাজ হবে।

হলেই ভাল। না হলে অনেক জল ঘোলা করতে হবে। তবে আপনি সহায় থাকলে আমি ভাবিনে। কামালকে একটু উঁচিয়ে দেন।

কামাল বলেন, কেন, সে কথা বললেন মশায়। আমি কি আপনার বিরোধিতা করেছি ?

না, তা করেন নি। তবে এখানে যে অনেক মোছলমানও আছেন। মনিরুদ্দি, জহির মোড়ল থেকে আরম্ভ করে মায় নওসের আলি সাহেব পর্যন্ত।

ও রকম দু'চার জন হারামির বাচ্চা—দেশের শত্তুর চিরকাল থাকবে।

নায়েব হাসলেন।

কামাল আর শচীন উঠে পড়লেন। আসি আজ নায়েব মশায়।

হ্যাঁ, আসুন। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, দেখুন সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। বিশ্বাস মশায় তো আর কোন কথা বললেন না।

আমার আর বলার কি আছে। যা করণীয় করুন। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি এই পর্যন্ত বলতে পারি।

তাই থাকলেই হ'ল। মোটেই ভয় পাবেন না।

॥ ১৪ ॥

জেল থেকে বেরিয়ে একমাসও সময় পায়নি সুবীর। এরই মধ্যে তাকে এক বিরাট সম্মেলনের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রায় এক হাজার লোক খেয়েছে তিনদিন ধরে। গ্রামে গ্রামে মেগে মেগে তার চাল ডাল সংগ্রহ করতে হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে অতিথিদের থাকা খাওয়ার যাবতীয় ভার ছিল তার উপর। অবশ্য সমস্ত কাজগুলো কতকগুলো

বিভাগে ভাগ করে নিয়েছিল সে। প্রত্যেক বিভাগের একজন সহকারী ছিল তার। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ বিষয়ে তার উপযুক্ত সহকারী পেয়েছিল সে পাঁচু সর্দারকে। লোকটা অশিক্ষিত হলেও নেতৃত্ব দেবার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে ওর। সে তার দলবল নিয়ে সুষ্ঠুভাবে রান্নাবান্না ও পরিবেশনের ব্যবস্থা করেছে। সম্মেলনের প্রচার ও কার্যসূচী রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেছে রিণী যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে। পরামর্শদান ও তত্ত্বাবধান অবশ্য করেছেন জ্যোতিষবাবু ও কেষ্টবাবু।

সুবীর আর রিণী দু'জনের কাজ এবার ভিন্ন প্রকৃতির। কার্য উপলক্ষ্যে উভয়ের যোগাযোগ খুব বেশী হয়নি। দিনরাতের মধ্যে দু'চারটে কাজের কথা হয়ত দু'চার মিনিটের মধ্যে সেরে নিতে হয়েছে। রিণী তার কার্যসূচীর একটা কপি সুবীরকে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই দেখে সুবীর বুঝে নিয়েছে কখন তাকে আহারের ব্যবস্থা বা জলযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। কখন কোন সভার আয়োজন করে দিতে হবে এবং এ সব করতে গেলে স্বেচ্ছাসেবকদের কি ভাবে কাজে লাগাতে হবে, তা তাকেই ঠিক করে নিতে হয়েছে। তারপর তার পরিকল্পনায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অনুমোদন বা সংশোধন করে দিয়েছেন কেষ্টবাবু। রিণীর কাছাকাছি আসার সময়, সুযোগ বা প্রয়োজনীয়তা কোনটাই দেখা দেয়নি।

সুবীরের মনে হয়েছে জেলে যাওয়ার আগে থেকে সেই যে রিণী তাকে যেন এড়িয়ে এড়িয়ে চলছিল সেই ভাবটাই সে বজায় রেখেছে। জেলে তাকে একবার দেখতে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু উদ্দেশ্য তো দেখতে যাওয়া নয়, কেষ্টদাকে অভ্যর্থনা জানাতে যাওয়া।

ভাবনাটা মাঝে মাঝে মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে ওর কাজের মেজাজটা খিঁচড়ে দিতে চায়। যেন সুর কেটে যেতে থাকে। প্রাণপণে সেটাকে ঝেড়ে ফেলে ও খেটেছে। আর এমনি করে যতই খেটেছে ততই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

জেল থেকে বেরোবার আগে ও মনে মনে ভাবত এবং ভাবতে ওর খুব ভাল লাগত যে রিণী তাকে কেষ্টদার মত অভ্যর্থনা করে আনতে শহরে যাবে। কিন্তু জেলের গেটে দেখা গেল কয়েকটি ছেলে ছাড়া আর কেউ যায়নি।

সুবীর ভাবতে চেষ্টা করেছিল যে জ্যাঠামশাই আসেননি তাই রিণীর পক্ষে বোধহয় এদের সাথে শহর পর্যন্ত আসতে চাওয়া সম্ভব হয় নি।

বাড়ীর আগের দিকে রাস্তার ধারে অবশ্য স্থানীয় সবকর্মীরা সমবেত হয়েছিল। সকলেরই হাতে এক একটা ফুলের মালা। আর এরই মধ্যে ছিল একজন ভীরু সলজ্জ মহিলা। তারও হাতে একটা মালা। আর প্রায় তার চারপাশে ঘিরে ছিল অনিল, ভোলা, পুলিন, বিল্টু এরা। যেন ছাড়া পেলে পালিয়ে যাবে।

অপ্রত্যাশিত এই মহিলাকে দেখে চমকে গিয়েছিল সুবীর। অনিল, বললে, দেখ বীরুদা, কে এসেছে তোমাকে অভ্যর্থনা করতে। দাও বৌদি তুমিই সকলের আগে বীরুদার গলায় মালাটা পরিয়ে দাও।

সুবীর নিজেই স্ত্রীর হাতের মালাটা নিয়ে গলায় পরলে। ওদিকে তখন গমগমে শঙ্খধ্বনি উঠেছে।

অনাড়ম্বর এমন প্রাণঢালা অভিনন্দনের উত্তরে দু'একটা কথা বলতে হয়। তাই যেন নিতান্ত নিয়মরক্ষার জন্য সুবীর সবাইকে ধন্যবাদ দিল। মনের মধ্যে একটা অস্থির বেদনা ওকে কুরে খাচ্ছিল। রিণীর টিকিটিও ও দেখতে পেল না।

অথচ বাইরের ঘরটা বিশেষভাবে সাজানো গোছানো। একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা যে এর পিছনে কাজ করছে সেটা সে বুঝতে পারছিল। আর ঐ পরিকল্পনার পেছনে কে আছে তাও তার অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছিল না, অথচ সেই ব্যক্তিটি আশ্চর্য রকমে অনুপস্থিত।

সুবীরের জেল থেকে বেরিয়ে আসা উপলক্ষ্যে স্থানীয় কর্মীদের নিমন্ত্রণ করা, তাদের ক'জনকে শহরে পাঠান সুবীর আর মন্মথকে নিয়ে আসতে। এখানে এলে তাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা-পরিশেষে সব কর্মীকে লুচি মিষ্টি খাইয়ে আজকার অনুষ্ঠান শেষ করা—এর সব পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা একমাত্র রিণীর। জ্যোতিষ-বাবুর এমন কোন ইচ্ছা ছিল না, বরং বাড়াবাড়ি বলে তাঁর মনে হয়েছিল এটা। কিন্তু রিণী নাছোড়বান্দা।

রিণীর যুক্তি, আমরা নিজেরা যদি নিজেদের লোককে সম্মান না দিই তবে অপরে দেবে কেন? আমাদের জাতীয় চরিত্রের এটা একটা দুর্বলতা। আমরা আমাদের যা কিছু তাকে শ্রদ্ধা করতে সংকুচিত হই, অথচ যা বাইরের, বিদেশী তাকে নির্বিচারে মাথায় তুলে নাচি।

সেটাই তো আমাদের মহত্ব।

কিন্তু এর মধ্যে একটা হীনমন্যতা আছে। যে জাতি হীনমন্যতায় ভোগে তার বড় হবার দাবী টেঁকে না। তারাই মহান যারা নিজেকে বড় বলে জানে অথচ অপরকে ছোট ভাবে না।

অগত্যা টাকা দিতে হয়েছে জ্যোতিষবাবুকে। প্রথম দাবীতে যা পাওয়া গিয়েছিল তাতে শেষ পর্যন্ত খরচ কুলাবেনা দেখে, যা রিণী সাধারণতঃ করে না, তাও এবার করেছে অর্থাৎ বাবার কাছ থেকেও টাকা চেয়ে নিয়েছে। যুদ্ধের বাজারে আটা ময়দা দুষ্প্রাপ্য। অন্য ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে লোক পাঠিয়ে রিণী সংগ্রহ করেছে ময়দা।

আয়োজনের সম্পূর্ণতা দেখে জ্যোতিষবাবুও শেষ পর্যন্ত আশ্চর্য হয়েছেন। বলেছেন, জানতাম, ব্যবস্থা তুই ভালই করবি। কিন্তু এই বাজারে এত ভাল করতে পারবি তা ভাবিনি। কেন যে তুই ছেলে হয়ে জন্মালি না।

ছেলেমেয়েকে তোমরা বড় বেশী পার্থক্য কর কিনা সেইজন্য।

রিণী সেদিন এল একেবারে লুচির থালা হাতে নিয়ে। সুবীর বসতে চাইছিল না সকলের সঙ্গে। রিণী ছাড়লে না। তোমার সম্মানেই তো করছি আমরা। তুমি না বসলে হয়।

রাত্রে কমলাকে সুবীর বললে, মাত্র কয়েকমাস জেল খেটে তোমাদের কাছ থেকে যে অভিনন্দন পেলাম আজ, তাতে বছরের পর বছর জেলেই থাকতে সাধ হচ্ছে।

কমলা হাসল। বলল, তাই থাকগে যাও।

তুমি যে আজ আমাকে অভিনন্দন জানাতে যাবে সকলের সাথে তা ভাবতেও পারিনি।

না গেলে কি ছাড়ে তোমার সাকরেদেরা। যা দলবল তোমার।

হ্যাঁ, এরা বেশ খাওয়া-দাওয়ার ও ব্যবস্থা করেছে দেখলাম। চাঁদা তুলে দিয়েছে নাকি ?

হুঃ, তোমার ঐ বাউণ্ডুলেগুলো আবার চাঁদা তুলে দেবে। সে মুরোদ আছে তাদের। সবগুলো তো বাপের হোটেলের খদ্দের।

তবে এত খরচ-খরচা জুটলো কি করে ?

সে জানে তোমার রিণী। তলে তলে সেই সব করাচ্ছে। কোথা থেকে কি করে করাচ্ছে সেই জানে।

তুমিও এবার ওর সঙ্গে বেশ হাত মিলিয়েছ দেখছি।

না গেলে শোনে নাকি। তোমার দলবল লেলিয়ে দেয়। সুবীর একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়। সে বুঝতেই পারছিল এসব রিণীর কাজ। জ্যাঠামশায়ের সমর্থন আছে নিশ্চয়ই। তবু ব্যাপারটা ঠিকমত জেনে নিঃসন্দেহ হওয়া আর কি।

সুবীর বলে, তবে আজ খুব ভাল লাগলো, জানো। তুমি কিন্তু মালাটা ধরে এমন আড়ষ্ট হয়েছিলে যে আমি নিজে না নিলে তুমি বেকুব হয়ে যেতে।

আমি পারিনে, বাপু। আমার ভীষণ লজ্জা করে সকলের সামনে।

সুবীর কমলাকে টেনে নেয়। ওর মাথার উপর মুখটা ছুঁইয়ে দেয়।

শরীরটা শ্রান্ত। কিন্তু মনের অস্থিরতায় সুবীরের ঘুম পায়না। কমলাকে কাছে টেনে নেয়। তবু তৃপ্তি নেই।

সম্মেলন শেষ হয়ে গেছে। এই ক'দিন কাজের চাপে মনের দিকে ফিরে তাকাবার

কোন অবসর ছিল না। আজ সব কাজ চুকে গেছে। আজ আবার মনটা নিতান্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। এই ক্লান্তি আর অস্থিরতা মিলে ওকে যেন পশু করে তোলে। ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায়।

অবশেষে কমলা বলে, এমনি করে আর কতদিন চলবে। ব্যবসাটা তো এতদিন সেজজ্যাঠা কোনরকমে ঠেকা দিয়ে এসেছে। বাড়ী এসেও তো তোমার লাগবার সময় হল না।

সময় আর বোধহয় কোনদিনই হবে না, কমলা। দেশের কাজ আর মুনাফা চিন্তা দুটো একসঙ্গে হবে না। একটা ছাড়তেই হবে। তবে আমি ছাড়তে চাইলে ও দেশের কাজ আমাকে ছাড়তে চাইবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এদিকে যে তোমার সংসার বেড়েই চলেছে। আবার কেউ আসবে হয়ত।

ওঃ, সুবীরের আর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ভেবে দেখতে হবে। পাশ ফিরে ও ঘুমোবার চেষ্টা করে।

॥ ১৫ ॥

ডাক যখন আসে তখন সে ডাক শোনার মত কান চাই, আর সেই ডাকে সাড়া দেবার মত প্রেরণা ও ইচ্ছাশক্তি চাই। হয়ত সকলের জীবনেই কোন না কোন সময়ে এমনি ডাক আসে। আমরা শুনতে পাই না। বা সাড়া দিয়ে ও এগিয়ে যেতে পারি না। নানা বাধা। ভয়, আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস, পারিবারিক স্নেহ মোহ বন্ধন। একটুখানি সুখ, একটুখানি আরাম আমাদের হাতছানি দিয়ে পিছনে ডাকে। আমরা এগিয়ে যেতে পারি না অনিশ্চিতের পথে, আত্মত্যাগের পথে, মহৎ জীবনের পথে। কখনও আবার একটু এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াই। ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মোহজালে আটকে যায় পা দু'টো। দিশেহারা হয়ে ঘুরে মরি একই কেন্দ্রে কলুর চোখবাঁধা বলদের মত।

সুবীরও থমকে দাঁড়িয়েছিল। রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তার অগ্রগতি। হয়ত এতদিনে সে ব্যবসায়ের বাঁধা পথে এগিয়ে নিজস্ব ঘরবাড়ী করে গুছিয়ে বসতে পারত। সমাজ সংসার হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করত ওকে। স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে আর পাঁচজনের মত সুখী হয়ে উঠতে পারত।

কিন্তু তা হ'লো না। হ'ল যে না তাও তার নিজের ইচ্ছায় নয়। ঘটনাচক্র আবার তাকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেল। আবার যেন কার ডাক তার কানে বড় স্পষ্ট

হয়ে উঠল। আর সেই ডাকে এগিয়ে যাবার জন্য পেছন থেকে ধাক্কা মেরে কে তাকে সামনে ঠেলে দিল। আর সেই ধাক্কায় সে খানিকটা হেঁটে, খানিকটা দৌড়ে, অনেকটা দৌড়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে এই অল্প সময়েই।

কিন্তু আজ বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছে। আর যেন পা চলতে চায় না। তাই বলে আবার সে ব্যবসার জীবনে প্রবেশ করে গতানুগতিক। সংসারজীবন যাপন করে খুশী থাকতে পারবে—তাও পারবে না। কেউ তাকে তেমন থাকতে দেবেও না। চলতে তাকে হবেই, অথচ চলার জন্য যে শক্তি, যে উৎসাহ দরকার তা যেন সে আর বোধ করছে না। এমনি করে চলা যে কি কষ্টের তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কাকেও বোঝান যায় না। এতে পথ এগোবে না। পথের মাঝে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অপমৃত্যুও ঘটতে পারে।

ঘটুক। গাছে তুলে দিয়ে যদি কেউ মই কেড়ে নিতে চায় নিক। সে পড়েই মরবে।

এমনি একটা বিক্ষিপ্ত অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সুবীরের মন। কালরাতে ফিরতে প্রায় ভোর হয়ে গেল। বেলা আটটার পর ঘুম থেকে উঠে অবসন্ন দেহমনটা টেনে এনে ইজি চেয়ারটায় এলিয়ে দিয়েছিল সুবীর। কাউকে কিছু বলে নি। কারো সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছাও নেই। নিজেকে মেলে ধরে একটু ভাল করে একবার বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। আর তাই করতে গিয়ে গত কিছুদিনের ছবিটা মনের মধ্যে ভেসে উঠেছে।

রিণীর দেখা নেই। জ্যোতিষবাবুও কোনদিকে বেরিয়েছেন। কমলাই এক কাপ চা দিয়ে গেল, তা যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনি বিস্বাদ।

সুস্বাদের জন্যে যে দুটো ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি প্রয়োজন—রসনা আর মন—তার কোনটাই যখন তৃপ্ত নয়, তখনও তাকে স্বাগত জানাতে হবে। বাঃ বেশ হয়েছে বলে প্রশংসা করতে পারলে আরও ভাল হত। সুবীর তা পারল না। পারল না, কারণ এই অসত্য, এই ফাঁকি কঠিন উপহাসে ধিকৃত করে আরো ছোট করে দিত। মিথ্যাকে সবসময় মিথ্যা বলে স্বীকার করা কঠিন, আর সেই স্বীকারের মধ্যে কল্যাণের চেয়ে অনেক সময় অকল্যাণই জন্মায় বেশী। কিন্তু তা বলে মিথ্যাকে সত্য বলে চালানোর মধ্যে যে মনুষ্যত্বের অপমান তাকে ডেকে আনার চেয়ে অগৌরবের আর দুর্ভাগ্যের কিছুই হতে পারে না।

সুবীর অতটা নীচে নামতে পারে না। ভাবলেশহীন মুখে ও চায়ের কাপটা তুলে নেয়। কমলা একটু দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করে, আর কিছু দেব।

না, একটু পরেই চান করে দু'টো খেয়ে ঘুমিয়ে নিতে চাই। পারবে দু'টো ভাত দিতে। পার তো দেখ। বলে সুবীর মুখ তুলে চাইলে কমলার দিকে।

অনভ্যস্ত হাতে চা করে এনেছে কমলা। একটা কিছু বলা উচিত সুবীর বোধ করে। নৈলে ও নিশ্চয়ই আঘাত পাবে। অথচ মিথ্যা বলে কোন লাভ নেই। এই মুহূর্তে কেমন যেন মায়া হচ্ছিল ওর উপর। বললে, তোমার তো চা করার অভ্যাস নেই। কাজেই খুব ভাল না হলেও তোমাকে দোষ দেওয়া যাবে না। বরং মাঝে মাঝে চা করে দিও—অভ্যাস হয়ে গেলে খুব ভাল চা করতে পারবে।

সে কথায় কোন সাড়া না দিয়ে কাপ প্লেট নিয়ে কমলা চলে গেল। যেতে যেতে বললে, তা হলে চান করে এস। যা হয়ে উঠবে তাই দিয়ে খেতে হবে কিন্তু। রিণীও ফিরেছে শেষ রাতে। হয়ত একটু আগে বা পরে জ্যোতিষবাবুর সাথে। একই জায়গায় ওরা সমবেত হয়েছিল, কিন্তু কে কোন পথে তাও পরস্পরের অজ্ঞাত। শুধু রিণী ছিল যাতায়াতে জ্যোতিষবাবুর সাথে মেয়েছেলে বলে।

পার্টি বেআইনী। পার্টির নাম মুখে আনা যায় না। অথচ পার্টির গোপন নির্দেশে কাজ করে যেতে হয়। পার্টির স্থানীয় শাখার যারা কর্মকর্তা তাদের বলা হয় একটিভিটি গ্রুপ সংক্ষেপে এ. জি.। তাঁরাও যখন পার্টি নীতির আলোচনায় ও পরিকল্পনায় মিলিত হন তখন অত্যন্ত গোপনেই তা করেন। যারা পার্টির সভ্য বা হবু সভ্য তারাই শুধু এইসব মিটিং এ সমবেত হন। এই গোপনতার ফলে সাধারণ কর্মীরা জানেও না কে পার্টির সভ্য আর কে নয়। তারা জানে কেষ্টদা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে একটা কর্মসূচী স্থির করেন, এবং সবাই মিলে তা রূপায়িত করে। আসলে পার্টির নীতি ও নির্দেশ অনুসারে পার্টি স্তরে যে পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় তাই কেষ্টদা সকলের মুখ দিয়ে সমর্থন করিয়ে নেন। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে কেউ হয়ত আছে শত্রুর গুপ্তচর, কেউ হয়ত দুর্বলচিত্ত, অযোগ্য, স্বার্থপর। এদের থেকে সতর্ক থাকার জন্যই এই গোপনতা। নতুবা সমগ্র পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে যেতে পারে।

কাল রাতে এই এ. জি.-র একটা জরুরী সভা বসেছিল। কোথায় সভা বসেছিল তা কেউ জানে না। যাদের ডাকা হয়েছিল তাদের বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন স্থানে রাত আটটা থেকে রাত দশটার মধ্যে উপস্থিত বলা হয়েছিল। সেখানে কোন একটা লোক একটা গোপন সাংকেতিক চিহ্ন দেখিয়ে ওদের সাথে করে নিয়ে যাবে। রাত ১১টা থেকে সভা বসার কথা। কিন্তু সুবীরের পেঁছাতে হয়েছিল রাত দুটো। তখন সভার প্রায় সব কাজ শেষ।

বিশেষ অনুমতি পেয়ে সুবীর যখন সেই গোপন আড্ডায় সমবেত হ'ল তখন তার পরিচিত বলে শুধু দেখল রিণী জ্যোতিষবাবু ও কেষ্টদাকে। এইরূপ সভায় ইতিপূর্বে দু'বার আসার সৌভাগ্য হয়েছে সুবীরের। এখানে সে দেখেছে প্রতিবারই

কিছু পুরানো মুখের প্রস্থান আর নূতন মুখের আগমন। এ নিয়ে কোন কৌতুহল প্রকাশের নিয়ম নেই। শুধু জ্যোতিষবাবু ও কেষ্টবাবুই যা সবদিন থাকেন।

বিনা ভূমিকায় কেষ্টবাবু বললেন, আজ আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। এই সময় তুমি এসে হাজির হয়েছ। পার্টির কর্মসূচী ও নির্দেশ যথাসময়ে তুমি জানতে পারবে। আজকের আলোচ্যসূচীর মধ্যে তোমাকে সদস্যপদ দানের বিষয় ছিল। তোমার কাজকর্মের গোপন রিপোর্ট, পার্টির তত্ত্বশিক্ষা শিবিরে তোমার আচরণ ও যোগ্যতার রিপোর্ট সবই বিচার বিবেচনা করে দেখা হয়েছে এবং তাতে তুমি সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সভ্যপদ লাভের যোগ্য হয়েছ। কিন্তু আজ তোমার অনুপস্থিতির জন্য তোমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমরা স্থগিত রেখেছিলাম। তারপর উপস্থিত অন্যান্যদের লক্ষ্য করে বললেন, এখন সুবীর যখন উপস্থিত হয়েছে তখন ওর সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কোন কাজ অমীমাংসিত ফেলে রাখা আমাদের নীতি-বিরুদ্ধ। আপনারা আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করুন।

সকলেই চুপ। সুবীরকে চমকে দিয়ে কথা বললে রিণী। বীরুদার বিরুদ্ধে কোন বিরূপ প্রতিবেদন না থাকলেও তার আজকের আচরণের জন্যই তাকে পার্টির সভ্যপদ দেওয়া সমীচীন তো নয়, বরং তার শাস্তিবিধান করা কর্তব্য।

কি রকম শাস্তির সুপারিশ তুমি কর ?

তাকে সাধারণ কর্মী হিসাবে আর ও পাঁচ বছর কাজ করতে হবে এবং একটিভিটি গ্রুপ এর অধিবেশনে আহূত হবার বিশেষ সম্মান থেকেও তাকে বঞ্চিত করা উচিত।

আপনাদের কি অভিমত ? কেষ্টবাবু অন্যান্যদের মতামত জানতে চান। সকলেই নিরুত্তর। এক মিনিট উত্তরের অপেক্ষায় থেকে কেষ্টবাবুই আবার বলেন, অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া সমস্ত সভ্য সমাজের রীতি। আমরা তার কথা না শুনে তার সম্পর্কে কোন রায় দিতে পারি না, তা সে যত বড় গুরুতর অপরাধই হোক না কেন। বল সুবীর, যেখানে তোমার এগারটায় পৌঁছাবার কথা, সেখানে তুমি দু'টোয় পৌঁছালে কেন ? পার্টির নিয়মশৃংখলার কথা তোমার অজানা নয়। তুমি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী। তথাপি তোমার তরফে কোন গাফিলতি থাকলে তোমাকে তার শাস্তি নিতেই হবে। আমাদের লোক কি যথাসময়ে তোমাকে আনতে যায় নি ?

গিয়েছিল। তার সঙ্গে আসছিলুম। জিয়লতলার ভিতর দিয়ে আসতে আসতে দেখি একটা বাড়ীতে আগুন লেগে গেছে। লোকজন দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। আমি দৌড়ে গিয়ে ওদের শৃংখলাবদ্ধ করে জল দিয়ে সব নিভিয়ে

দিয়ে আসছি। অযথা কোথাও বিলম্ব করি নি। বরং যখনই দেখলাম আর বিপদ নেই তখনই কেটে পড়েছি।

কোন হতাহত হয়েছে কি ?

কয়েকখানা খড়ের ঘর ও পলের গাদা পুড়ে গেছে। জিনিষপত্র ক্ষতি হয়েছে। লোকজনের কোন ক্ষতি হয়নি।

হুঁ, তা তোমার কি মনে হয়নি যে সময়মত মিটিং এ না যেতে পারা তোমার কত বড় অন্যায় হবে। কোন অজুহাতেই তুমি পার্টির কাজ ও নির্দেশ অবহেলা করতে পার না।

সুবীর মাথা নত করে বসে রইল।

কেষ্টবাবু তাগিদ দিলেন। বল, তোমার জবাব শোনার জন্য আমরা বসে আছি। আমাদের হাতে আর নষ্ট করার মত সময় নেই। কেষ্টবাবু ঘড়ি দেখলেন।

সুবীর বলতে লাগল, সত্যি কথা বলতে কি আগুনটা দেখে মিটিং এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কে যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে গেছে। এবং যতক্ষণ না আগুন আয়ত্বে। এসেছে ততক্ষণ খেয়াল হতেই ছুটে চলে এসেছি। আগুনটা আয়ত্বে না আনতে পারলে গোটা পাড়াটাই শেষ হয়ে যেত। সবই তো ঘনবসতি আর খড়ের চাল। আমার হয়ত অন্যায় হয়েছে, তবে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে কাজ ও নির্দেশ অবহেলা করিনি।

সুবীর থামলে কেষ্টবাবু আবার সকলের মতামত চাইলেন। পূর্বের মত সকলেই নীরব। পার্টি শৃংখলা ভাঙলে শাস্তিই একমমাত্র বিধান। এর আবার বলার কি আছে।

জ্যোতিষবাবু ধীরে ধীরে বললেন, সুবীর যে বিশেষ পরিস্থিতে পড়ে আজ সময়মত আসতে পারেনি সেটা মনে রেখে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। কেষ্টবাবুই বলে দিন। আমরা তাঁর কথা মেনে নেব।

কেষ্টবাবু বললেন, তবে শুনুন, আমরা পার্টি করেছি মানুষের কল্যাণ করার জন্য। পার্টির জন্যই পার্টি নয়, মানুষের কল্যাণের জন্যই পার্টি। আর সেই কল্যাণ কর্মের প্রেরণায় যদি কেউ বিশেষ পরিস্থিতে পার্টি নির্দেশ যথাসময়ে পালন করতে না পারে তবে সে জন্য তাকে দোষ দেওয়া চলে না। সুবীরকে আমরা আজকের ক্ষেত্রে নিন্দা না করে বরং প্রশংসা করতে পারি। সে আজ থেকে পার্টি সভ্যপদ লাভ করুক এবং ঐ জিয়লতলা অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মী হিসাবে আগামীকাল থেকেই নিযুক্ত হোক। রিণী কি বলো? রিণীই কঠোর মন্তব্য

করেছিল। তাই বোধ হয় কেষ্টবাবু এই সিদ্ধান্তে তার সমর্থন চাইলেন সবার আগে।

রিণী বললে আপনার সিদ্ধান্তের উপর আর কারো কথা বলার অধিকার থাকতে পারে না। যার যা বলার তা আগেই বলা উচিৎ। আপনার সিদ্ধান্ত আমরা সবাই মেনে নেব জ্যাঠামশায় বলেছেন। আমিও মেনে নিচ্ছি। তবে নিয়ম শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এই শিথিলতার রন্ধ্রপথে একদিন পার্টির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে না ওঠে এই আশংকা। বীরুদার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ কারো, নেই, তবে সবাই বীরুদার মত অপকট নিষ্ঠাবান কর্মী হবে এমন আশা না করাই বাস্তবসম্মত বিধেয় নতুবা ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরকেই আহ্বান করা হবে বলে আমার ধারণা।

কেষ্টবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। বললেন তাত্ত্বিক বিচারে তোমার যুক্তিধর্মী মননশীলতাকে আমি অস্বীকার করছি না রিণী। তবে আমার কাছে সেই যে বলে সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই, বলেই হঠাৎ উঠে পড়লেন। আমরা সকলেই আমাদের গন্তব্যস্থল জানি। সকলেই অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ করে যাবেন—এই আমার আবেদন। সাফল্যের দ্বারে আমাদের পেঁছিতেই হবে। ইনক্লাব—জিন্দাবাদ।

গোটা দৃশ্যটাই বার বার মনের দরজায় এসে আছড়ে পড়ছে সুবীরের। কিছুতেই তাকে ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। সুবীরের জয় হল। নিন্দার পরিবর্তে সে প্রশংসাই পেল তার কাজে।

অথচ এই প্রশংসায় তার মন ভরে উঠল না। একটা অস্থির অভিমান ওর সমস্ত সত্তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টায় ক্লান্ত দেহমনকে টেনে টেনে নিয়ে যান চলেছে ও নিতান্ত নিঃসঙ্গ অসহায় পথিক। একটা অদৃশ্য আস্তরণ ওর লক্ষ্যকে আবৃত করে দিয়ে যেন দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কৃষক সংগঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন কর্মীরা বিভিন্ন অঞ্চলের সংগঠনের ভার নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছেন। আর মাস তিনেকের মধ্যে সংগঠনের কাজ শেষ করে ফেলার সাথে সাথে শুরু হবে বাঁধ বাঁধার কাজ। বাঁধ দিয়ে নোনাজল ঠেকিয়ে রাখতে পারলে আবাদ হবে দশ হাজার একর জমিতে। এ অঞ্চলের কৃষকের কল্যাণের সব চেয়ে বড় কাজ এটা তাই কৃষক সমিতির দৃঢ় পন, যে করেই হোক এই পরিকল্পনা রূপায়িত করতেই হবে। এদিকে জমিদার ও উঠে পড়ে লেগেছে এই বাঁধবন্দী পরিকল্পনা বানচাল করে দিতে। ইতিমধ্যে কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলে মহকুমা হাকিমকে আনিয়ে এক জনসভা ডাকিয়েছিল। বিভিন্ন গ্রামের বাঁধ্ফু

চাষীদের অনেকেরই ডাক পড়েছিল—বিশেষ করে তাদের ডাকানো হয়েছিল যারা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত—যারা বাঁধ বাঁধার পক্ষে, যারা জমিদারের কৃষক উচ্ছেদ ও জমি খাস করার নীতির বিরোধী। জমিদারের কাছারী খানা পিনা সেরে প্রেসিডেণ্ট সাহেব নায়েব মশাই প্রভৃতির সঙ্গে শলাপরামর্শ অন্তে তিনি দরবারে হাজির হয়েছেন। মাতব্বর চাষীদের ডাকা হলেও চার পাঁচ গ্রামের ছেলেবুড়ো মেয়ে পুরুষ দলে দলে এসে হাজির হয়েছে দরবারে। সকলের মনে আশা হাকিম সাহেব যখন নিজে তাদের কাছে এসেছেন তখন একটা সুবিচার হবে। জমিদারের অন্যায় অত্যাচারের কথা তারা বলতে পারবে হাকিমকে, তিনি নিশ্চয়ই ন্যায় বিচার করবেন।

কাতারে কাতারে লোক দু'ধারে দাঁড়িয়ে আছে। হাকিম সাহেব বজরা থেকে নেমে গটগট করে এগিয়ে গেলেন। পথের দু'ধারে শত শত লোক তাকে অভিবাদন জানাল। হাকিম সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। দু'পাশে দেহরক্ষী পুলিশ। পিছনে পেশকার, আর্দালী। নগন্য মানুষগুলোর প্রত্যাভিবাদন জানাতে গেলে তার অভিজাত্য কোথায় থাকে।

নির্দিষ্টস্থানে পেঁাছেই তিনি হুংকার ছাড়লেন। আমার কাছে অভিযোগ গেছে তোমরা এই কয়গ্রামের লোক মিলে নিরীহ অসহায় জেলেদের উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্র করেছ। তোমরা সন্ন্যাসীর খালে বাঁধ বাঁধলে ঐ জেলেরা নৌকা নিয়ে আর গাঙে নেমে মাছ ধরতে আসতে পারবে না। তাদের একমাত্র জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হবে। তোমরা কি ভেবেছ দেশে গবরমেণ্ট নেই, তোমরা যা ইচ্ছা তাই করবে। যারা ঐ খালে বাঁধ বাঁধতে যাবে আমি সবাইকে জেলে পুরব। আজ থেকে ঐ খালে একশ চুয়াল্লিস ধারা জারি হল।

জনতা নিস্তব্ধ। একি হলো। তারা কোথায় হাকিমের কাছে তাদের অভাব অভিযোগের কথা বলে প্রতিকার চাইবে, লোকের দুঃখ দুর্দশার কথা শুনবে হাকিম। এই কি তার নমুনা।

বৃদ্ধ জহির মোড়ল উঠে দাঁড়ালেন। হাতজোড় করে বললেন, হুজুর আমার দু'টো কথা শুনুন। তারপর আপনার যে হুকুম হয় করবেন। আট দশ বছর আগে পর্যন্ত আমরা প্রতি বছর ঐখালে বাঁধ দিয়ে চাষবাস করেছি। প্রচুর ধান ফলেছে। চাষীদের কোন অভাব অভিযোগ ছিল না। কিন্তু ইদানীং জমিদার ঐ খালে আর বাঁধ বাঁধতে দিচ্ছেন না। এই ক'বছরে খাল প্রায় নদীর মত বড় হয়ে গেছে। নোনা জলের জন্য এক চিটে ধানও আজ চাষী এত বছরের মধ্যে ঘরে তুলতে পারেনি। একবেলা ঘাসপাতা খেয়ে, না খেয়ে লোকের দিন যাচ্ছে। বাকী খাজনার দায়ে জমিদার সব জমি খাস করে নিচ্ছেন। তাই আমরা যে কোন উপায়ে

আবার ঐ খালে বাঁধ দিয়ে চাষ আবাদ করতে চাই। এতে জেলেদের আমরা কোন অসুবিধা হতে দেব না। বাঁধের ওপারে আমরা ওদের একবিঘে জমি লিখে দেব। সেখানে ওরা কুঁড়ে বেঁধে মাছ তুলতে, জাল শুকোতে পারে। ওদের নৌকা ঘাটে আমাদের নৌকার সঙ্গে থাকবে। যদি বাড়ীর ঘাটে নিয়ে যেতে চায় তাও অসুবিধা হবে না। বাঁধের উপর দিয়ে উবর দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে। আর বাঁধের এপাশে সারা বিলে ওরা ইচ্ছামত মাছ ধরবে আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না। বাঁধঘেরা বিলের মধ্যে ওরা অল্প সময়ে এবং সহজে যত মাছ ধরতে পারবে গাং এ তা কখনো পারবে না। বিলে ওদের ও কিছু জমি আছে। তাতে আবাদ ও হবে। জেলেদের অবস্থা এতে ভাল হবে। ওরাও বাঁচবে, চাষীরাও বাঁচবে।

যুক্তি অকাট্য এবং খুবই ন্যায় সঙ্গত। কাজেই তার বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই। কিন্তু হাকিম তো তাদের যুক্তি শুনতে আসেন নি। তাই তিনি প্রচণ্ড চীৎকার করে ধমক দিয়ে উঠলেন, থাম, খুব বক্তৃতা দিতে শিখেছ দেখছি। তোমার নাম কি ?

হুজুর আমার নাম জহির শেখ।

ইঙ্গিত পেয়ে পেশকার ফাইল এনে ধরেছে হাকিমের সামনে। হাকিম চীৎকার করে সব নাম পড়ে যাচ্ছেন চার পাঁচগ্রামের মাথাধরা হিন্দু মুসলমান চাষীদের নাম। জ্যোতিষ মজুমদার, জহির শেখ, দীনবন্ধু তালুকদার, হরবিলাস বাছাড় এমনি বিশ পঁচিশ জনের নাম। এদেরই নামে নালিশ গেছে।

জ্যোতিষবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মহামান্য হাকিম সাহেব, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন জেলেদের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সন্ন্যাসীর খালে বাঁধ বাঁধর সঙ্গে এই অঞ্চলের মানুষের জীবন মরণ সমস্যা জড়িত হয়ে আছে। হাজার হাজার চাষী পরিবার বিলের নোনা কাঁকড়া আর পাতিঘাস সেদ্ধ করে খাচ্ছে। জমিদারের অত্যাচার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নিরন্ন চাষীদের বাকী খাজনার দায়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সারাদিন রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রাখে, পাইক বরকন্দাজ দিয়ে তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে অবশেষে জমি ইস্তফা দিবার কাগজে টিপ দিয়ে নেয়। তাই হুজুরকে আমি সবিনয়ে জানিয়ে রাখছি, বাঁধ বাঁধতে না পারলে যখন চাষীদের বাঁচার কোন পথ নেই, তখন তখন চাষীরা ঐ খালে বাঁধ বাঁধবে তা যে কোন মূল্যেই হোক।

জ্যোতিষবাবুর দৃঢ় শান্ত কণ্ঠে হাজার হাজার চাষীর মনের সংকল্প ধ্বনিত হয়ে উঠল। সমস্ত ভয় ও সংশয় কেটে গিয়ে প্রতি মুখে ফুটে উঠেছে কঠিন প্রতিজ্ঞার ছায়া।

হাকিমের চোখ দুটো ক্রোধে ও অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি গর্জন

করে উঠলেন, কি এতবড় দুঃসাহস। শোন এই শেষবারের মত তোমাদের সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, বাঁধ বাঁধার দুঃসাহস যদি কেউ করেছ, তার সমুচিৎ প্রতিফল পাবে।

জনতা পাষাণ দৃঢ়তায় স্তব্ধ। সহসা মেয়েদের মধ্য থেকে মাঝবয়সী একজন উঠে চীৎকার করে বললে. ওরে আমার হাকিম রে। বলে না, হাকিম হল গরীবের মা বাপ। এই বুঝি তার নমুনো। বলে ভাত কাপড় দেবার কেউ না, ঝাঁটা মারার গোঁসাই। এই তোমার ন্যায় বিচের।

হাকিম আবার হুংকার দিয়ে উঠলেন, কে ও?

আমি ফুদি, ফুদন। পোঁদের মাইয়ে। লিহে নিয়ে যাও তোমার খাতায়। আর ধরে নিয়ে যাতি চাও তো চল, যাবানে আমরা গ্রাম শুদ্ধ সব। সব ঝামেলা মিটে যাক।

নায়েব পাশ থেকে বলে, পাঁচু ডাকাতের বউ।

ফুদনের কানে গেছে, বলে, কি বললি জমিদারের পা চাটা শয়তান। ডাকাত। সে কখনো ডাকাত না। তোরা তাকে ডাকাত বানায়েছিস। সে ন্যায্য কথা কয়। অন্যায় যে করে ফাঁক পালি তার মাথা ভাঙে। তাই তোরা তারে ডাকাত বানায়ে জেলে পুরিস। ডাকাত তোরা। চাষীর ঘরের ধান, তার জমি ডাকাতি করে নিচ্ছিস। এখোন এসেছিস হাকিমের সাথে ষড়যন্ত্র করে চাষীর বাঁচার পথ বন্ধ করতি। চোরে চোরে মাসতুত ভাই। চল তোরা সব। এখেনে কোন বিচের হবে না।

এই বলে দলবল নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। জনতাও ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

এই সব ঘটনা সুবীর প্রত্যক্ষ করেনি। সে ছিল তখন দূরে। তাত্ত্বিক শিক্ষার শিবিরে তিনমাস পাঠ নিচ্ছিল। ফিরে এসে সব শুনেছে। মম্মথর কাছে। আসলে সেই জেল থেকে বের হয়ে অবধি আজ পর্যন্ত সুস্থির হয়ে দুটো দিন ও কাটাবার অবসর পায়নি সুবীর। এত ব্যস্ততার মধ্যে দিনগুলো কাটছে যে দুদণ্ড রিণীর সঙ্গেও কথা বলার ফুরসৎ নেই। অবশ্য ওরই মধ্যে হয়ত সুযোগ সুবিধামত কিছু কিছু সময় বের করা যেত যদি রিণীর দিক থেকে তেমন কোন গরজ থাকত। অন্যের সান্নিধ্যে ছাড়া একবার ও তাকে কাছে আসভে দেখা যায়নি, আজ এত ক'মাসের মধ্যে। পাশ দিয়ে গেলেও অনাবশ্যক ব্যস্ততা দেখিয়ে চলে যায়। কিছু বলার অবসর থাকে না। সুবীর ওর মধ্যে তাকে এড়িয়ে চলার একটা সুস্পষ্ট স্বেচ্ছাকৃত প্রয়াস দেখতে পায়।

সুবীর কাজ করে চলেছে যন্ত্রের মত। নিরলস অবিশ্রান্ত। সংগঠনের ক্ষমতা তার অসাধারণ। পার্টির স্থানীয় কর্মীদের দুইটি স্তরে ভাগ করা হলে—যুব কর্মীদের

মধ্যে সুবীরই অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ কর্মী। পার্টির কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতৃত্ব তার যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে সদস্য করে নিয়ে তার উপর একটা অঞ্চলের সংগঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছেড়ে দিল। এতে আর কেউ কতটা খুসী বা অখুসী হ'ল সে হিসাব নিষ্প্রয়োজন। তবে রিণীর কাছে এর চেয়ে আনন্দের আর সার্থকতার বিষয় আর কিছু নেই। অথচ তার ব্যবহারে তার কোন প্রকাশ নেই। সে আশ্চর্যরকম নিস্পৃহ ও উদাসীন হয়ে আছে। বাইরে থেকে কিছুই বোঝাবার উপায় নেই। বরং রিণীই একমাত্র ব্যক্তি যে সুবীরের সদস্যপদভুক্তিতে আপত্তি করেছিল। জেল থেকে বেরোনোর পর থেকে রিণীর সুবীরকে এড়িয়ে চলা এবং তার সদস্য-ভুক্তিতে আপত্তি করা সব মিলিয়ে একটা অস্থির অস্বস্তি পাষাণভার হয়ে সুবীরের বুকে চেপে আছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। তার সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ যেন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

চা খেয়ে সুবীর এ ক'বছরের এলোমেলো ইতিহাস গুছিয়ে একটা সামঞ্জস্যের মধ্যে এনে দেখতে চাইছিল। কিন্তু সে যতই গুছিয়ে আনে, ততই যেন এলোমেলো হয়ে যায়। জড়িয়ে জটিল হয়ে ওঠে।

রিণী বাড়ীতেই আছে। বাইরের ঘরের বারান্দা থেকে দেখা যাচ্ছে। হেমন্তের সকালে শিউলী গাছটা ওর শেষ ফুলগুলো ঝরিয়ে যাচ্ছে। রিণী আর শুকচাঁদের মেয়ে রাণী ফুল কুড়োচ্ছে। রাণী বেশ বড় হয়েছে। আজকাল প্রায় এ বাড়ীতেই থাকে। রিণী ওকে লেখাপড়া শেখায়। দেখতে ভারী সুন্দর, যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ ফুল। মুখখানা একটু গোল। চোখদুটো টানা টানা। মাথার চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া। কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। জেলের ঘরের এ মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে কে জানে।

রাণীকে মালা গাঁথতে বসিয়ে দিয়ে রিণী একটা উল বোনা হাতে নিয়ে পায় পায় এগিয়ে এল। মুখে মৃদু হাসি। সুবীরের গম্ভীর শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি গো নেতা সাহেব, আজ কি ছুটি নাকি। বেশ নিশ্চিন্তে আরামকেদারায় বসে মৌজ করছেন। ব্যাপার কি!'

সুবীরের মনে হ'ল এতদিন পর শুধু বিদ্রূপ আর অপমান করার জন্যই যেন রিণী এগিয়ে এল। রিণীর কাছে তার অবশ্যই কোন দাবী নেই। কিন্তু তাকে অপমান করার অধিকারই বা তাকে কে দিল। একটা কঠিন কিছু বলতে পারত ও। কিন্তু তেমন কিছু মুখ দিয়ে বের হ'ল না। প্রত্যুত্তরে বললে, আমি তো তোমাদের পার্টির নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতে পারি নে। কাজেই জিয়লতলা ইউনিয়নের চার্জ নিয়ে আজই আমার কাজ শুরু করার কথা থাকলেও আমি আজ

আর যাব না স্থির করেছি। তা বাদে আমার এই অবহেলা পার্টি নেতাদের কাছে অজানা থাকবে না, যখন জানি তখন আর চিন্তার কিছু নেই। অনুভাষণের প্রয়োজন হবে না। পার্টিকে ফাঁকি দেবারও কোন প্রশ্ন নেই। তোমার গোপন রিপোর্টে পার্টি সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেলে নিষ্কৃতি পাই। পাটের ব্যাপারী আবার পাট কিনতে ফিরে যাই। আস্তাকুঁড়ের ধোঁয়া কখনও স্বর্গে যায় না।

ছিঃ, বৃথা আত্মধিক্কারে নিজেকে ছোট করছ কেন? তোমার নিষ্ঠা ও যোগ্যতা সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না।

তোমার তো পারে।

হলই বা। তাতে কি আসে যায়। তুমি দেশকে ভালবেসে, দেশের মানুষকে ভালবেসে, দেশের কাজ করতে নেমেছ। কোন ব্যক্তিগত সুখ স্বার্থের জন্য নিশ্চয়ই এ পথে আসনি। আজ তুমি সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে স্বীকৃত হয়ে দেশের কাজে পরিপূর্ণ ভাবে আত্মোসর্গ করলে। তোমার এখন আর স্বজন সংসার আত্মীয় পরিজন নেই—দেশের জনসাধারণ সকলেই তোমার আপনজন। তুমিও সকলের। এর চেয়ে সার্থকতা এর চেয়ে গৌরব আর কি আছে?

সুবীর রিণীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। ভাবতে চেষ্টা করলে এখনও কি সে তাকে ঠাট্টা করছে। কিন্তু তা হলে তার গলার স্বরে তা ধরা পড়ত। ধীরে ধীরে সুবীর বললে, দেশের কাজে যে নেমেছিলাম তা আজও আমি জানি না। স্কুলের বন্ধু পরীক্ষা দিল না। আমারও কি খেয়াল হল পরীক্ষা না দিয়ে উঠে এলাম। ভবঘুরের মত ঘুরছিলাম। ভিড়ে গেলাম স্বদেশীদের দলে। তারপর তো সব তুমি জান। আগাগোড়াই একটা ছন্নছাড়া জীবন। দ্বিতীয়বার এই যে নেমে পড়লাম—সে কেবল তোমার একান্ত উৎসাহ দেখে। আজ আবার তুমিই যেন টেনে ধরছ। প্রমাণ করতে চাইছ আমি পার্টি শৃংখলা মানি নে, আমি অনুপযুক্ত। আর আমারও সত্যি ভাল লাগছে না।

রিণী এবার ম্লান হাসল। বলল, সত্যি তোমাকে যদি অনুপযুক্ত প্রমাণ করতে পারতাম তবে বেঁচে যেতাম। কিন্তু তা আর পারলাম কই। অতিকষ্টে যেন ভেতরের কিছু একটা দমন করতে চাচ্ছে রিণী।

কথাগুলো হেঁয়ালীর মত লাগে সুবীরের কানে। কেন, আমাকে অকর্মণ্য প্রমাণ করে তোমার এত কি লাভ।

আমার লাভ লোকসান তুমি বুঝবে না। আদর্শনিষ্ঠ পুরুষই মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তারা চিরদিনই ধরাছোঁয়ার বাইরে। অথচ তাদের জন্যই ওরা যুগ যুগ মরেছে।

সুবীরের মনের কালো অন্ধকার মেঘের বুকে দু'দু'টো বিদ্যুৎ চমক খেলে গেল।

হঠাৎ রিণী চলে গেল। জ্যোতিষবাবু ফিরছেন। বললেন, এই যে সুবীর, উঠে পড়েছ, তা বেশ, তুমি তা হলে জিয়লতলায় যাচ্ছ কখন?

দেখি খেয়ে দেয়ে বিকেলেই চলে যাব ভাবছি।

পার তো তাই যাও। বড় কঠিন দায়িত্ব এসে পড়েছে তোমাদের উপর। বিশেষ করে তোমার উপর অনেকিছু নির্ভর করছে। বাঁধ বাঁধার কাজে হাত দিলেই মনে হয় আমাদের অনেকের উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নেমে আসবে। তখন তোমাদেরই কাজ শেষ করতে হবে।

একটু থেমে বললেন, আমাদের অনেকের নামে মহকুমা হাকিমের কাছে নালিশ গেছে। সবই বোধ হয় শুনেছ। শুধু এই ইউনিয়ন সমিতি এককভাবে বাঁধ বাঁধতে গেলে কৃতকার্য হবার সম্ভাবনা খুব কম। পাশাপাশি আট দশটা ইউনিয়নের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যাপক ও দৃঢ় ঐক্য চাই। সবারই সমর্থন প্রায় পাওয়া গেছে। জিয়লতলায় কর্মী পাঠান যায়নি। ওটা তুমি সংগঠিত করবে।

সুবীর বললে, বাঁধবন্দী কমিটিও তো এখন ও হয়নি।

না হয়নি। আগে ভাবা গিয়েছিল এই ইউনিয়নের সব গ্রামের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি হবে। এখন চিন্তা করা হয়েছে দশটি ইউনিয়নের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গড়তে হবে। সেই কমিটি স্থির করবে কি করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাঁধ চাপান দেওয়া যায়। কিভাবে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম, মাল মশলা, খাবার দাবার সংগ্রহ করা যায়, বাঁধ বাঁধা হলে তা রক্ষা করার ব্যবস্থা, জমিবন্টন, চাষ, ফসল তোলা, বাঁধ বন্দীর কর আদায়—সব বিষয়ে তারাই নীতি নির্ধারণ করবে।

সারা জেলার কৃষক সমিতির সমর্থনও তো চাই আমাদের এই সংগ্রামের পিছনে।

সে তো চাই-ই। আর তা থাকবেও। তবু লোক, অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে এগিয়ে আসবে এই দশটা ইউনিয়ন। সংগ্রামের গতিপ্রকৃতি দেখে আমরা তা প্রতিরোধের উপায় বের করবো।

তবেই তো তুমি সংগ্রামে জিতেছ, বীরুদা। বলতে বলতে চায়ের ট্রে-টা নামিয়ে রাখল রিণী। তারপর এককাপ জ্যোতিষবাবুকে আর এককাপ সুবীরের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেব গেলাসটায় চুমুক দিলে।

শত্রুকে কখনও দুর্বল ভাবতে নেই। তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ কোনদিক থেকে আসতে পারে আগে থেকে তা যে সঠিক অনুমান করে তৈরী থাকতে পারে সেই জয়ী হয়। নতুবা অতর্কিত আক্রমণে ধরাশায়ী হওয়াই স্বাভাবিক।

আমাদের সংগ্রাম তো হাতিয়ার নিয়ে নয়, ঐক্যশক্তি দিয়ে। কাজেই সেই ঐক্যকে সুদৃঢ় রাখার ব্যবস্থা করলেই অতো ভাবার কি আছে।

খুব সত্যি কথা। তবে শত্রু সেই ঐক্যে কোন পথে ফাটল ধরাতে পারে তা বুঝে সতর্ক থাকতে হবে না? যেমন ধরো, ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ, তপশিলী ও বর্ণহিন্দু, ধনী নির্ধন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ব্যক্তিগত স্বার্থ সুখ লাভের মোহ, ভীতি প্রদর্শন—যখন যেটা দরকার সুবিধামত ওরা কাজে লাগিয়ে সেই ঐক্যে ফাটল ধরাতে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। ধনিক ও অভিজাত শ্রেনীর এটা সনাতন কৌশল।

আমার তো মনে হয় কৃষককে যদি আমরা বোঝাতে পারি, তাদের আসল স্বার্থ কি ভাবে রক্ষা পাবে তা যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি তবে নিশ্চয়ই তারা আমাদের সঙ্গে থাকবে।

সেই বিশ্বাস নিয়েই তো আমরা কাজ করি। তাদের আপাতস্বার্থ এবং বৃহত্তর স্বার্থ যার সঙ্গে তাদের জীবনমরণ সমস্যা জড়িত তাই নিয়েই তো আমরা লড়ছি। তথাপি যারা দুর্বলচিত্ত ভীরু বা নিতান্ত স্বার্থপর লোভী তারা বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেই। যুগে যুগে তাই ওরা করে এসেছে।

প্রথম থেকেই সব দায়িত্বশীল কর্মীই যদি সতর্ক থাকে তবেই এই চোরা বিপদকে সহজেই রোখা যাবে। প্রতিটি কর্মীর উপর, প্রতিটি লোকের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখতে, বিশেষ করে তাদের যাদের উপর এক একটা ইউনিয়ন সংগঠনের ভার থাকবে, যেমন তুমি একজন। রিণী বললে।

সুবীর একটু ইতস্ততঃ করে বলে, কিন্তু ব্যাপার কি হয় জানো, মানুষকে একই সঙ্গে বিশ্বাস আর অবিশ্বাস করা কি করে সম্ভব হবে? আর মানুষকে অবিশ্বাস করে কখনও গণ-ঐক্য গড়ে তোলা যায় না।

তুমি একটু ভুল করছ, বীরুদা। মানুষকে তো বিশ্বাস করতেই হবে, ভাল-বাসতে হবে, নৈলে মানুষ তোমাকে বিশ্বাস করবে কেন। তবে ঐ যে বলে, সরল হ'য়ো কিন্তু বোকা হয়ো না। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মানুষ চিনে কাজ করতে পারা চাই।

তুমি যা বললে তা শুনতে বেশ ভাল। তবে যারা জমিদারের টাকা খেয়ে আত্মগোপন করে দলের মধ্যে মিশে থাকবে তাদের চেনা নিশ্চয়ই সহজ হবে না।

গোটা কর্মীসংঘকে সব সময় সতর্ক রাখলে দেখবে ঐ সব আগাছাগুলো অল্প দিনেই দূর হয়ে যাবে।

জ্যোতিষবাবু বললেন, দেখ মানুষের গভীর বিশ্বাস নিয়ে আমরা কাজে নেমেছি।

গণচেতনা জেগেছে, জয় আমাদের নিশ্চিত। বেশী কিছু ভাবনা চিন্তার দরকার নেই। দরকার এখন শুধু কাজের। অবিশ্রান্ত কাজ করে যাও। হাতে সময় বেশী নেই অথচ কাজ অনেক। বাঁধ এবার বাঁধতেই হবে। ফসল ফলাতেই হবে। কোন বাধাতেই আমরা টলব না।

রিণী বললে, জেঠু আমি তেল নিয়ে আসছি। তোমরা আজ সকাল সকাল চান খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নাও। বীরুদা তো আবার চলে যাবে। তবে তোমাকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে, বীরুদা। একদিন বিশ্রাম বোধ হয় তোমার দরকার।

না রিণী। আমি আজই যাব। বিশ্রামের অবসর নেই। বিশ্রাম করব এই বিলের ফসল ঘরে তুলে তারপর।

॥ ১৬ ॥

আজ রবিবার। ছুটি। রিণীর স্কুলেরও আজ ছুটি। রবিবারটা মানবার ইচ্ছা রিণীর ছিল না। কিন্তু একটা দিন তো মানতে হবে। রবিবার না মানলে বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার মানতে হয়। বৃহস্পতিবার—লক্ষ্মীবার—হিন্দুদের অনেক বাড়ীতে লক্ষ্মীপুজো হয় ঐ দিন। ঐ দিনটা ছুটি রাখা যেতে পারে। কিন্তু তা হলে শুক্রবার—জুম্মাবার—সব মুসলমানরা ঐ দিন নমাজ পড়তে যায় মসজিদে। সে দিনও তা হলে বন্ধ রাখতে হয়। তার চেয়ে হিন্দু মুসলমান কারো ধর্মাচারের সংগে সংশ্লিষ্ট নয় যে বার সেই রবিবারই ভাল। খৃষ্টান? সে আর ক'জন এদেশে। তাদের খুসী করার জন্য ঐ দিন ছুটি দেওয়া হল এ কথা কেউ ভাববে না। তা ছাড়া কোর্ট কাছারী সবই যখন ঐ দিন ছুটি থাকে তখন রবিবারে ছুটি হলে সারা দেশের সংগে একটা সামঞ্জস্যও থাকে।

আসলে বারটা তো বড় কথা নয়। বড় কথা একটা দিন ছুটি। নিয়মিত কাজকর্মের বিরতি। জীবনে এটার যে কত প্রয়োজন তা রিণী আগে কোনদিন ভেবে দেখেনি। এই তিন চার মাস স্কুল করতে গিয়ে যে জিনিষটা সব চেয়ে বেশী তার নজরে পড়েছে তা হল এই সাপ্তাহিক ছুটির একান্ত প্রয়োজনীয়তা। সাহেবরাই এর আবিষ্কারক। আমাদের দেশে এমন কোন নিয়মিত সাপ্তাহিক বিরামের রেওয়াজ ছিল না।

রিণীর মাঝে মাঝে সাহেবদের উপর শ্রদ্ধা এসে যায়। ওদের অনেক গুণ আছে, অনেক ভাল অভ্যাস আছে ওদের চরিত্রে। বিলাত ভ্রমণ বলে একটা বই পড়ে এই

শ্রদ্ধাটা যেন বেড়ে গেছে। কিন্তু এই শয়তানগুলো না পারে এমন কাজ নেই। মিথ্যা, জাল, জুয়াচুরি, ষড়যন্ত্র, নৃশংস হত্যা—সব কিছুই ওরা নির্বিচারে করে চলবে নিজের স্বার্থে, নিজের দেশের স্বার্থে। সেই পলাশীর যুদ্ধ থেকে সুরু করে এ পর্যন্ত এই ওদের এদেশে কার্যকলাপের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। অথচ ওরা যে আজ পৃথিবীর সম্রাট সে তো আর এমনি এমনি হয়নি। এর পেছনে যে আত্মত্যাগ, যে সাহসিকতা ও চারিত্রিক গুণ দরকার সেগুলোর জন্য শ্রদ্ধা না পোষণ করার কোন হেতু নেই।

ছুটিটা অবশ্য যে শুয়ে বসে কাটাবার জন্য তা ঠিক নয়। ছুটির প্রয়োজন নিয়মিত কর্মধারার পরিবর্তনের জন্য। নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে যে একঘেয়েমি, তাকে সরিয়ে দিয়ে একটু বৈচিত্র্য আনার জন্য। কাজের কারখানা ঘরের বাইরে একবার খোলা মাঠের বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে। এ মাঠে তুমি ছুটোছুটি করে খেলে গায়ের ঘাম ঝরাতে পার, আবার ঘাসের উপর শুয়ে শুয়ে আকাশের অগুণতি তারা গুণতেও পার। এখানে আলো বাতাস, আকাশ আর দিগন্তের দাক্ষিণ্যে তোমার চেতনার মূলে ভিটামিন যোগাবে। কর্মজীবনের মালিন্যের পোকা-মাকড় ধ্বংস করে জীবনকে সজীব সবুজ ও ফলদায়ী করে তুলবে।

রিণীর উপর ভার পড়েছে শিক্ষা সংস্কৃতিমূলক কাজের। একটার জায়গায় গ্রামের তিনকোণে তিনটে প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাঝে একটা বড় এম. ই. স্কুল শীঘ্রই হাইস্কুলে পরিণত হবে। সেই ভাবে কাজ চলছে! পার্টি কিছু কিছু উপরের দিকের শিক্ষক দিয়েছে। নীচের দিকে স্থানীয় কর্মীদের কাউকে কাউকে লাগান হয়েছে। রিণী এরই একটাতে যায় পড়াতে। এটার সময় আটটা থেকে এগারটা। দুপুরের পর পাড়ার মেয়েদের অক্ষর-পরিচয় করানো, হাতের কাজ শেখানো। বিকালে ছেলেমেয়েদের একটু নাচ গান এবং রাত্রে মাঝে মাঝে অভিনয়ের মহড়া।

ছোট ছোট পালা যা এক দেড় ঘণ্টায় অভিনীত হবে, যার জন্য স্টেজ করতে খরচা নেই, পাড়া থেকে দু'চার খানা ধুতি শাড়ী যোগাড় করে টাঙিয়ে দিলেই হল। গানের জন্য একটা হারমোনিয়াম ও ডুগি-তবলা একজোড়া থাকে ভাল, না থাকে সমবেত কণ্ঠে মেঠো সুরে গাইলেই চলবে। পোষাক-আশাকের মধ্যে একটু সাদা কালো ক্রেপ গোপ দাড়ি করার জন্য, একটু কালি, চকখড়ি, সম্ভব হলে একটু পিউডার সবেদা, ব্যস্। কেউ সাজবে জমিদার, নায়েব গোমস্তা বা পাইক বরকন্দাজ, কেউ গাঁয়ের মোড়ল মুন্সী সাহেব, আচার্যি বামুন, কেউ চাষী, জেলে, দারোগা, পুলিশ, বড়জোর ডাকাত লেঠেল পর্যন্ত। নাটক সব দেশাত্মবোধক। যাতে দেখান হবে

শ্রমিক কৃষকের ঐক্য, পুলিশ জমিদারের অত্যাচার। সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ, সংগ্রাম আর ঐক্যের জয়। লেখক হবে হাইস্কুলের হেডমাষ্টার সরোজ দত্ত বা সেকেণ্ড মাষ্টার গোপাল বোস।

শিগগীর একটা পালা নামবে দুর্ভিক্ষের উপর। কালোবাজারী মজুতদার কিভাবে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছে, রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছে। একদিকে লঙ্গরখানা। নর্দমা থেকে কুকুর বেড়ালের সাথে দু'একটা খাদ্যকণা খুটছে মানুষ। না খেয়ে কংকালসার মানুষগুলো গ্রামেগঞ্জে সহরের পথে পথে মরছে, ওদিকে জমিদারের বাগানবাড়ীতে ফূর্তির হল্লা ছুটছে। নায়েবের ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে আছে সেই সব কালোবাজারী ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, জোতদার, থানার দারোগা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট। নাটক দেখার পর আর বলে দিতে হবে না — লাখ লাখ মানুষের দুর্ভিক্ষে মরার জন্য কারা দায়ী।

পার্টির ছেলেগুলো সব ছড়িয়ে পড়েছে পাশাপাশি দশটা ইউনিয়নে সংগঠনের কাজে। প্রতিটি ইউনিয়নে সুশৃংখল সমিতি গড়ে তুলতে হবে আর তাদেরই মাধ্যমে যোগাড় করতে হবে বাঁধ বাঁধার সামগ্রী এবং সংহত জনশক্তি। বাঁধ শুধু এই একটা বিলেই দিলে কাজ শেষ হবে না। দিতে হবে আরও পাঁচ দশটা বিলে। আর এই একটা বিলেও শুধু একজায়গায় বাঁধ দিলে চলবে না। ছোটখাট আরও দু'পাঁচটা খাল নালার মুখে বাঁধন দিতে হবে। তৈরী করতে হবে ভেড়ী বাঁধ খালের পাঁড় উঁচু করে। যারা বাঁধ বাঁধার কাজে কয়েকমাস ধরে খাটবে তাদের খাওয়াতে হবে, খাওয়াতে হবে তাদের পরিবারকে। যে সব বড় বড় চাষীর ঘরে কিছু ধান চাল আছে, তাদের কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে, নারকেল আছে সে তাই দেবে। সকলকেই যথাশক্তি দিয়ে এই সংগ্রাম সফল করে তুলতে হবে।

রিণীর তাই আজকাল ছেলেগুলোর সংগে বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ হয় না। সুবীর ও অনেকদিন বাড়ী ঘরে আসে নি। প্রথম কদিন রিণীর কোন কাজই ছিল না। হঠাৎ কেষ্টবাবু এসে কাজ দিয়ে গেলেন। এ পাড়ায় একটা নোতুন প্রাইমারী স্কুল চালাতে হবে। মাঝপাড়ার সম্প্রসারিত এম. ই. স্কুলটাতে আরো একটা ক্লাস খুলে দিতে হবে। মাষ্টার কে হবে না হবে সব ঠিক। এক সপ্তাহের মধ্যে তারা এসে কাজে যোগ দেবে। এইসব শিক্ষকেরা অবসর সময় জ্যোতিষবাবুর নির্দেশে এই গ্রাম বা এই ইউনিয়নে কাজ করবেন আর গড়ে তুলবেন একটা সাংস্কৃতিক ফ্রণ্ট। যে ফ্রণ্টে একট মুখ্য ভুমিকা নিতে হবে রিণীকে। ব্যস্ এই পর্যন্ত। এর পরে কর্মসূচী ও তার রূপায়ণের ব্যবস্থা রিণীকেই করে নিতে হয়েছে জ্যেঠামশাই আর সরোজবাবু গোপালবাবু আর বিষ্টুবাবুর সাহায্যে।

কিন্তু রিণীর এ সব করতে ভাল লাগে না। পড়াতে গেলে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ছেলেমেয়েগুলো এত হাবা। কিছু শিখতে পারে না। বললে বুঝতে পারে না মনে রাখতে পারে না। হাঁপিয়ে ওঠে রিণী। অবসন্ন হয়ে পড়ে। তখন ছুটির কথাটা বড় বেশী করে মনে হয়। নাটকের মহড়া দেওয়া, মেয়েদের সেলাই ফোড়াই শিল্প কাজ—কোনটাতেই রিণীর ধৈর্য কুলায় না। অন্যে এগুলো করুক সুষ্ঠভাবে সুন্দর করে তা সে চায়। দেখলে খুশী হয়। কিন্তু নিজে এগুলো শিক্ষা দেবে সে ধৈর্য ওর নেই।

অথচ সভাসমিতির ব্যবস্থাপনা করা, কোন কাজের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করা এবং নৈতৃত্ব দিয়ে সুষ্ঠু পরিচালনার মাধ্যমে তা রূপায়িত করা—এ সব কাজে রিণী ক্লান্তি বোধ করে না। যে কাজের মধ্যে মানুষের সৃজনী শক্তি ক্রিয়াশীল হতে পারে না, সে কাজ নেহাত কর্তব্য-বোধে করতে হলেও মানুষকে সহজেই ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তোলে। আসলে প্রতিটি মানুষেরই মধ্যে বিধাতার সৃষ্ট শক্তি বর্তমান আছে। ক্ষেত্র বিশেষে সেই শক্তির বিকাশ ও স্ফূর্তি ঘটে। যেখানে তা ঘটতে পায় সেখানে মানুষ সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। আকাশের আনন্দ আর বাতাসের মধু তাকে অজর অমর করে তোলে। আর যেখানে তা নেই সেখানেই তার মৃত্যু। সে মৃত্যু আসে প্রতি মুহূর্তে ক্লান্তি আর অবসাদ রূপে।

কাল সন্ধ্যায় পুকুর ঘাটের বাঁধানো বেঞ্চিতে বসে ভাবছিল রিণী। সে তো মেয়েছেলে। আর শিক্ষা সংস্কৃতির কাজ তো মেয়েদেরই কাজ। তাদের দ্বারাই ভালভাবে হওয়া উচিত। উন্নত-দেশে প্রাথমিক শিক্ষার কাজে বরং পুরুষদের দেখা পাওয়াই ভার। শিক্ষা শিল্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবীও তো মেয়েছেলে—মা সরস্বতী, তবে তার কেন এদিকে ঝোঁক নেই।

পাশে বসে ছিল রাণী। রাণী আজকাল রিণীর প্রায় সর্বক্ষণের সংগী। প্রায়ই এ বাড়ীতে খেয়ে নেয়া শুকদেব আর তার স্ত্রীকে বলে দিয়েছে রাণী আমার কাছেই থাকবে। তোমরা কিছু বলতে পারবে না।

এই সময় ও ছিল বলেই, দিনগুলো রিণীর কাটছে। নৈলে কি করে যে ও কাটাত ভাবতেই শিউরে ওঠে। তবু একটা অসহ্য নিঃসঙ্গতা ওকে মাঝে মাঝে পাগল করে তোলে। ও তখন রাণীর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুপ করে পড়ে থাকে।

ঘাটের দুপাশ দিয়ে পাড় বরাবর সারিসারি বাসকের গুচ্ছ আর পূব পশ্চিম দক্ষিণ পাড়ে সুপারী নারিকেল গাছের শ্রেণী। চাঁদের আলো ঐ জলে, ঐ বাসক, নারিকেল, সুপারী পাতার ভাঁজে ভাঁজে এসে পড়ে এক মোহময় মায়াজাল বিস্তার

করেছে। ওদেরই মত জোছনায় মাখামাখি হয়ে বসে ছিল ওরা। সামনে আলু বেগুনের ক্ষেত একপাশে লংকা। তারই ওপাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ভদ্রা নদী। এমনি জোছনা রাতে ভরা জোয়ারে নৌকা ছেড়ে দিয়ে হাল ধরে বসে মাঝি গান ধরে— বিরহের গান ভাটিয়ালী। কোন এক বোকা বক মাছের লোভে ব্যাধের ফাঁদে পা দিয়ে অকালে মারা পড়ল। তার বিরহী বিধবা বকী ঘুরে ঘুরে আকাশ ফাটিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছে যুগ যুগ ধরে নিরন্তর, অবিরাম।

ও বাড়ীতে থিয়েটারের রিহার্সাল দিচ্ছে সরোজ মাস্টার। গানও একটা জুড়ে দিয়েছে ঃ

মোদের গেরামে আজ পুলিশ হামলা করত্যাছে
ওরা জমিদার নায়েবের ঘুস খাইয়ে চাষীর গেরাস মারত্যাছে।
দ্যাশের চাচা ঈশাক মিয়া মানুষ ছিল ভাল
খাজনার দায়ে নায়েব তারে পিটায়ে মাইরে দ্যালো
নাবালক তার ছ্যামড়া ছেমড়ী ক্ষিদার জ্বালায়
পথে পথে কাঁদত্যাছে।

জোছনার আলো রাণীর চোখে মুখে বুকে এসে পড়েছে। অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে। রিণীর বড় মায়া হয়। এমন চোখ মুখ ঠোঁটটা লাল চকচক করছে। ভুরু দু'টি যেন তুলি দিয়ে আঁকা নিখুঁত। গাল দু'টো একটু ফোলা ফোলা। লেখাপড়া কাজকর্মেও বেশ বুদ্ধি আছে। জেলের ঘরে এই মেয়ে কেন জন্মালো।

প্রায় সব জায়গায় একই অবস্থা এই জেলেদের ঘর বাড়ী নেই। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কুঁড়ে। চারিদিকে আসটে গন্ধ। ভিজে জাল মেলে দেওয়া আছে। মেয়েরা জাল বুনছে। পুরুষেরা গেছে গামানে, না হয় গঞ্জে মাছ বিকতে। দৈনিক পাঁচ দশটাকা আয় করে অনেকেই। কিন্তু হলে কি হবে। ওতেও পেটের ভাত জোটে না ভাল করে। জাল দড়ির খরচ নৌকো ভাড়া মহাজনের সুদ এইসব দিয়ে থুয়ে ভাত ছাড়া আর কিছু জোটে না।

অবশ্য ওরই মধ্যে শুকদেবের অবস্থা একটু ভাল। তার কারণ সে জাতব্যবসায়ের উপর বড় নির্ভর করে নেই। রিণীর বাবার সংগে কাঁচা তরকারীর ব্যবসা করে। যে ক'দিন বাইরে হাটে গঞ্জে না যেতে হয়। তখন জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যার জাতব্যবসায়ের সংগে চাষবাস আছে তারই একটু অবস্থা ভাল। তবে তেমন জেলের সংখ্যা খুবই কম। তেমন বাড়ীর কোন ছেলে আবার শুকদেবের বাড়ী মেয়ে নিতে আসবে কিনা সন্দেহ, তা বাদে লেখাপড়ার রেওয়াজ ওদের মধ্যে নেই বললেই চলে। এদিকে রাণী রিণীর সাথে থেকে থেকে বেশ খানিকটা লেখা পড়া শিখে

ফেলেছে। পরিষ্কার শাড়ী পরে, ব্লাউজ গায় দেয়, সায়া পরে, মাথায় সাবান দেয়, যা ওদের পাড়ার কোন মেয়েছেলে ইতিপূর্বে কখনও করে নি। অবশ্য ইদানীং সব ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা ওরাই করবে।

আজ এই মোহময় জোছনায় বসে বসে রাণীর জন্যে রিণীর বড় কষ্ট হচ্ছিল। ও কল্পনা করছিল এই রাণী একদিন হাটু পর্যন্ত ময়লা কালো শাড়ী পরে আদুড় গায়ে সেচনী জাল নিয়ে কাদায় জলে বিলে নেমে গেছে মাছ ধরতে। জলে পচে সমস্ত হাতে পায়ে ধরেছে হাজা। কতদিন চুলে একরত্তি তেল পড়েনি। ধুলো ময়লায় জট পাকিয়ে উঠেছে। গায়ের রং রোদে পুড়ে হয়েছে তামাটে। সর্বাঙ্গে আসটে দুর্গন্ধ। অনাহারে অর্ধাহারে বুকের হাড় বেরিয়ে গেছে। গাল গেছে তবড়ে।

এই রাণীর সংগে যেন ওর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একদিন। রিণী শিউরে উঠে রাণীকে জড়িয়ে ধরলে।

রাণী বললে, কি হয়েছে দিদি? তুমি এমন চমকে উঠলে কেন?

না, কিছু না। তুই আমার কোলে আয়। ওকে তুলে সামনে কোলের মধ্যে বসিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিলে। যেন ওখান থেকে ও তাকে কাউকে নিয়ে যেতে দেবে না।

কতক্ষণ যে এমনি আচ্ছন্ন হয়ে বসে ছিল তার হুঁশ নেই। চোখ দিয়ে নিশব্দে জল গড়িয়ে গেছে। ভয়ে রাণীও আর কিছু বলেনি। চুপ করে ওর বুকে মুখ গুঁজে পড়ে ছিল।

রিহার্সেল শেষ হয়ে গেছে। কলবর করতে করতে ওরা ফিরে যাচ্ছে। ওদেরই কলরবে যেন স্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে উঠল রিণী। বললে, অনেক রাত হয়ে গেছে। চল রাণী, আজ আর বাড়ী যেতে হবে না। আমার সাথেই থাকবি।

রাণী জানে কাল সকালে তাদের অনেক কাজ। সে কাজ সুরু হবে ভোর থেকে। আজ ঠিকরী কলাই চাকে ভেঙ্গে গামলায় করে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়েছে। কাল ভোরে উঠে ওগুলো বেতের ধামায় করে পুকুর থেকে ধুয়ে আনতে হবে। এদিকে পাকা চালকুমড়ো দু'ফালি করে বিচি বের করে ঝিনুক দিয়ে কুরে কুরে রাখতে হবে। তারপর ঐ ভিজে ডাল আর কুমড়ো ঢেঁকিতে কোটা হবে। এই কোটা পর্যন্ত সাহায্য মিলবে ছোটকাকীর। তারপরের কাজ গামলায় করে সেই ঢেঁকি কোটা কলাইয়ের আটা ফেনান। ফেনিয়ে দেবে কমলা। ডুমুরের পাতা ভেঙ্গে এনে, খেচুর পাতার পাটী বিছিয়ে তার উপর ডুমুর পাতায় বড়ি কেটে দিতে হবে। এ কাজটুকু সম্পূর্ণ রিণী আর রাণীর। অবশ্য তার আগে কুমড়ো চোরা, ডাল ধোয়ার

কাজেও তাদের সাহায্য করতে হবে। বড়ি দেওয়া, কাসুন্দি তোলা, কুল, আম, আনারসের আচার তৈরী করা—এইসব খাবার তৈরীর কাজে রিণীর খুব উৎসাহ।

ফেটানো কলাই কুমড়োর আটা হাতে নিয়ে তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে বড়ি কেটে কেটে যাচ্ছে রিণী। প্রতিটি বড়ি যেন ছাচে তৈরী এই রকম দেখতে। এক একটা ডুমুর পাতায় চার পাঁচটা করে বড়ী দেওয়া হচ্ছে। ঘণ্টা দুই তিন পরে আধাশুকনো হয়ে এলে পাতা থেকে বড়িগুলো সাবধানে তুলে পাটীর উপর এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে যাতে তলার নরম জায়গায় রোদ লেগে গোটা বড়িটা শুকিয়ে যায়।

বড়ি দেবার দিন সবচেয়ে ভয় হ'ল বৃষ্টি না আসে। পাড়ার কোন কোন বৌরা ডাল ভিজালেই পরদিন বৃষ্টি নামবে। বড়ি তারা শুকাতে পারবে না। হালদার বাড়ীর বড় বউ ঐ রকম। ও নাকি রাশি হিসাবে হয়।

কে জানে? রাণী জিজ্ঞাসা করেছিল কেন কারো কারো বড়ি দেবার বেলায় বৃষ্টি হবে। এর তো সত্যিই কোন কারণ থাকতে পারে না।

কে বলেছে কারণ থাকতে পারে না? বিনা কারণে কিছু হয় না। তবে আমরা হয়ত সে কারণটা সব সময় বুঝতে পারি না। তিথি-নক্ষত্র ধরে তো কেউ ডাল ভিজায় না। এমন সময় হয়তো ডাল ভিজালো যখন না ভিজালেও বৃষ্টি হ'ত। আর এমনি যদি কারো বেলায় কোনক্রমে পর পর দু'বছর বৃষ্টি হয়ে গেল তবে তো আর কথাই নেই। আসলে এত সহজে তো কোনকারণ বের করা যায় না। অত ধৈর্য আমাদের নেই। আমরা একটা মনগড়া ব্যাখ্যা করে নিতে পারলেই খুসী।

সুনয়নী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ফ্যানে ভাত নামাচ্ছেন আর প্রয়োজনীয় উপদেশ দিচ্ছেন। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা হয়ে গেল। এখনও বড়ি দিয়ে উঠতে প্রায় এক দেড় ঘণ্টা লেগে যাবে।

সুনয়নী ডাকছেন, তোরা হাত ধুয়ে খেয়ে যা। আমি আর কতবেলা ভাত নিয়ে বসে থাকবো।

কাজ করতে করতে উঠে এস, হাত ধোও, আবার খাও, আবার হাতে মাখ। ওদের কারো সেটা ইচ্ছা নয়, যদিও ক্ষিধে পাচ্ছে। কাজ একটা শেষ করে তোলার মধ্যে যে তৃপ্তি, তা অনেক সময় খাওয়ার তৃপ্তির চেয়ে কম নয়, বরং ক্ষেত্র-বিশেষে অনেক বেশী।

রাণী বললে, তুমি আমাদের তিনজনের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে চলে যাও। আমরা খেয়ে ধুয়ে এঁটো ভেঙ্গে সব গুছিয়ে রাখবো 'খন। তোমার সে ভাবনা নেই।

বুড়ীর তাতে ঠিক মন ওঠে না। সকাল বেলার এই রান্নাবান্নার ব্যাপারটার সংগে রান্না ঘরের ভিতরের কোন সম্পর্ক নেই। বারান্দার এক কোনে এর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। বুড়ী বারমাস সকালে উঠে বাসী কাপড় ছেড়ে নিজেই এর ব্যবস্থা করেন এবং সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে সকড়ী ভেঙ্গে চানদান করে ঠাকুর প্রণাম সেরে তবে জলগ্রহণ করেন।

রাণীর প্রস্তাবে বুড়ীর মন সায় দেয় না। এইসব এটোঁকাঁটার ব্যাপারে এইসব ছেলেমেয়েদের কোন মান বিচার নেই। যা তা করে চলে যাবে। বুড়ীর গা ঘিন ঘিন করে।

সুনয়নী বলেন, থাক, আর আমার অত উপকার করে কাজ নেই। তার চাইতে বরং তাড়াতাড়ি সেরে এস।

রিণী আব্দার ধরে, তুমি একটু এখানে এসে বসনা ঠাকুমা। আসল উদ্দেশ্য অন্যত্র। বড়ি দেবার দিন উপরি লাভ কাচা বড়ি ডুবো তেলে বা ঘি-এ ভেজে খাওয়া। রিণীর এটা খুব প্রিয় জিনিষ। শুধু রিণী কেন সব ছেলেমেয়েরই প্রিয়। কিন্তু কাকীমা খ্যাক খ্যাক করে। কিছুতেই করতে চায় না। করলেও দু'চারটার বেশী নয়। ওতে নাকি খুব তেল খরচা হয়। এখন বুড়িকে দিয়ে যত বেশী কাচা আটা মঞ্জুর করিয়ে বড়ি ভাজার জন্য তুলে রাখা যায় ততই লাভ। বুড়ীর অনুমোদন থাকলে কাকীমা ট্যাফু করতে পারবে না। সবটাই ভেজে দিতে হবে। কি মজা !

আমি আবার কি জন্যে যাব ? সুনয়নী কৃত্রিম বিরক্তি প্রকাশ করেন।

তা আসবে কেন ? তোমাদের বুড়োবুড়ীদের ঐ তো দোষ। কত রকমের জিনিস আগেকার বুড়োবুড়ীরা জানত, তা এমন স্বার্থপর, কাউকে শিখিয়ে দিয়ে যায় নি। কালে কালে সেই সব বিদ্যে লোপ পেয়ে গেল। তুমি কেমন সুন্দর করে নানা রকমের খাবার তৈরী করতে পার—পিঠে, আচার, নিরামিষ রান্না, কাঁথায় নক্সা তোলা—কিছুই শিখিয়ে দিয়ে গেলে না।

ব্যাজস্তুতি আর কি ? কিন্তু ঔষধ ধরল। সুনয়নী সস্নেহ ক্রোধে বললেন, শিখে নেবার আগ্রহ থাকা চাই তো ? বলে গুরু মেলে লাখ লাখ, শিষ্য মেলে না এক। তোদের কতদিন বললাম কথায় ফুলগুলো তোলা শিখে নে। তা বসতেই চাসনি। আমি মরে গেলে ও পাট এ বাড়ী থেকে উঠে যাবে। কম্বল কিনে গায় দিদি আর কি।

তা আমাকে বলছ কেন ? আমি শিখে কি করব। তোমার ঐ নাতনীকে শিখিয়ে দাও না ? বলে কমলার দিকে দেখাল।

তোরা সব সমান ! আমার আর দেখতে বাকী নেই। বলে কিনা কিসের এপিঠ ও পিঠ। নোংরা কথাটা আর উচ্চারণ করেন না।

বেশ তো, আমরা তো ঐ রকম খারাপ। তা এই মেয়েটাকে একটু দেখিয়ে দাও না। এই রাণীটাকে। ওটা খুব ভাল মেয়ে। তুমি যাই বলো না কেন।

তুই যা জানিস তাই দেনা শিখিয়ে। আমি আবার উঠলে এখানে কাক চিল এসে দেবে সব এঁটো কাটা ছড়িয়ে একাকার করে।

না করবে না। তুমি এস দিকি। আমরা এখান থেকে দেখছি।

উঠোনের একপাশে ওরা আড্ডা গেড়েছে। যেদিকে এখনও ছায়া আছে কিন্তু শিগগিরই রোদ এসে যাবে। রান্নাঘরের দাওয়া থেকে দূরে নয়।

কই এস, ও ঠাকুমা, রিণী আবার তাড়া দিল। তোমার এত গুণ থাকতে আমরা যদি কিছু শিখে না নিতে পারি তাতে তোমারই তো অগৌরব। তুমি যাই বল না কেন, তুমি যখন থাকবে না লোকে বলবে বুড়ি শিখিয়ে দিয়ে যায় নি।

সুনয়নী দাওয়া থেকে নামলেন। আসলে তোষামোদে কাজ হল। তোষামোদে কে না গলে ? দেবতারা পর্যন্ত গলে যান—স্তবস্তুতি স্তোত্র—সবই তো ঐ তোষামোদ, নৈবেদ্য হল ভেট। সেদিন দেবতা, রাজা, পুরোহিত এই তিন শ্রেণীর কাছ থেকে লোকে পাওয়ার আশা করত, তাই এদের তারা তোষামোদ করে, ভেট দিয়ে খুশী করার চেষ্টা করত। আজ প্রাপ্তি আসে রাজনৈতিক নেতা আর সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে—তাই তাদের লোকে তোষামোদ করে, ভেট দেয়।

সুনয়নী এসেই বললেন, এই তো বেশ হচ্ছে। সুন্দর হচ্ছে। রাণীর কোন কোনটা একটু ছোট বড় হয়ে যাচ্ছে, হাতটা আর একটু নরম করে—হাতের মধ্যে আটাটা ঘুরিয়ে নিতে হয়। তারপর এই—এমনি করে বড়ি কেটে বসিয়ে দিতে হয়। ঐ রিণীকে দেখ না, ভাল করে।

আচ্ছা সে না হয় দেখবে, ঠাকুমা। ওটা আমি শিখিয়ে দেব। এখন তুমি বল দিকি আর কত রকমের বড়ি তুমি করতে পার। কোনটায় কি কি মশলা লাগে ? আর সেই যে তোমার জিলিপি বড়ি—অমৃতি—কি হালকা, ভেজে রসে ভিজিয়ে দিলে টৈটুম্বুর হয়ে যায়। মুখের মধ্যে দিতে না দিতেই গলে যায়। আবার কারো কারো বড়ির মধ্যে রসই ঢোকে না। ভেতরটায় কেমন যেন গন্ধ, মুখে দিলে বমি আসে।

আসলে ডাল আর কুমড়ো, কচু বা যা দিয়ে বড়ি হবে তা খুব ভাল করে কুটে বা বেটে নিতে হবে যাতে তার মধ্যে কোন আঁশ না থাকে। তারপর অনেকক্ষণ ধরে খুব ভাল করে ফেটাতে হবে। ফেটাতে ফেটাতে যখন সাদা হয়ে যাবে এবং ওর

মধ্যে মোটেই আঠা থাকবে না তখন বড়ি কাটতে হবে। আটাটা একটু জল দিয়ে পাতলা করে— কাপড় ফুটো করে বা নারকেল মালা ফুটো করে—জিলিপি বড়ি দিলেই হল। হাতটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে যেমন ইচ্ছা নক্সা করে দাও। মশলা যত না দেওয়া যায় তত ভাল। কালজিরা আদা—এইসব মশলা দিতে পার। এর বেশী অন্য মশলা আমি কখনও দিইনি।

ও ঠাকুমা দেখ, দেখ। ধেই ধেই—কালো খেকি কুকুরটা রান্নাঘরের দাওয়ায় উঠে পড়েছিল আর কি।

সুনয়নী ছুটে গেলেন। এখনি হয়েছিল আর। ন'টা বেজে গেছে। বড়ি দেওয়া প্রায় শেষ। সুনয়নী আবার তাড়া লাগালেন। দেখ দেখি কত বেলা হয়ে গেল। শিয়াল কুকুর তাড়িয়ে আমি আর পারব না। তোরা যা ইচ্ছে করগে যা।

রিণী তো এই রকম একটা সুযোগই চাইছিল। বললে, ঠিক আছে ঠাকুমা। সত্যি বড় বেলা হয়ে গেল। এই আমরা উঠে পড়েছি। তুমি বরং আর এইটুকু আটা আছে, কাকীমাকে ভেজে দিতে বলো, বলেই আটার গামলাটা রান্নাঘরের দাওয়ায় তুলে দিয়ে বললে, এটা ঘরে তুলে রাখ। আমরা এক্ষুনি হাত ধুয়ে আসছি। এই রাণী এক মিনিটেই হাত মুখ ধুয়ে আসনে বসতে হবে। রেডি হও।

সকাল থেকেই জ্যোতিষবাবু কোথায় গেছেন। সকালে চা-টাও খাওয়া হয়নি। আজকাল ওর এমনিই চলছে। যখন তখন হুটহাট কোথায় কোনদিকে চলে যাচ্ছেন। কখন যে ফিরছেন তার কোন ঠিকানা নেই। সময় মত চান খাওয়া বিশ্রাম কোনটাই হচ্ছে না। পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে বাঁধবন্দীর মিটিং করে বেড়াচ্ছেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লোকজন কোথা থেকে কি ভাবে পাওয়া যাবে তার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা। অথচ প্রকাশ্যে বিশেষ কিছু করা চলছে না তার। কোর্টে মুচলেকা দিয়ে এসেছেন। না দিলে গ্রেপ্তার এড়ানো যেত না। তার মত মাতব্বর শ্রেণীর লোক ক'জন আটকা পড়ে থাকতে কাজই এগোতে পারত না।

রিণীর বড় কষ্ট হয় জ্যেঠার জন্যে! এই একটা লোক যার জন্যে এক বুড়ো মা ছাড়া বিশ্বসংসারে কেউ ভাববার নেই! ভাইরেয়া সবাই মান্যগণ্য করে। কিন্তু তার সুখ সুবিধা কে দেখে—সেবা যত্ন কে করে? রিণীই সেখানে একমাত্র ভরসা—জ্যেঠামশায়ের অন্ধের যষ্ঠি। আজ বাড়ী এলে বেশ বকতে হবে। বয়েস হয়েছে—এমনি করলে ক'দিন বাঁচবেন। শরীরে কুলাবে কেন? ডাক্তারী প্রায় উঠেই গেছে। ঔষধ নিতে এসে অনেকে ফিরে যায়। সকালে না থাকে রিণী, না থাকেন জ্যোতিষবাবু নিজে। বিকেল ও সন্ধ্যেতে ও থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। এইভাবে চিকিৎসা করাও চলে না। আর রোগীও বা কতক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারে।

মা, রিণীমা।

ওমা, এযে কেষ্টকাকু গো। জান ঠাম্মা কেষ্টকাকু এসেছেন। বলতে বলতে রিণী ছুটে বাইরে গেল।

কাঁধে ঝোলা, গায়ে খদ্দরের হাতকাটা পাঞ্জাবী, পরনে খাট খদ্দরের কাপড়। দীর্ঘ দেহ, উন্নত ললাট, মুখে মৃদু হাসি। পায়ে অর্ধেক ক্ষয়ে যাওয়া চটি।

রিণী গিয়ে প্রণাম করল। বললে, মাগো এমনি করে যদি দেশের কাজ করতে হয় ত সে আমার দ্বারা হবে না। নিজের লোকদের কথা ভাবার অবসর নেই, দেশের লোকের কথা ভেবে বেড়াতে হবে। যে মহাপুরুষ পারে তাকে নমস্কার। অমন মহাপুরুষ যেন সবাই না হয়।

যারা নিজের লোকের কথা ভাবে না—নিজের পরিবার, আপনজন প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব - তারা অপরের জন্যেও ভাবে না।

তাই বুঝি এতদিন পরে মনে পড়ল।

কে বললে? সব সময় তো তোমাদের কথা মনে পড়ছে। কেন, তোমাদের মনে পড়ে না আমার কথা? এতদিন পর আজ বুঝি দেখে মনে পড়ল।

আমাদের মনে পড়লেই বা কি, আর না পড়লেই বা কি। আকাশের জ্যোতিষ্কের কথা ভেবে তো লাভ নেই। সে তো ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মিথ্যে উপমা ব্যবহার অন্যায়। গলার হার পায়ে, আর পায়ের মল গলায় দিলে যেমন অন্যায় করা হয়। সে থাক, ঘাট মানছি। আসতে ক'দিন দেরী হয়েছে বলে কি এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুলো পায়ে বিদায় হতে হবে?

ওমা, আমি কি গো? আপনি একটু বসুন, কাকু। আমি এক্ষুনি চা করে আনছি।

উহুঁ, শুধু চা তে হবে না। টা কিছু চাই। না পেটের মধ্যে ছুঁচোর বৈঠক শুরু হয়ে গেছে।

ততক্ষণে রিণী ছুটে চলে গেছে। মিনিট পনেরো পরে চা মুড়ি তেলেভাজা এনে হাজির। ইতিমধ্যে জ্যোতিষবাবু ফিরেছেন এবং জেলেদের নিয়ে আলোচনায় বসে গেছেন।

কেষ্টবাবু মুখ ফিরিয়ে চাইলেন যার অর্থ আমি একা খাব। দাদার কই?

রিণী কোন কথা না বলে আবার ছুটে গেল এবং তৎক্ষনাৎ আর এক গেলাস চা, মুড়ি, তেলেভাজা নিয়ে এল।

জ্যোতিষবাবু বললেন আমার জন্যে কি সব তৈরী করেই রেখেছিলি।

রিণী হাসল। তারপর অভিযোগ পেশ করল কেষ্টবাবুর কাছে, জানেন কাকু,

সকালে কিছু না মুখে দিয়েই এমনি হুটহাট কোনদিন কোথায় বেরিয়ে পড়ে, কখন ফিরবে তরে ঠিক নেই। এমনি করলে কি শরীর থাকবে, আপনি বলুন। আমি এদিকে ছটফট করে মরি। আমার হয়েছে যত জ্বালা।

কেষ্টবাবু খুব গম্ভীরভাবে বললেন, এতো ভয়ানক অন্যায় করছেন দাদা। গুরুতর অন্যায়। এর জন্যে আপনার শাস্তি নিতেই হবে। এখন থেকে যেখানেই যান মাকে বলে, মা যা দেন খেয়ে তবে যাবেন।

ব্যাপার কি জানেন অনেক সময় ভোর ভোর উঠে না গেলে লোকের দেখা পাওয়া যায় না। কে কোথায় কাজকর্মে বেরিয়ে পড়ে।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্। শরীর না টিকলে তো দেশের কাজ করা যাবে না। আপনার বয়স হয়েছে। শরীরের দিকে নজর দিয়ে চলতেই হবে।

এই বাঁধটা হয়ে গেলে তখন যথেষ্ট বিশ্রাম করা যাবে। এটা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোন দিকে নজর দেওয়া যাচ্ছে না।

আপনি কি ভাবছেন এখনও বাঁধ হবে না। বাঁধ তো হয়েই গেছে ধরে নিন। এখন চাপান দেওয়া বাকী।

ঐ চাপানটাই তো আসল। আর সেখানেই একশ চুয়াল্লিস। জেলেরা একটা মামলাও আনবে।

দেখা যাক জেলেদের বুঝিয়ে আনা যায় কিনা।

অসম্ভব। ঐ কালাচাঁদটা কিছুতেই ভিড়বে না। জমিদারের নায়েবের সঙ্গে ওর দল।

তা হোক, আজ হয়ত আসবে না। তবে একদিন নিশ্চয়ই আসবে। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর কিছু লোকও যদি ভেগে আমাদের পক্ষে আসে সেটাই আমাদের বড় লাভ।

রিণী তামাক সেজে নিয়ে এল। জ্যোতিষবাবু বললেন পয়লা থেকেই লাগিয়ে দিচ্ছি। সেই ব্যবস্থাই পাকা করে এলাম। এর মধ্যে বাঁধবন্দী কমিটিটা করে নিতে হবে।

কমিটি করার জন্য জনসভা ডাকার দরকার নেই। বাইরে কোন প্রচারেরও প্রয়োজন নেই। ক্যাডারদের খবর দিয়েছেন আগামী সোমবার দশটা ইউনিয়নের প্রত্যেক গ্রাম থেকে ৫ জন করে মাতব্বর সঙ্গে নিয়ে যেন তারা চলে আসে—বেলা তিনটের সময় হাইস্কুলের মাঠে। সেই মিটিং এ বাঁধবন্দী কমিটি হবে এবং কোনু গ্রামকে কি কি জিনিস, কত লোক দিতে হবে তার পাকা লিস্ট তৈরী করে দেওয়া হবে।

চলুন আর দেরী করা ঠিক নয়।

আবার এখন কোথায় চললে জেঠু।

জেলেপাড়ায় মিটিং আছে। ওরা একটা মিটিং-এ বসে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে।

কখন ফিরবে ?

না, খুব দেরী হবে না। ঘণ্ঠা দুই লাগতে পারে।

একটা নীরব কর্মযজ্ঞ চলেছে দশখানা ইউনিয়ন জুড়ে। কোন সরব প্রচার নেই। বড় বড় সভা সমিতি নেই, বাইরে থেকে তেমন কোন চাঞ্চল্য বোঝবার উপায় নেই। অথচ শত শত মানুষ যার যার নির্দিষ্ট কাজ করে চলেছে। কখন একা, কখন ছোট ছোট দলে।

বাঁধবন্দী কমিটি গঠিত হয়েছে। তার মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধিরা আছেন। নেই কেবল সমিতির সর্বক্ষণের কর্মীরা। জহির মোড়ল আর জ্যোতিষ-বাবুর মত মাতব্বরেরা, যাদের নামে নোটীশ ঝুলছে, সদরে গিয়ে যারা মুচলেকা দিয়ে এসেছেন গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্যে। তবু প্রকৃতপক্ষে তারই সব কাজ পরিচালনা করছেন।

বাঁধ নির্মাণের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ চীফ ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন কাশেমানি। স্থানীয় ভাষায় বলে 'সানা'। সানাই নোটা বাঁধের প্রাণকেন্দ্র। তাঁরই নির্দেশে বাঁধ বাঁধার সমস্ত কাজ পরিচালিত হবে। যে খাল বা নদীর উপর বাঁধ হবে তার অবস্থা বিবেচনা করে তিনিই ঠিক করবেন কি ধরণের বাঁধ হবে—খিলান বাঁধ, সাগর বাঁধ না কি প্রকারের বাঁধ। বাঁধের কাজ কোন দিক থেকে কি ভাবে সুরু হবে। নদী বা খালপাড়ের জমির উপর ভেড়ী বাঁধ কত হাত দূরে, কতটা প্রশস্ত ও উঁচু হবে। বড় নদীর স্রোত যেখানে এসে সরাসরি আঘাত করবে সেখানে ডবল বাঁধ দিতে হবে কিনা, বিলের জল নিকাশ বা বিলে জল প্রবেশের জন্য ক'টি বাক্স্ কল অর্থাৎ দেশী স্লুচ গেট কোথায় বসাতে হবে—সবই সানার নির্দেশে হবে। এখানে গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্র 'সানা' নির্বাচনের বেলায়। নির্বাচিত সানার নির্দেশ পালন করতে হবে, সেনাপতির আদেশ যেমন পালন করে তার অধীনস্থ সৈনিকেরা। এ সব ব্যাপারে সানার উপর কোন 'যদি' 'কিন্তু' নেই। ও'র কথাই শেষ কথা।

সানার নির্দেশ মত এক এক দল কেটে কেটে নৌকা করে নিয়ে আসছে ওড়া গাছ, কেওড়ার ঝোপ, নানাগাছের ডালপালা, হরগোজার ঝড়। এনে স্তূপাকার করে করে রাখছে।

আর কয়েকটা দল সংগ্রহ করে আনছে বাঁশ, খুঁটি, ধানের পল, ঘাস, খড়।

লাল লাল বিষাক্ত মাঁজালি পোকা, জান মাছি, বেড়ে পোকা, ডাঁশ কামড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দিচ্ছে সারা শরীর। হরগোজার কাটা লেগে লেগে হাত পা দিয়ে রক্ত ঝরছে দরদর করে। তবু ভ্রুক্ষেপ নেই কারো।

বাঁশ আর ডালপালাগুলো ফুটো করে কত মাঁজালি যে বাসা বেঁধেছিল ওর মধ্যে তার সীমাসংখ্যা নেই। ও গুলো নৌকাতে বোঝাই দেবার সময় যেমন কামড়েছে নামানোর সময়ও তেমনি কামড়াচ্ছে। কামড়াচ্ছে বেড়ে পোঁকা, ডাঁশ। টিপে টিপে দুচারটা মেরে দিচ্ছে কেউ কেউ। কত আর মারবে। মারতে গেলে তো কাজ এগোবে না। জ্বালা করছে। করুক জ্বালা! ফুলে উঠেছে! এরপর চুলকাবে ঘা হয়ে যাবে কোথাও কোথাও।

তা হোক। সে কথা ভাবলে চলবে না। বরং জ্বালাটা ভুলতে ওরই মধ্যে কেউ কেউ ফোড়ন কাটছে। একটা ডাঁশ কামড়াচ্ছে জোব্বারের বাঁ হাতে। ডান হাত দিয়ে ঠাস করে এক চড় মেরে ওর মাথাটা টিপে ঘিলু বের করে দিয়ে বললে ওর কাজের সাথীকে পাচুদা, শালা নায়েবের মাথাটাকে দিলাম ছাতু করে।

পাঁচু বললে একটা মাঁজালি ধরে তার মুণ্ডটা ছিড়তে ছিড়তে, আর আমি ঐ শয়তানটার মুণ্ডুটা দিলাম ওর ধড় থেকে নামিয়ে। ঐ শয়তানগুলো শেষ পর্যন্ত না পেরে এই ক্ষুদে চরগুলোকে পাঠিয়েছে।

রহমান, কালিপদ, মজিদ, সনাতন ওদিকে মাঁজালির কামড়ের জ্বালা ভুলতে খুক খুক করে হাসছে আর যেখানে যেখানে কামড়েছে সেখানে সেখানে হাত ঘসছে ও থুথু দিচ্ছে। মুখের অমৃত, তাতে অনেক বিষ কাটে।

কয়েকটা দল গেছে গ্রাম থেকে চিড়ে গুড় সংগ্রহ করতে। পঞ্চাশটা ছেলে গেছে দশ খানা নৌকা নিয়ে তিনশ' ডে-লাইট সংগ্রহ করতে। পাশাপাশি থানার বিভিন্ন গ্রাম গঞ্জ থেকেও সংগ্রহ করতে হবে। অবশ্য কোথায় কোথায় কার কার কাছে যাওয়া যাবে তা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে তালিকা করাই আছে। আজ শুধু সংগ্রহ করে আনা। যারা ডে-লাইট দেবেন তারা তেল ভর্তি করেই দেবেন। এতগুলো ডে-লাইটের জন্য পৃথক তেল সংগ্রহের ঝামেলা যাতে না থাকে।

এ সব কাজের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে দল গড়ে দেওয়া হয়েছে। এক এক দলের নেতা এক এক জন সর্বক্ষণের কর্মী। লাইট যারা আনতে গেছে তারাই লাইট জ্বালবে, রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কাজ সেরে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। এই দলের নেতা পুলিন। কাঁঠাল গাছের শুড়ির উপর বসে বিড়ি টানছে। এখন ওর কোন কাজ নেই। কাজের মধ্যে প্রতীক্ষা করে থাকা ওর দলের প্রতিটি ইউনিটের পঞ্চম ব্যক্তি কখন এসে সংবাদ দেবে সব লাইট পাওয়া গেল কিনা। না পাওয়া

গেলে বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে। তার জন্য কিছু তেল সংগ্রহ করা আছে, আর আছে ছেড়া নেকড়া, দড়ি আর লাঠি। ঐ লাঠির মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে কেরোসিন ঢেলে আলো জ্বালাতে হবে। যেখানে অল্প আলোতেও কাজ চলবে, সেই সব জায়গার দিতে হবে সেই মশাল বসিয়ে।

পুলিনের দায়িত্ব খুবই কঠিন। সারারাত কাজ হবে—আলো না থাকলে সব আয়োজন ব্যর্থ। আলোর অভাবে কাজ ব্যাহত বা বিঘ্নিত হলে গোটা পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে। কে বলবে ঐ বিড়ি খাওয়া লোকটা আজ এক মাস ঘুমায়নি। লাইট ও তেলের খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরেছে প্রায় পঞ্চাশ খানা গ্রামে। এখনও প্রচণ্ড উদ্বেগ নিয়ে বসে আছে যুদ্ধকালীন সেনাপতির মত।

আলোকবাহিনীর অধিনায়ক কোমরে গামছা বাঁধা ব্রিগেডিয়ার পুলিন হালদারের দুটো চোখের দূরবীণ বিড়িটানার ফাঁকে ফাঁকে। না বসাকের আমবাগানের ছায়ার যে সেনাবাহিনী কাজ করছে, তার সহঅধিনায়িকার আশপাশে ঘুরে আসছে। এই বাহিনীতে গ্রামের সমর্থ মেয়েরা সব জুটেছে। দুপুরের পর থেকে সারারাত্রি কাজ চলবে। রাত একটায় সার ভাটি—তখনই বাঁধ চাপান দিতে হবে। খাওয়ার অবসর নেই। তবু পেটে কিছু না থাকলে মাটি টানা যাবে না। তাই ব্যবস্থা হয়েছে চিড়ে গুড়ের। নারকেলের মালা কেটে দু মালা করে চিড়ে ঢেলে দিতে হবে প্রত্যেকের গামছার আচলে। আর এক খামচা গুড় একটা পাতায়। গামছাশুদ্ধ নদীর জলে ভিজিয়ে সেটা খাওয়া হলে দিতে হবে খাবার জল। নদীর নোনা জল খাওয়া যাবে না। মিষ্টি জল চাই। অবশ্য পানীয় জল দেবার কাজ সব সময় চলেছে, পানীয় জল আনা এবং দেওয়া। মাটীর কলসী, পিতলের ঘড়া ভর্তি করে গ্রামের পাতকুয়ো বা নলকুপের জল এনে ভর্তি করছে বড় বড় মাটীর জালা। টিনের গ্লাসে সেই জল ভর্তি হয়ে বিতরিত হচ্ছে কর্মীদের মাঝে।

বিড়ি টানতে টানতে তেষ্ঠা পয়ে পুলিনের। ও হাক দেয়, দিদি একটু জল খাওয়াতে পার।

রিণী বলে, আয় না, খেয়ে যা এখান থেকে।

জান বড় ক্লান্তি লাগছে, ঘুম পাচ্ছে।

সে কি রে হতভাগা! আজ কি তোর ঘুম পায়। কাল বাঁধ বাঁধা হয়ে গেলে তারপর থেকে ঘুমানোর ছুটি দশ দিন। উঠে বাঁধের ওখান থেকে একবার ঘুরে আয়। দেখে আয় কি ভাবে কাজ হচ্ছে। মেয়েদের কাছে এসে গাছের ডালে হেলান দিয়ে শুয়ে থাকলে তো ঘুম পাবেই।

না দিদি, এখান থেকে এখন নড়া চলবে না। আমার এখনো অর্ধেক নৌকায়

খবর আসে নি। ইতিমধ্যে কেউ কোন খারাপ খবর নিয়ে এসে যদি আমাকে তৎক্ষণাৎ না পায় তবে মুস্কিল হবে যাবে। ভীড়ের মাঝে খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।

রিণী হাসে। বলে বুঝতে পারছি। রাণীর চাক ছেড়ে শ্রমিক আর এখন নড়বে না। তা হলে জল নিয়ে যাচ্ছি কি আর করবো।

পুলিন ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, মাফ করো দিদি, ঘাট মানছি। তোমাকে কষ্ট করে জল এনে খাওয়াতে হবে না। তার চেয়ে আমি কোন বাড়ী থেকে গিয়ে খেয়ে আসব।

কারো বাড়ী গিয়ে খেতে হবে কেন। আমরা তবে এত কষ্ট করে জল বয়ে আনছি কেন?

না। সবাই তো জল বওয়ার কাজে ব্যস্ত। আমাকে জল দিতে গেলে ওদের কাজে ছেদ পড়বে। একটা লাইন কেটে যাবে।

রিণী হেসে ফেলে বলে, দুর্জনের ছলের অভাব হয় না। তা সোজা কথা বললি হয়, রাণীকে দিয়ে এক গেলাস জল আর পারতো সেই সংগে দুটো চিড়ে আর একটু গুড় পাঠিয়ে দাও।

মাইরী দিদি, তোমার পায়ের ধুলো এক খাবলা দাও না, আগে চেটে চেটে খেয়ে নি। তোমার মত দিদি থাকলে বছরে সাত সাতটা বাঁধ বাঁধবে এই একা পুলিন।

রিণী কপট ক্রোধে ওকে শাসন করে বলে খুব বাঁদর হয়ে গেছ কিছুদিন বাইরে থেকে। মুখে আর আগল নেই। খবরদার বিন্দুমাত্র অসভ্যতা দেখেছি কি পিটিয়ে তোমার হাড় গুড়ো করে দেব। তারপর রাণীকে হাক দিয়ে বললে, যা তো পুলিনকে চুপিচুপি দুটো চিড়ে, একটু গুড় দিয়ে আয়, আর এক গেলাস জল।

রাণী দাঁড়িয়েছিল। একটা সময় ছাড়া খাবার জল দিতে হবে, কিন্তু জলখাবার নয়। স্বয়ং সর্বাধিনায়ক সানা কাসেম আলি চাইলেও নয়। অবশ্য রাজার রাজা কেষ্টবাবু যদি চান। না তিনি চাইবেন না। মরে গেলেও না।

এই শিক্ষা যিনি দিয়ে এসেছেন তিনিই কিনা নিয়ম ভাঙ্গতে বলছেন, এমন সময় যখন যুদ্ধকালীন কঠিন নিয়মশৃংখলা সকলেরই মেনে চলার কথা।

কি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, যা।

এখন খাবার দেব? একটা ভীরু চাহনি চেয়ে রাণী জিজ্ঞেস করে।

রিণী বিরক্ত হয়ে ওঠে। হ্যারে হ্যা, তুই কি কালা। শুনতে পাচ্ছিস নে।

কেউ যদি কিছু বলে?

এবার রিণী একটু ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। দ্যাখ রাণী তুই দিন দিন বড় ডেপো হয়ে উঠছিস। দিচ্ছে কে, দিচ্ছি তো আমি। আমার হুকুমে তুই দিয়ে আসবি। কোন জবাবদিহি করতে হলে আমি করব। তোর কি?

রাণী এবার মুখ নীচু করে আদেশ পালন করতে চলে যায়। ওর দিকে তাকিয়ে রিণীর অনুশোচনা হয়। বেচারার উপর ওর রাগ করা নিতান্তই ছেলেমানুষী হয়েছে। আইনের উপরেও একটা আইন আছে। যা সকলকে বোঝানো যায় না। বোঝানো উচিৎ নয়, সত্যও সত্য, মিথ্যাও সত্য, সবই সত্য। বেদের এই চরম বাণী সকলের জন্য নয়। এখানে অধিকারী ভেদ মানতেই হবে। নতুবা ধর্ম সমাজ তিনদিনেই রসাতলে যাবে।

পুলিনের আজ খাওয়া হয় নি। অত্যন্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যপরায়ণ ছেলে ও। বেচারার মুখখানা শুকিয়ে গেছে। অথচ একটু জল ছাড়া সাহস করে খাবার চাইতে পারে নি।

রাণী কাছে এলে পুলিন বললে, আমি তো শুধু জল চেয়েছি। চিড়া আনলে কেন ?

দিদি দিতে বলেছে। বেশী কথা বলো না। চুপি চুপি খেয়ে নাও। নৈলে দিদি রাগ করবে। আমাকে ভীষণ বকেছে।

তাই বুঝি ? আর তুমি ? তুমি বুঝি খুসী হবে না খেলে ?

জানি নে। · বলে রাণী মুখ ফিরিয়ে চলতে লাগল।

শোন। জল দিলে কই ? ভিজাবো কি দিয়ে।

আর ভিজাতে হবে না। শুকনো শুকনো মেরে দাও। আমি খাবার জল আনছি।

চিড়া চিবাতে চিবাতে পুলিন ভাবছিল। ভাবছিল রিণীর কথা। তাই তো তোমার কথায় আমরা উঠি বসি। সবার পূরণ করেন যিনি তারই মুখে বিধির বানী। পুলিনের চোখ দুটো জলে ভিজে এল।

বাঁধের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। শত শত লোক খোন্তা কোদাল নিয়ে মাটীর চাক উল্টে দিচ্ছে। আর একদিন সেগুলো টেনে টেনে ফেলছে বাঁধের উপর। খোন্তার আছাড়ে বাঁধা আছে ঘুঙুর। কোপের তালে তালে ঝুমুর ঝুমুর বাজছে। মাটীর চাক ফেলে এসে কোন কোন যুবক বা আধাবয়সী কর্মী সাথীর হাত ধরে ঐ ঘুঙুরের তালে তালে এক পাক নেচে নিয়ে চট করে উপুড় হয়ে তার এক চাক তুলে নিয়ে ছুট দিচ্ছে বাঁধের দিকে। সময় নষ্ট করার উপায় নেই। ছুটে ছুটে কাজ করতে হবে। তবু তারই মাঝে মনটাকে ফুর্তিতে সজীব রাখা চাই। পরিশ্রমটাকে তা হলে তেমন পরিশ্রম বলে মনে হবে না।

খালটা যতটা চওড়া বাঁধের তলাটাও ততটা চওড়া হয়েছে। মই ধরে বাঁশের

খাচা নামিয়ে দিয়ে সুরু হয়েছে মাটী ফেলা বাঁশের কঞ্চি, গাছের ডালপালা, হরগোজা, কেওড়ার ঝাড়, পল, খড়—এ সবের একটা স্তর—পলখা ঝোপঝাড়। এমনি করে বাঁধ উঁচু হয়ে চলেছে।

ওদিকে কয়েকটা দল তৈরী করে চলেছে গোল পাতার হাইত। বিশ পঁচিশ হাত জায়গায় গোলপাতা পরপর বিছিয়ে তার উপর চাপচাপ মাটী আর পল ছড়িয়ে পাটীসাপটা পিঠের মত জড়িয়ে জড়িয়ে রাখছে। এগুলো লাগবে চাপান দেবার সময়। ২০/৩০ জন এক একটা হাইত ধরে চাপান মুখে ফেলে দেবে। পুরানো ভাঙা চোরা দু চার খানা নৌকাও মাটী বোঝাই করে রাখা হয়েছে। ওগুলোও ডুবিয়ে দিতে হবে চাপানের মুখে।

অভিজ্ঞ মিস্ত্রী দিয়ে তৈরী করা গোটা চারেক বাকস্ কল বা আগরী বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিলের জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখার জন্য।

খালের দুদিক থেকে বাঁধ অগ্রসর হয়ে আসছে। একদিকে দাঁড়িয়ে কেষ্টবাবু আর একদিকে জ্যোতিষবাবু। গোটা কাজের শৃংখলার উপর তীক্ষ্ন নজর রেখেছেন। মাঝখানে নৌকার উপর দাঁড়িয়ে সানা বুড়ো কাশেমালি। প্রতিটি চাক মাটী পড়া তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন।

এক একটা ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত সারাক্ষণের কর্মীদের নেতৃত্বে এসেছে সেই ইউনিয়নের কৃষকশ্রমিক দল। তাদের আবার ভাগ করা বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন ছোট ছোট দলে। সেই সব ছোট ছোট দলেরও এক একজন নেতা আছে। গোটা পরিকল্পনার রচনা তৈরী করে দিয়েছে রিণী। কেষ্টবাবুর আইডিয়া আর অনুমোদন আছে প্রতি স্তরে। বাঁধবন্দী কমিটির সদস্যরাও বিভিন্ন কাজের জায়গায় একটু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে সব সময় কাজের শৃংখলার উপর তীক্ষ্ন লক্ষ্য রাখছেন। দু হাজার লোকের কাজের একটা মুহূর্তও যেন অপচয় না হয়। আবার মুহূর্তের অসতর্কতায় কোথায় কোন দুর্ঘটনা না ঘটে যায়।

সারা অঞ্চলের লোক জানে বাঁধ চাপান দেওয়া হবে পরদিন বেলা দুটোর সময়। শত্রুপক্ষের লোক নিশ্চয়ই সেইভাবে থানায় খবর দিয়ে রাখবে। পুলিশ নিশ্চয়ই আসবে। বাঁধা দেবে চাপান দেবার আগে। সব আয়োজন ব্যর্থ করার চক্রান্তে নিশ্চয়ই তারা ত্রুটি রাখবে না। তাই প্রথম থেকে স্থির হয়ে আছে বাঁধ আজ রাত দুটোর সময় চাপান দিতে হবে। কিন্তু সে কথা জানে মাত্র তিনটি লোক। সানা, কেষ্টবাবু আর জ্যোতিষবাবু। চার কান হলেই থানায় খবর চলে যাবে। রাত্রেই পুলিশ আসবে। রাতের অন্ধকারে কয়েকজন পুলিশ গুলি চালিয়েই ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে এই বিশাল কর্মীদলকে।

সন্ধ্যার মুখে আধঘণ্টার কর্মবিরতি। জলখাবার খেয়ে নেবে সবাই। এইবার কেষ্টবাবু আর কাসেম আলি সবাইকে ডেকে বলে দিলেন ভাইসব আমরা এক কঠিন কাজে হাত দিয়েছি। বাধা অনেক। কিন্তু এই কাজের সফলতার সংগে আমাদের জীবন মরণ সমস্যা জড়িত। সফল আমাদের হতেই হবে।

জনতা বিরাট কোলাহল করে সমিতির নামে জিন্দাবাদ দিয়ে তাদের সমর্থন ও দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করল।

তখন কেষ্টবাবু সমস্ত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করে বললেন। আজ রাত দুটোতে বাঁধ চাপান দিতেই হবে। প্রাণপণে সবাই যেন কাজ করে। আমাদের শত্রুপক্ষরা বুদ্ধি এবং চতুরতায় আমাদের চেয়ে কম নয়। আগে থেকে জানতে পারলে তারা হয়ত রাত্রেই পুলিস এনে বাধা দিত। তাই কাউকে একথা বলা হয়নি। সে জন্য কেউ দুঃখ না করে। আমরা পুলিশের সংগে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াতে চাই। কারণ তাতে কিছু জীবন নাশের সম্ভাবনা। আর তেমন হলে আমাদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

জনতার মধ্যে থেকে সুবীর বলল এখন এই যে ঘোষনা করলেন, এরপর জানজানি হতে কতক্ষণ। বাঁধ চাপান দেবার আগে এই রাতেও তো পুলিশকে খবর দিয়ে আসতে পারে ওরা। দেওয়ালেরও যে কান নেই তা—কে বলবে।

তোমার সন্দেহ খুবই যুক্তিসঙ্গত। আর তার জন্যও সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। এই ঘোষণার সংগে সগে সারা গ্রামের বিভিন্ন অংশে দুইশত লেঠেল পাঁচু সর্দারের নেতৃত্বে পাহারার কাজে নিযুক্ত হবে। আজ রাতে এই গ্রাম থেকে একটা মশা মাছিরও বাইরে যাওয়া চলবে না। কেউ বাড়াবাড়ি করলে তা সে যেই হোক ধরে নিয়ে আসবে তাকে ওরা এইখানে। অসুক বিসুখের ক্ষেত্রেও আজকের রাতের মত তাকে গ্রামের ডাক্তার দিয়েই চিকিৎসা করাতে হবে।

জনতা আবার উল্লসিত জয়ধ্বনি করে উঠল। দ্বিগুন উৎসাহে সংগে সংগে কাজে লেগে গেল সবাই।

তিনশো ডে লাইট বাঁশের মাথায় জ্বলছে। কে বলবে আজ অমাবস্যার রাত। গোটা অঞ্চলটা আলোয় আলোয় ঝকমক করছে।

এক একটা মুহূর্ত চলে যাচ্ছে, আর সেই চরম মুহূর্তকে এগিয়ে আনছে। ততই উত্তেজনা বেড়ে চলেছে। এবার শৃংখলা রক্ষা করা খুব কঠিন হয়ে উঠছে। কেষ্টবাবু জ্যোতিষবাবু, বাঁধ কমিটির সদস্যরা, ইউনিয়ন কর্মীরা নিজ নিজ সীমায় ছোটাছুটি করে সতর্ক করে চলেছেন। উত্তেজনায় কেউ কেউ বিপদের কথা ভুলে না যায়। এক চাক মাটি বাঁকে উপর না পড়ে কোন কর্মীর পিঠে পড়লে জীবন

গোর হয়ে যাবে তার। কিংবা কেউ পা পিছলে নীচের দিকে সরে গেলে মুহূর্তের মধ্যে অন্ততঃ একশ মাটীর চাক তাকে চিরদিনের জন্য বাঁধের সংগে গেথে রাখবে। কাজেই খুব হুসিয়ার। ব্যস্ততা ও উত্তেজনা সত্বেও সব সময় খেয়াল রাখা চাই। সংযত হয়ে কাজ করা চাই।

শুরু হলে শেষ হয়। আরম্ভ কাজ রয় না। কিন্তু বাঁধের কাজটা যেন বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। সারভাটি আসতে এখনও এক ঘণ্টা বাকী। অথচ চাপান মুখ পর্যন্ত বাঁধ বাধা শেষ। আনন্দে কেউ হরিবোল দিয়ে ওঠে। এতক্ষণ একটু তামাক খাবার অবসর হয়নি। হঠাৎ সকলের যেন তামাকের নেশা পেয়ে বসে। প্রত্যেক দলের হুঁকো কলকে, তামাক পল বা গোবরের মশাল সংগে আছে। তাতে আগুন ধরল। বাঁ হাতের চেটোয় কলকের ছাই ঢেলে সেই হাতেরই দুই আঙ্গুল দিয়ে কলকেটা ধরে প্রথমে ঠিকরীটা তারপর নোতুন তামাক, সকলের উপর পোড়া তামাক ও তার ছাই গুড়ো করে দিয়ে অবশিষ্ট ছাইটা ফেলে দাও। এবার কলকের মুখে মশালের আগুন ভেঙ্গে নিয়ে হুকোর নলচের মাথায় বসিয়ে দিয়ে টান দাও। দু তিন টানেই ধোঁয়া বেরিয়ে আসবে। এইবার সেই ধোঁয়া গলগল করে বেরুতে থাকবে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে। আঃ অনেক পরিশ্রমের পর অনেকক্ষণ পরে তামাক খাওয়ার একটা বিশেষ তৃপ্তি আছে। তামাক সেবীদের মুখে সেই তৃপ্তির খুশী ফুটে উঠে। নবীনেরা ততক্ষণে বিড়ি ধরিয়েছে।

প্রতীক্ষীত মুহূর্ত এল। চাপান দেওয়া হয়ে গেল বাঁধ। আধঘণ্টাও লাগেনি। বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ছোকরাগুলো নাচতে লাগল। শংখ ঘণ্টা বাজাল মেয়েরা। মহুর্মুহ সমিতির জয়ধ্বনি। কৃষক সমিতির পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল। বাঁধের পরে। সারভাটীর কাদায় মাখামাখি হয়ে সবাই ভূত হয়ে গেছে। জয়ধ্বনি দিতে দিতে কিছু কিছু লোক ফিরে চলল। এই শেষরাতে ফিরে গিয়ে ডুবিয়ে চান করতে হবে, তারপর পান্তমান্ত যা জোটে এক পেট খেয়ে নিয়ে সারাদিন ঘুম। বাঁধ শেষ হতেই সকলের মনে হচ্ছে যেন প্রচণ্ড ক্ষিধে পেয়েছে। আর ক্লান্তিতে পা ভেঙ্গে আসছে, ঘুমে আসছে চোখ ঢুলে।

লেঠেলদের গ্রামের পাহারা তুলে নেওয়া হয়েছে। এবার ওরা পাহারা দেবে বাঁধ পালা করে। এত কষ্টের বাঁধ কেউ কাটিয়ে দিয়ে শত্রুতা না করতে পারে।

ছোট বড় নেতারা আর শ দুই তাজা কর্মী রাখা হয়েছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে। বলা যায় না জোয়ার এলে যদি কোন জায়গা থেকে জল চোয়ায় তবে বিদ্যুৎ গতিতে সেটা বন্ধ করতে হবে। আর ডেলাইট থেকে সুরু করে বিভিন্ন জিনিস যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে সকাল হতেই। তার আগে ছুটি নেই।

মেয়েদের বাহিনী সব গ্রামেরই। তারা সবাই প্রায় চলে গেছে। দশবারোজন আছে। কিছু চিড়ে গুড়। আটকে রাখা কর্মীদের আর একবার জলখাবার দিতে হবে। নতুবা সবকাজ শেষ করে কাল বাড়ী ফিরতে এদের বেলা দশটা এগারোটা হবে। ততক্ষণ এরা থাকবে কি করে। রিণী ওদের নিয়ে জটলা করে বসেছে। ডে লাইট জ্বলছে। বাঁধের কাছ থেকে বেশ একটু দূরে ওরা।

বাঁধের কাছাকাছি একটা গাছের নীচে বসেছেন কেষ্টবাবু, জ্যোতিষবাবু, কাশেমালি, সুবীর, মন্মথ, অনিল, সুবল, বলাই, মনিরুদ্দি আরও সব ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা।

কাশেমালি বলছেন, রাত্রিতে কখনও বাঁধ চাপান দিই নি। এই প্রথম দিলাম জীবনে। কি আছে কপালে কে জানে। যতই আলো থাক রাত্রে সব জিনিষটা ভাল করে দেখা যায় না।

এতক্ষনে সকলের যেন খেয়াল হ'লো, সবই হৈ হল্লা আমোদ ফুর্ত্তি করলেও সানার মুখে এখনও হাসি ফোটেনি। সর্বক্ষণ সে চিন্তিত মুখে একটু গম্ভীর হয়ে আছে। ওর মন আর চোখ পড়ে আছে ঐ বাঁধের চাপান মুখে।

কেষ্টবাবু বললেন এমন আনন্দের সময় তুমি মিথ্যে ভয় করছ চাচা। আল্লার মর্জি বাঁধের কোন অমঙ্গল হবে না।

তা না হলিই ভাল। তবে জান কি বাপ, আমরা আহ্লাদে আল্লার কথা ভুলে যাই। শুধু তাঁরে ডাকি দেই দুঃখের দিনে। এতক্ষণ একবারও আমরা আল্লার কথা মনেও করিনি।

তা যা বলেছ চাচা। জ্যোতিষবাবু বলেন তবে কি জানো, আমরা যে কত অবুঝ তা তো আল্লাতাল্লা সবই জানেন। তিনি আমাদের ঠিক ক্ষমা করবেন।

তার মেহেরবানী কি শেষ আছে রে বাপ। খোদা হাফিজ। তোমরা বোস। আজ সন্ধ্যায় আছরের নামাজটা পড়া হয় নি। আট বছর বয়সে নামাজ পড়া শিখিছি। আটান্ন বছর বয়স হল। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আজ নামাজ পড়া হল না। তোমরা বস আমি একবার নামাজ পড়ে নি।

ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধের মনের কালো মেঘ সকলের মনে ছায়াপাত করল। কোথাও কোন ত্রুটি হয়ে গেল কি ?

দেখতে দেখতে জোয়ার এসে গেল। কলকল করে জল এসে আছড়ে পড়ছে বাঁধের গায়। একটার পর একটা ঢেউ। কাসেম আলি তাড়াতাড়ি নামাজ সেরে চলে গেল বাধের উপর। নাঃ কিছু বোঝা যায় না। ঠিকই তো আছে সব। মনে হয় কোন ভয় নেই। তোমরা দু'একজন লক্ষ্য রাখ। উল্টো দিকে কোন

ছিদ্র পথে জল বেরোয় কিনা। মাটি, গোলপাতা, হরগোজার ঝোপ, কেওড়ার ডাল— সব যোগাড় করা আছে। তেমন দেখলে তৎক্ষণাৎ সেখনে চাপ দিয়ে জল আটকে দিতে হবে।

একে একে সবাই ফিরে এসে বসেছে। কাশেমালি ফিরে এসে বসল। আবার একটু পরে উঠে গেল। ও যেন ছটফট করছে। চাপানের উপরে কজন দাঁড়িয়ে জলের ঢেউ এসে কেমন আঘাত করছে বাঁধে তাই দেখছে। কাশেমালি পাগলের মত ছুটে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলে। কেউ উঠবে না, কেউ উঠবে না বাঁধে।

এই যে লক্ষ্য রাখতি কলে চাচা।

বাঁধের উপর থেকে নয়। পাশ থেকে লক্ষ্য করো।

আরোও আধ ঘণ্টা কেটে গেল। কিছুই বোঝা যায় না। কোন কুলক্ষণ নেই। হঠাৎ। আর একটু হলেই পুলিন গিয়েছিল আর কি। চাপানের এক কোণা ভেঙ্গে হুস করে প্রচণ্ড বেগে জলের তোড় পাক খেয়ে ছুটে চলল।

কাশেমআলি গাছটা ধরে বসে পড়ল। আল্লা রহমান। যা ভয় করলাম তাই হ'ল।

সবাই ছুটে গেল ভাঙ্গনের মুখে। কেউ কেউ ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। কেষ্টবাবু থামালেন। জোয়ারের বেগ কমে না এলে কিছু করার নেই। সবাই ফিরে এসে বসল। যেন হাত পা ভেঙ্গে গেছে।

রিণীও তার সঙ্গীদের নিয়ে এদের কাছাকাছি এসে বসল।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। ধীরে ধীরে মুখ তুললেন কেষ্টবাবু। পরাজিত সেনাপতি হয়ত এতক্ষণ নোতুন রণ কৌশল চিন্তা করে নিলেন। ক্লান্ত সৈনিকদের পুনরায় উদ্বুদ্ধ করে আবার এগিয়ে দিতে হবে। পরাজয়কে তো মেনে নেওয়া চলবে না।

আদেশ ঘোষনার আগে বোধহয় সময় মন্ত্রনালয়ের পরামর্শদাতার কাছ থেকে প্ল্যানটা যাচাই করতে চাইলেন। বললেন এখন কি হবে, রিণী মা।

নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে স্থির কণ্ঠে রিণী উঠে দাঁড়িয়ে বলল কি আর হবে। আমার ভাঁড়ারে সামান্য কিছু চিঁড়ে গুড় আছে। ইউনিয়নের কর্মীদের দশমিনিটের মধ্যে আমি খাইয়ে দিচ্ছি। ওরা ছুটে চলে যাক। যারা চাল গেছে তাদের আবার ফিরিয়ে আনুক। আর প্রতি গ্রামের ছেলে বুড়ো সবাইকে ডাক দিয়ে আসুক। বেলা সাতটার মধ্যে হাজার পাঁচেক লোক যোগাড় করতে হবে। কাল দুপুরের ভাটিতে আবার বাঁধ চাপান দিয়ে শেষ করতে হবে। সমর্থ কোন লোক যেন বাড়ীতে না থাকে। সবাইকে বাঁধে এসে সমবেত হতে হবে।

সুবীর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এই সময়ে আবার খাওয়ার কথা তোমার মনে হল রিণী। খাওয়ার জন্য দশ পনেরো মিনিট ও নষ্ট করা উচিৎ নয়। আমি এখনই বেরিয়ে যেতে চাই। আর কে কে রওনা হবে উঠে পড়।

রিণী দৃঢ়কণ্ঠে বলল, শোন বীরুদা, বিপদের সময় যেমন ক্ষিপ্রতার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন ধৈর্যের। যাদের গ্রাম থেকে গ্রামে ছুটতে হবে, তাদের পেটে কিছু না থাকলে তারা শেষ পর্যন্ত হুমড়ি খেয়ে পড়বে পথের মাঝে। পনেরো মিনিটে কোন ক্ষতি হবে না। অধৈর্য হয়ে গোটা জিনিষটা বানচাল করো না।

কেষ্টবাবু বললেন, কাশেম আলিকে, চাচা কি বল।

কাশেম আমি বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারে ছ্যামড়ারা ছুটে যাক। সবাইরি ডাকে আনুক। বাঁধ দিতি আইছি, বাঁধ না দিয়ে তো বাড়ী ফিরতি পারব না, বাবা।

কেষ্টবাবু এবার জ্যোতিষবাবুকে বললেন, দাদা আপনি কি বলেন।

বলার কি আর আছে। কাসেম চাচাকে না নিয়ে তো বাড়ী ফিরতে পারব না। আর চাচা তো বাঁধ শেষ না করে বাড়ী ফেরার লোকও না। এক কথার মানুষ। সুবীর কথা কাটাকাটি না করে এক এক মুঠো চিড়ে কোচড়ে বেঁধে নিয়ে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল পঞ্চাশ জন কর্মী।

এবার কেষ্টবাবু পাঁচুকে ডাকলেন।

তোমার উপর সব নির্ভর করছে পাঁচু।

পাঁচু বুঝতে পারে না। চেয়ে রইল।

কি, কিছু বলছ না যে সর্দার।

আমি মুখ্যু মানুষ বাবু। আমি আর কি কব। আপনি আছে। খুড়ো মশাই আছো। জান দিতি কও দেব। কোনো শয়তানের কলজে ছিড়ে আনতি কও আনে দিচ্ছি। এর বেশী কোন বুদ্ধি আমার মাথায় খেলবে না। কি হুকুম তাই কও শুনি।

কাল দিনের বেলায় বাঁধ চাপান দেওয়া ছাড়া তো কোন উপায় রইল না। পুলিস আসবে। বাধা দেবে। হয়ত গুলি চালাতেও পারে। পুলিসকে কি করে রোখা যাবে?

কত লেঠেল চাই, বাবু? কত পুলিস আসতে পারে।

বিশ পঁচিশ জন থেকে পঞ্চাশ এক'শ হতে পারে। বলা যায় না।

পঞ্চাশ জন লেঠেল হলি হবে বাবু।

না অনন্তঃ দু'শো লোক যোগাড় করতে পার কিনা দেখ। লড়াই হয়ত করতে

হবে না। তবে তৈরী থাকতে হবে। ওরা যেন বুঝতে পারে গুলি চালালে ওদের আমরা ফিরে যেতে দেব না।

ফিরে কি যাবে বাবু। হুকুম দিও একটাও ফিরে যাবে না বন্ধকরি পাচো ডরায় না। আপনার আশীর্বাদে পঞ্চাশজন লাঠেল হলি খুব। তবে কচ্ছ যখন দেখবো কত যোগাড় করতি পারি। তাইলে যাচ্ছি বাবু।

জ্যোতিষবাবু বললেন পাচু কাজের লোক। আপনার ভাবনার কিছু নেই। তবে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়াতে না পারলে ভবিষ্যৎ কি দাঁড়াবে তাই ভাবছি। যে ভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কিছু খুন জখম হলে সব যে গোলমাল হয়ে যাবে।

গোলমাল যাতে না হয় সেইজন্য তো পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা যে ভিন্ন দাদা।

তারপর হেসে ফেললেন। চোখে কৌতুক খেলছে। রিণী এসে দাঁড়িয়েছে। ছেলে ছোকরারা সব ঘুমিয়ে পড়েছে। খানিক বিশ্রাম করুক ওরা। এক জোয়ারে যেটুকু ভাঙবে তা বাঁধতে দু'তিন ঘণ্টার বেশী লাগবে না। হতাশ হবার কোন কারণ নেই। কাশেম আলি দূরে একটা গাছ তলায় নামাজ পড়েই চলেছে। এখানে শুধু কেষ্টবাবু, জ্যোতিষবাবু, রিণী। বললেন তুমি বল তো মা কি হবে।

রিণীও হেসে ফেলল! এতলোক থাকতে আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করছেন। আমি কি হাত গুণতে জানি?

ও সব এড়ানো কথা চলবে না, মা। বলতেই হবে। যা তোমার মনে হয়, বল না।

হুঁ, ঐ ফাঁদে পা দিলেই তো আপনি আমাকে কায়দা করতে পারেন। যেই কিছু বলেছি অমনি ধরবেন, যুক্তি দেখাও। আমাদের শাস্ত্রে যুক্তিহীন অনুমানের স্থান নেই।

বেশ তো যুক্তিসহ বলবে।

তার আগে বলুন পাঁচ হাজার লোক যোগাড় করতে বলা হল কেন?

সে তো তুমি বললে?

আপনি তো সমর্থন করলেন। কি ভেবে করলেন।

ভাবলুম, মা যখন বলছে, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।

এমন অন্ধভক্তি তো আমাদের শাস্ত্রে থাকার কথা নয়। আমি সর্বদা যুক্তিবাদী, আর সেই যুক্তি চলবে মানবতাবাদের নিরিখে।

এবার হো হো করে হেসে উঠলেন কেষ্টবাবু। জ্যোতিষবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখলেন দাদা, বেটি কেমন করে ঠকিয়ে দিল। এমন মা পাওয়া ভাগ্যের কথা।

উঃ কি তোষামুদে ছেলেরে বাবা। বুড়ো ছেলে না হলে এমন শাসন করতাম।

শাসন কি আর কম করছিস। বোস্ কাছে বোস।

জ্যোতিষবাবু বললেন, কিন্তু আমি এখনও ভাবছি সশস্ত্র লেঠেল সমাবেশ উত্তেজনায় ইন্ধন যোগান হবে না তো।

না ওটার দুটো উদ্দেশ্য। পুলিসকে সতর্ক করা যে বোকার মত গুলি চালালে তারাও নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারবে না। আর যদি ওরা ফাঁকা আওয়াজ করে তাতে আমাদের জনগন ঘাবড়াবে না, ছত্রভঙ্গ হবে না। তাদের মনোবল বাড়িয়ে দেওয়া।

সকাল ছ'টা হতে না হতেই দলে দলে লোক আসছে বিভিন্ন দিক থেকে দা কুড়ুল খোন্তা কোদাল ঝুড়ি নিয়ে। মিছিল করে আসছে সব। অকর্মন্য শিশু, বৃদ্ধ ও গৃহবধূ ছাড়া এই মিছিলে মেয়ে পুরুষ সবাই সামিল হয়েছে। চোখে জ্বলছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আগুন, মুখে শ্লোগান। কৃষক সমিতি জিন্দবাদ। সন্ন্যাসী খালের বাঁধ বাধবোই বাঁধবো। কোন বাঁধা মানব না, বাঁধ না বেধে ফিরবো না। মিছিলের পর মিছিল এক এক করে এসে পেঁাছাচ্ছে। লোকে লোকারণ্য। অভাবনীয়। অকল্পনীয় জন সমাবেশ। কেষ্টবাবুও বোধহয় এতটা আশা করতে পারেন নি। চোখে মুখে এদের কঠিন প্রতিজ্ঞা। নদীর বেগ তো তুচ্ছ উত্তাল সমুদ্রও বোধহয় সেই জন গর্জনে স্তব্ধ হয়ে যাবে। দরকার হলে এরা আত্মবিসর্জন দিয়েও বাঁধ বাধবে। আরুণির মত এরা চাপানের মুখে শুয়ে পড়ে রুখে দেবে জোয়ারের বেগ। মানুষের এই দৃঢ় সংকল্পের কাছে প্রকৃতি মাথা নত করেছে বহু বার। আজও তাকে নত হতে হবে, হবেই।

কাসেম চাচা এতক্ষণ দূরে গিয়ে একবার নামাজ পড়ছিলেন, একবার কোরাণ শরিফ আওড়াচ্ছিলেন। এইবার এগিয়ে এলেন জনতার মাঝে। চোখ দিয়ে যেন আগুনের হল্কা বেরিয়ে আসছে।

উদ্দীপ্ত কণ্ঠে জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, ভাইসব, আমরা একবার হারছি এবার আমরা জেতবই। খোদাতালা আমাদের মনের বল পরীক্ষা করছিলেন। বল ভাইসব—কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ। কোন বাঁধা মানব না। বাঁধ না বাঁধে ফেরব না।

আজ আর বাছবিচার নেই। আশপাশের যত গাছ গাছাল আছে তার ছোটখাট ডালপালা। সব কেটে নিয়ে আস। যোগাড় কর গোলপাতা। না পাও যার ঘর গোলপাতায় ছাওয়া আছে খুলে ফেল তার চাল, নদী দিয়ে কোন গোলপাতার নৌকা যাতি লাগাল, আটক কর, তুলে আন সব মাল। তারপর যে ভাবে হোক তার ক্ষেতি পুরেণ করা যাবে। হাইত পর হাইত তৈরী কর। যোগাড় কর যত পুরানো

নৌকা আছে। মাটি ভরে ফেল, হাইত আর নৌকা, ডালপালা আর পলখড়, আর মাটী।

মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক এক দল এক এক কাজে। মেয়েরা পর্যন্ত লেগে গেল মাটীর চাক তুলতে।

কাসেম চাচা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। এ মূর্তি তার কেউ কখনো দেখেনি। কেষ্টবাবুও স্তব্ধ হয়ে গেছেন। কোন দৈব শক্তি যেন ভর করেছে আজ চাচার উপর। কাল থেকে উপবাসী এই শীর্ণকায় লোকটার মধ্যে আজ যেন চতুর্গুণ শক্তি আর উদ্দাম এসেছে। দেখতে দেখতে চাপানের মুখ ছাড়া সমস্ত বাঁধ আরো দুহাত উচু করে বাঁধা হয়ে গেল। বাঁশ খুটি ডালপালা পুতে শক্ত করে দাঁড়দড়া দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। তার উপর শক্ত মাটির চাপ বসিয়ে চেপে এটে দেওয়া হল।

সবুর আর সইছে না। এখনও সারভাটী হতে দু'ঘণ্টা বাকী। সবাই তৈরী। এইবার সবাইকে সুশৃংখল করে নিতে হবে। নতুবা অতি উৎসাহে হুড়োহুড়ি করে আসল কাজের সময় গোলমাল হয়ে যেতে পারে। জনতাকে শৃঙ্খলা বদ্ধ করে নিতে লেগে গেল ইউনিয়নের নেতারা।

এমন সময় দেখা গেল পুলিশ আসছে। কেষ্টবাবু চীৎকার করে বললেন, পুলিশ এসে গেছে। হয়ত তারা আমাদের কাজে বাধা দেবে। কিন্তু আমাদের কর্মীরা যেন কেউ সংযম না হারায়। কেউ যেন কোন উত্তেজনা প্রকাশ না করে। কোন কিছু করার প্রয়োজন হলে আমি তার নির্দেশ দেব। আমার নির্দেশ না পেলে কেউ এক ইঞ্চি নড়বে না।

কেষ্টবাবু এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, মনসুর আলি দারোগাকে।

আসুন, আসুন, বড়বাবু আসুন। আপনি যে আজ আমাদের কাজে শুভেচ্ছা জানাতে এসেছেন এজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহিত বোধ করছি। আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহন করুন।

অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কুশলী দারোগা মনসুর আলি। যেমন অহংকারী, তেমনি অত্যাচারী। তবে সময় বুঝে সংযত হতে জানে। স্বদেশীদের প্রতি তার কঠোর ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে।

কেষ্টবাবুর কথায় মনসুর আলীর মুখখানা কাল হয়ে উঠল। মুহূর্তে সামলে নিয়ে মুখে হাসি টেনে বললেন, আপনি কি আমাকে বিদ্রূপ করছেন কেষ্টবাবু।

তৎক্ষণাৎ স্বভাববিনয়ী কেষ্টবাবু বললেন, না-না কখনো না। আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না দারোগা সাহেব। আপনি সরকারী চাকুরী করেন। উপর-

ওয়ালার নির্দেশ পালন করা আপনার কর্তব্য। আর সেই হুকুম তামিল করতে গিয়ে আপনাকে নিষ্ঠুর হতে হয়, অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, কখনো জনবিরোধী কাজও করতে হয়। কিন্তু চাকুরীর বাইরেও তো আপনার একটা সত্তা আছে। আপনি তো এই দেশেরই মানুষ। এই দেশের হাজার হাজার মানুষের মঙ্গল হবে যে কাজে তার প্রতি আপনার আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা না থেকেই পারে না। এ দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে। চাকুরীর খাতিরে হয়ত সে সহানুভূতি প্রকাশ্যে জানানো সম্ভব নয়। আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি দারোগাকে নয়, মনসুর আলি সাহেবকে। অনেক স্বদেশীর প্রতিও আপনার মনের অন্তঃসলিলা সহানুভূতির পরিচয়ও আমার অজানা নয়।

মনসুব আলি আবার হাসলেন। বললেন, অভিনন্দন আপনারই প্রাপ্য। আপনাদের প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

এখন আপনার কি হুকুম, বলুন। কেষ্টবাবু জিজ্ঞাসা করেন।

আমি কোন হুকুম দিতে আসিনি। আপনাদের কাজে বাধা দিতেও না। আমি এসেছি শুধু রুটিন ডিউটি করতে। একটা রিপোর্ট নিয়ে যেতে।

তবু সশস্ত্র পুলিশ এনেছেন তো প্রায় ডজন দুয়েক।

সেটাও একটা রুটিন মাফিক কাজ। ১৪৪ ধারা আছে। শান্তি-ভঙ্গ হলে পরে আমার একটা দায়িত্ব এসে যাবে। তবে এসে যা দেখছি তাতে শান্তি ভঙ্গের কোন আশংকা নেই। এই হাজার হাজার লোকের বিরুদ্ধে ঐ দশ বিশ ঘর জেলেরা এসে শান্তি ভঙ্গের কারণ ঘটিয়ে মরতে যাবে না, তা নিশ্চিত। অতএব আমি এখনই ফিরে যেতে পারি।

এমন সময় কেষ্টবাবু হঠাৎ এক কাজ করে বসলেন, বললেন, দারোগা সাহেব আজ আমাদের এখানে এমন কিছু নেই, যা দিয়ে আপনাকে অভ্যর্থনা করতে পারি। একটা সিগারেট, এক কাপ চা, তাও দেবার উপায় নেই। আপনি শুধু আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিয়ে যান।

তারপর জনতার দিকে ফিরে বললেন, ভাইসব, দারোগা সাহেব আমাদের বাঁধবন্দীর কাজে শুভেচ্ছা জানিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। বল ভাই সব, মনসুর আলী সাহেব কি জয়।

আকাশ বাতাশ প্রতিধ্বনিত করে সেই জয়ধ্বনি বাজল।

তাড়াতাড়ি মনসুর আলি সাহেব এবার কেষ্টবাবুর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন. একি করলেন কেষ্টবাবু আমার চাকরীটা খেলেন।

আরো না না। কি যে বলেন। এতে আপনার চাকরী যাবে না। আপনি

এতদিন ধরে যে বিদেশী প্রভুর গোলামগিরি করে আসছেন, তিনি আপনাকে নিজের দোষে নয়, অবুঝ জনগণের এই আকস্মিক অপরাধে বরখাস্ত করে দেবেন। এ কখনো হতে পারে না। এত অবুঝ ইংরাজ নয়। তা হলে ওরা দেশ শাসন করতে লোক পাবে কোথায়? আর যদিই বা এই অপরাধে আপনার চাকরী যায় তবে আমি কথা দিচ্ছি, দারোগা সাহেব আমি আমার হাজার হাজার সংগী নিয়ে চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকব।

মনসুর আলি এবার জড়িয়ে ধরলেন কেষ্টবাবুকে। বললেন, মনসুর আলি দারোগাকে কেউ কখনো এমন করে তিরস্কার করে নি ভাই। আজ আমার বিশ্বাস হচ্ছে আমি তিরস্করের পাত্র। যে শাসক জনগণের মঙ্গলের জন্য শাসন করে না, তার গোলামী করা মহাপাপ ভিন্ন আর কিছু নয়।

কেষ্টবাবুকে ছেড়ে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলেন দোর্দণ্ড প্রতাপ দারোগা মনসুর আলি। জমাদার সশস্ত্র বাহিনীকে মুখ ফিরিয়ে মার্চ করতে হুকুম দিন।

স্মিতমুখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ওর গমন পথের দিকে কেষ্টবাবু। জনগণের মধ্যে জেগে উঠল আবার চঞ্চলতা। সানার হুকুর শোনা গেল। চাপানের সময় হয়ে আয়েছে। হাইত নিয়ে সব আগোয়ে আস।

॥ ১৮ ॥

সমস্ত কাজকর্মের বিলি ব্যবস্থা করে ইউনিয়নে ভারপ্রাপ্ত ক্যাডার ও বিশেষ কয়েকজন কর্মীকে নিয়ে জ্যোতিষবাবুর ওখানে যখন কেষ্টবাবু ফিরলেন, তখন সন্ধ্যা হতে আর বেশী বাকী নেই। পশ্চিমদিকেই আসছিলেন ওঁরা। একটা দেবদারু গাছের মাথার উপর পড়িয়ে স্নিগ্ধ সূর্য রঙীন রুমাল নেড়ে হেসে হেসে ওদের অভিনন্দন জানিয়ে বিদায় নিতে চলেছে। চারিপাশের আম কাঁঠাল জাম নারকেল সুপারি সবেদা গাছ থেকে সুরু করে পথের পাশের কচা ভেরেণ্ডা গাছগুলো কি সবুজ, কি সুন্দর মনে হচ্ছিল কেষ্টবাবুর। অনেকদিন যেন এ সব দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেন নি। বহু বৎসর তাঁর মনের উপর প্রকৃতির এই শ্যামল প্রাচুর্য কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেনি। যে প্রকৃতির কোলে মানুষ অনাহারে থাকে তার রুপলাবণ্যের দিকে তার তাকাবার অবসর বা মন কিছুই ছিল না। অথচ যখন তিনি রাজবন্দী হয়ে থানায় থানায় জেলে জেলে ঘুরেছেন তখন তিনি পুরোপুরি

শিল্পচর্চা নিয়ে ডুবে থাকতেন। ব্যায়াম চর্চা, ছবি আঁকা আর গীটার বাজান ছিল তাঁর সাধনা।

ব্যায়াম চর্চা ভিন্ন অন্য আর দু'টি তাঁর জীবনে কোন কাজে আসেনি। আর কোনদিন আসবেও না। যে জীবনে অবসর নেই, জেলখানা ভিন্ন অবসর লাভের স্থান নেই সেখানে শিল্প সাধনার কথা মনে করাও হাস্যকর।

একটুখানি মিষ্টি পারিবারিক জীবনের স্বপ্ন, না, কোনদিনই কেষ্টবাবুর মনে জাগেনি। অথচ মানুষ পরিবার পরিজন নিয়ে স্নেহমমতায় গুচ্ছবদ্ধ হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্তে বসবাস করছে এই কল্পনায় তার কত না আনন্দ। আর সেই জীবন মানুষের ঘরে ঘরে এনে দেবার জন্যেই তো তাঁর সংগ্রাম। নৈলে নিজেকে নিয়ে নিরিবিলি সুখে থাকতে চাইলে তো তার কোন অভাবই ছিল না। ছোটখাট জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। অর্থকড়ি যা ছিল তাতে তার জীবন আরামে বিলাসে কেটে যাওয়াতে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু সে তার সহ্য হয় নি। সহ্য হয়নি সন্ন্যাসীর আশ্রম। পড়তে পড়তে হঠাৎ উধাও হয়ে চার বছর কাটিয়েছিলেন ঋষিকেশে সাধুসংগে। বাঁধাধরা নিশ্চিন্ত সে জীবনে তাঁর মন বসে নি।

পেছনের দিকে তাকানো কেষ্টবাবুর স্বভাব নয়। আজ তবু হঠাৎ অতীত জীবনটা মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। বাঁধের অলংকার পরে সোনা সোনা রোদের বেনারসীতে সজ্জিতা হয়ে দিগন্তবিহারী বিলটা আজ মৃদু মৃদু হাসছে। সে যেন তাঁরই দিকে তাকিয়ে আছে প্রেমস্নিগ্ধ চোখে। কেষ্টবাবু ঐ বিলের দিকে তাকাতে তাকাতে নীরবে ধীরে ধীরে চলেছেন। পেছনে সঙ্গীরা উল্লসিত সাফল্যে কলকল করতে করতে আসছে। সেদিকে তার কান নেই।

সাতহাজার বিঘে জমি উদ্ধার হবে এই বাঁধ স্থায়ী হলে। চারিপাশের গ্রামের মানুষের মাঝে জেগে উঠবে এক নোতুন জীবন। ঐক্যবদ্ধ কৃষক জমিদারের অত্যাচার মুক্ত। ফসলের প্রাচুর্য। অভাব অনটন নেই। গ্রামে গ্রামে স্কুল লাইব্রেরী, যাত্রা থিয়েটারের দল।

কিন্তু সে স্বপ্নের দিন আসতে অনেক দেরী।

গোটা বিলটা থেকে জল সরে গেছে। সরকাদার আস্তরণের উপর অস্তসূর্যের আলো পড়ে চিকচিক করছে। চেচো ঘাসের চারা মাথা উচু করে উঠেছে এখানে ওখানে। ঝাকে ঝাকে সাদা কালো বক এদিকে সেদিকে উড়ে উড়ে বসেছে। কদাচিৎ কোথাও দু'একটা শামুক খোল, বেগড়ী, ডাহুক বিলের ধার ঘেসে একা একা বা জোড়ে জোড়ে বসেছে, বকগুলের ভোজসভা থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে, অন্তেবাসীর মত।

রিক্ত মাঠের দিকে তাকাতে তাকাতে মনটা কেমন হয়ে যায়। সফলতার মধ্যেও একটা বেদনা থাকে। সেই বেদনা উপভোগ্যতায় উপচে উঠে সার্থক হয় যখন তা একান্ত সংগোপনে আর কারো সংগে ভাগ করে চেখে ভোগ করা যায়। সফলতার রাজকণ্ঠের মালা এনে আর কারো কণ্ঠে পরাবার না থাকলে কোথায় যেন একটা অপূর্ণতা থেকে যায়।

নিজের মনের এই রোমাণ্টিকতায় কেষ্টবাবু নিজেই একটু কৌতুক বোধ করেন। মনে মনে হেসে একটু দ্রুত এগিয়ে চলেন। রাস্তার বাঁকে এসে সঙ্গীদের বলেন, তোমরা এগিয়ে যাও আমি যাচ্ছি।

জেলেদের যে দলটা বাঁধ বাদীর বিরোধী ও শক্তিশালী তার নেতা কালাচাঁদ। অনেকে কৃষক সমিতির পক্ষে এলেও কালাচাঁদের দলকে পাওয়া যাচ্ছে না। এরা এখনও জমিদারের নায়েবের কথায় ওঠে বসে। এদের না পেলে বাঁধ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। জমিদার যা করুক এদের নামেই করবে। কেষ্টবাবু আরও অনেকদিন এদের সাথে বৈঠক করেছেন। ফল হয় নি।

ভাবলেন একবার ব্যক্তিগতভাবে কালাচাঁদের সঙ্গে কথা বলা ভাল। সম্ভব হলে ঐ একটা লোককে যে কোন উপায়ে দলে টানা যায় কিনা তাও ভাবতে হবে।

পায়ে পায়ে কালাচাঁদের বাড়ীর দিকে নিজেই এগিয়ে গেলেন। সঙ্গীরা ততক্ষণে বাঁকের পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পথের পাশে বসে কালাচাঁদের মেয়েটা শুকনো গাছের ডাল কাটছে, জ্বালানি হবে।

জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবা বাড়ী আছে খুকী?

না।

কোথায় গেছে সে? মাছ ধরতে?

না।

তবে কোন হাটে মাছ বেচতে গেছে?

না! আজ তো হাটবার লয়।

তবে কোথায় গেল?

তা জানি নে। বোধহয় কাছারি যাতি পারে।

কেষ্টবাবু ফিরে গেলেন। মনের মধ্যে যে আশা জেগেছিল তা নিভে গেল। বুঝিয়ে বা প্রলোভন দেখিয়ে আর ওকে ফেরান যাবে না। সে সময় ওরা দেবে না। ছল এবং কৌশল যখন আর খাটবে না, তখন একমাত্র পথই রইল অবশিষ্ট যা তিনি পারত পক্ষে চান না।

কর্মীরা মনে মনে বিশ্রাম চাইছে। গত প্রায় ছ'মাস ধরে তারা অমানুষিক

পরিশ্রম করেছে। যার ফলে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টার বাঁধ বাঁধা সম্ভব হলো। কিন্তু বিশ্রামের অবসর কোথায়? এক সপ্তাহ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে বিলে জো হবে। ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত জমি চাষ দিয়ে বুনতে হবে। তার পূর্বে বহু সমস্যার সমাধান প্রয়োজন। কি করে হবে তা কেষ্টবাবুই ভেবে পাছেন না।

জমিদার যে সব জমি খাস করে নিয়েছে তার চাষ কে করবে? পূর্বে যার জমি ছিল সেই কৃষক না জমিদার নিজে। জমিদার নিজহাতে চাষ করতে চাইলে বাঁধবন্দীর খরচ না দেওয়া পর্যন্ত তাঁকে চাষ করতে দেওয়া হবে কিনা। পূর্বের চাষী চাষ করতে চাইলে জমিদার বাধা দেবে, মামলা করবে তার বিরুদ্ধে কি ভাবে লড়া যাবে। গরীব কৃষক চাষের খরচা পাবে কোথায়, বীজধান পাবে কোথায় ইতিমধ্যে জেলেরা বাঁধ নিয়ে মামলা জুড়ে দিলে তার মোকাবিলা করতে হবে। অভাবী যে সব কৃষক গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে তাঁদের পুনর্বাসিত করা যাবে কি ভাবে—ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেন কেষ্টবাবু। একনিষ্ঠ সমাজসেবীর জীবনে রোমাণ্টিকতার স্থান কোথায়?

সেদিন চা মুড়ি খাওয়ার পরই কর্মীদের নিয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

সমস্যাগুলো সকলের সামনে তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা হল। আলোচনার প্রধান অংশ নিয়েছে সুবীর, মন্মথ, অনিল, বিষ্টু এবং জ্যোতিষবাবু। রিণী এককোণে বসেছিল। কেউ কোন কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেনি। সেও কিছু বলেনি। বাঁধবাধা, জমি বণ্টন, চাষবাসের ব্যবস্থা—এ নিয়ে তার আর কি-বা বলার থাকতে পারে। সিদ্ধান্ত নেবার বেলায় একমত হওয়া যাচ্ছে না।

কেষ্টবাবু বললেন, তোমরা আলোচনা করে এক একটা প্রস্তাব আনবে। আমার বা আর কারো কোন সংশোধনী থাকলে তাও আনা হবে। তার উপর আলোচনা। তারপর ভোট। আমি পূর্বে কোন প্রস্তাব রাখব না। তা না হলে দায়িত্ব নিয়ে তোমরা কোন সমস্যা সমাধান করতে এগিয়ে আসতে শিখবে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ হলে সমিতির ভবিষ্যৎ আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সবাই চুপচাপ। কেউ কোন প্রস্তাব রাখছে না। রিণী এবার মুখ খুললে। মনে হচ্ছে কারো কোন দেওয়ার মত প্রস্তাব নেই। অতএব আমি একটা প্রস্তাব করে ফেলি।

কেষ্টবাবু বললেন, নিশ্চয়ই করবে। তুমি আজ আলোচনায় অংশ নিলে না কেন? বল, তোমার প্রস্তাব শোনা যাক।

গুরুত্বপূর্ণ যে তিনটি সমস্যা এখন আমাদের সামনে তার মোকাবিলার জন্য তিনটি কমিটি গঠিত হোক। দশজন যুবক কর্মী নিয়ে গঠিত হোক বাঁধরক্ষা

কমিটি—তার নেতৃত্ব বীরুদাই হোক, মন্মথদাই হোক বা আর কারো উপর দেওয়া হোক। তেমনি হোক জমি বণ্টন কমিটি, থানা সমিতি এর দায়িত্ব নিক। ফসল ফলানোর দায়িত্ব নিক ইউনিয়ন সমিতি। প্রতিটি সমিতি প্রয়োজন মত উপরিতন সমিতির পরামর্শ নেবেন। এর বেশী এখানে বসে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। কারণ এখানে তো সবাই উপস্থিত নেই।

কেষ্টবাবু ও জ্যোতিষবাবুও এই প্রস্তাবে সায় দিলেন। সেদিনের বৈঠক সেখানেই শেষ হ'ল।

কৃষ্ণপক্ষ। চুকনগরের হাট থেকে মাছ বিক্রী করে ফিরছে জেলেরা তিন চার জন। ঐ দলে কালাচাঁদও আছে। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কাছের মানুষ দেখা যায় না। জেলেদের হাতে ছোট ছোট লণ্ঠন। ওর মধ্যে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। কালি জমে জমে লণ্ঠনের কাচটা প্রায় কালো হয়ে গেছে। সে আলোয় পথ দেখা যায় না। দেখার হয়ত প্রয়োজনও নেই। পথ তো তাদের মুখস্থ। লণ্ঠনের আলো দেখে অন্য লোক বুঝতে পারে—কেউ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে ঘাড়ের উপর এসে পড়বে না। আর সেই জন্যই লণ্ঠনগুলো জেবলে নিয়েই চলেছে ওরা। নতুবা বৃথা লণ্ঠন ধরিয়ে এই মাঙ্গার দিনে কেরোসিনের অপচয় করত না ওরা। অন্ধকারে যারা মাছ ধরে পথ চলা তো তাদেয় কাছে কিছুই নয়।

তবু বরাতিয়ার বিশ্বাসদের বাগানের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় একটু গাটা ছমছম করে। একদিকে আম জাম কাঠালের ঘন বাগান, অন্যদিকে কসাড় বাঁশ ঝাড়। আর এমন জায়গায় ভুত পেত্নী তো থাকবেই। ওরা আজ সংখ্যায়ও কম। তবে ভয়ের কিছু নেই। হাতে লণ্ঠন আছে। আগুন থাকলে ওরা আসবে না।

মাথায় মাছের খালি ঝাঁকা তার মধ্যে বসার পিঁড়ি, জল রাখার সরা দেলকো এই সব টুকিটাকি, সামান্য কিছু সওদাপত্রও আছে। হাতে লণ্ঠন। ফলে দাঁড়িয়ে পড়ে দেহ না ঘুরালে পথের দু'দিকে তাকান যায় না।

জেলেরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে আসছে। কালাচাঁদ বলছে জানিস ভোলা, কাল সদরে গিয়ে দিয়ে এলাম এক নম্বর ঠুকে। নায়েব মশাই বলছে, ঐ বাঁধ কাটাব তবে আমার নাম হরিশ চাটুজ্যে। শিগগির সমন আসছে মামলার দিন পড়বে।

বনমালী বলে, দেশের চাষীদের সাথে ঝগড়াঝাটি করে কি ভাল হবে! এখনও ভেবে দেখ দাদা।

আরে দূর তোর অত ভয় কিসের। ঐ কেষ্টঠাকুরকে তাড়াতি পারলি চাষারা কেউ ধারের কাছেও ঘেসতি সাহস পাবে না। প্রধান আসামী করা হয়েছে ঐ

কেষ্ট ঠাকুরকে। কামালমিঞা বলেছে ম্যাজিস্টরকে ধরে কেষ্টঠাকুর যাতে এ অঞ্চলে ঢুকতি না পারে তাই করে ছাড়বে। তারপর ওর চেলা চামুণ্ডাদের এক একটা ধরবে আর টিপে টিপে মারবে।

হঠাৎ দুদিক থেকে কারা এসে ঝড়ের মত ঝাপিয়ে পড়ল। হাতের লণ্ঠন মাছের চাপ্যারী কোনটা কোথায় ছিটকে গেল। কারো হাতে কারো পিঠে, কারো মাথায় এসে পড়ল লাঠির আঘাত।

ওরে মেরে ফেললে রে, চীৎকার করে উঠল জেলেরা।

মুহূর্তের মধ্যে আততায়ীরা উধাও। যেন ভেল্কী বাজী। জেলেরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে ডালা চাপ্যারী খুঁজতে থাকে। গুরুতর জখম হয়নি কেউ কেউ। সামান্য ছড়ে ছিড়ে গেছে।

থানায় আর এক নম্বর ফোজদারী মামলা জমে। রাতের অন্ধকারে চড়াও হয়ে মার পিট।

কাকে সন্দেহ হয় ?

দু' দশজনের নাম ও দিয়ে আসতে হয়। এজাহার দেবার সময় প্রেসিডেণ্ট কামাল মিঞাও সাথে ছিল।

দারোগা মনস্থর আলির যেন সুর আলাদা। এত লোকের সংগে কি বিবাদ করে পারবে ? সন্দেহ বশে তো কাউকে গ্রেস্তার করা যায় না। বড় জোর জিজ্ঞাসা বাদ করা যাবে। আচ্ছা দেখি কি করতে পারি।

যথারীতি তদন্ত হয়েছে। বহু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, পুলিশ শাসিযেছে, ভয় দেখিয়েছে গ্রেপ্তারের।

তারপর ঘটনার গতি দ্রুত এগিয়ে চলল।

সাতদিন যেতে না যেতেই ঘাটে বাধা জেলেদের সব নৌকাগুলো উধাও হয়ে গেল। এইবার জেলেরা ভয় পেয়ে গেল। কালাচাঁদ আর কাউকে বুঝিয়ে দলে রাখতে পারে না। জেলেরা হার মেনে মামলা তুলে নিল। নিষ্কণ্টক হলো বাঁধ। জেলেদেরই বাঁধের উপর নজর রাখার ভার দেওয়া হল। চাষীরা এজন্য ওদের বছরে একপালি করে ধান দেবে। জেলেরা মহাখুসী।

কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সারা বিলের জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হল। সম্পন্ন চাষীরা বীজ ধান ধার দিল। সবুজ ফসলে সমস্ত মাঠ গেল ভরে।

আবার শুরু হোল নোতুন সংগ্রাম। তৈরী ফসল রক্ষা করার সংগ্রাম। জমিদারের খাস জমিতে ফসল ফলিয়েছে কৃষকেরা। জমিদার জোর করে কেটে নিয়ে যাবে সে ধান। চারিদিকে সাজ সাজরব। ঢাল সড়কি লাঠি সোটা নিয়ে কৃষকেরাও

তৈরী। সারাদিন পাকা ধান পাহারা দেয় কৃষকেরা। সমিতির নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক যুবকেরা সৈন্যবিভাগের শৃংখলা মেনে কাজ করে চলেছে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এড়িয়ে চলতে চায় নায়েব মশাই। বন্দুক আর লেঠেল নিয়ে হরিশ চাটুজ্যে নিজেই যায় জোছনারাতে চুরি করে ধান কেটে আনতে।

আকাশ উপচে শিশির আর জোছনা ঝরছে। খালের মধ্যে নৌকায় বসে আছেন নায়েব মশাই। হাতে গুলিভরা বন্দুক। মুখখানা খুব গম্ভীর ও চিন্তিত। নৌকায় লেঠেলদের সর্দার গুরুচরণ আর তার তিন চারজন সহকারী। এরা জমিদারের হয়ে লেঠেলগিরি করে খায়। ন্যায় অন্যায় ভালমন্দ বিচার করার দায় এদের নেই। কাউকে ধরে আনতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। বিলের ক্ষেতে নেমে গেছে পনেরো কুড়িজন অনুগত চাষী। জোর কাস্তে চালাচ্ছে। ভোরের আগে চার পাঁচ খানা নৌকা বোঝাই করে ধান নিয়ে চম্পট দিতে হবে।

অগ্রহায়ণের শেষ। রাত যত গভীর হয়ে আসছে শীত ও তত জমাট বেঁধে আসছে। নায়েবের গায়ে গলাবন্ধ গরম কোট—লেঠেলরা শীতে উসিপুষি করছে। আর ঘন ঘন বিড়ি ধরাচ্ছে গা গরম রাখতে। এরাও মাঠে নেমে কাস্তে ধরতে চেয়েছিলো। কিন্তু নায়েবের অন্ততঃ কয়েকজন দেহরক্ষী চাই।

নায়েব বলেছে, গুরুচরণ তুমি তিনচার জনকে নিয়ে ঢাল সড়কি বাগিয়ে সব সময় আমার কাছে থাকবে। বলা তো যায় না হঠাৎ যদি কোন আক্রমণ আসে।

যারা ধান কাটছে ওরাও সবাই লাঠি ধরতে জানে। দেখতে দেখতে দু' এক খানা জমির ধান কাটা হয়ে গেল। আটি আটি ধান তুলে নৌকায় এনে ভর্তি করা হচ্ছে। এমনি দু'চার রাত মাঠের মাঝ থেকে ধান চুরি করে নিয়ে যেতে পারলে মোটামুটি পুষিয়ে যাবে।

এমন সময় পরপর কতকগুলো নৌকা খালের দুদিক থেকে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। পালাবার পথ নেই।

নায়েব বললেন, গুরুচরণ চাষারা বোধহয় টের পেয়েছে, এখন কি করা যায়?

তাইতো। হুজুর যা বলেন। বলেন তো ঢালসড়কি তুলে নি। আপনার আশীর্বাদে পঞ্চাশজনের মহড়া একাই গুরুচরণ দেবে।

কিন্তু পঞ্চাশের জায়গায় যদি পাঁচশো জন হয়। জীবন নিয়ে ফিরে যাওয়া যাবে না।

দেখতে দেখতে দুদিক থেকে ওরা এগিয়ে এসে ঘিরে ধরল। নায়েব বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

কেষ্টবাবু চীৎকার করে বললেন নায়েব মশায় যা করেছেন, করেছেন, আর

হঠকারিতা করবেন না। বন্দুক নামান ! গুলি ছুড়লে বা সড়কি চালালে আপনাদের একজনকেও ওরা ফিরে যেতে দেবে না। রক্তজল করা ফসল এরা রক্ত দিয়ে রক্ষা করবে।

নায়েব বাধ্য ছেলের মত বন্দুক নামালেন। অনুগত লেঠেলদের কাছে সম্মান রাখতে জোর দিয়ে বললেন, আমি এসেছি জমিদারের খাস জমির ধান কেটে নিয়ে যেতে। চাষীরাই অন্যায় করে ঐ জমিতে ধান বুনেছে। আমরা কোন অন্যায় করিনি।

বটে, তা রাত্রে চোরের মত কেন দাদা। পেছন থেকে নানা মন্তব্য। ও শালাকে আজ বাগে পাওয়া গেছে। এই বিলের কাদায় পুঁতে দাও।

জ্যোতিষবাবু সবাইকে শান্ত করলেন, বন্ধুগণ তোমরা শান্ত হও। মাথা গরম করো না কেউ। যা করবার আমরা করছি। তারপর জমিদারের লেঠেলদের সম্বোধন করে বললেন, ভাইসব তোমরা সব চাষীর ছেলে, চাষীদের ছেড়ে তোমরা জমিদারের গোলামি আর করো না। তোমাদের চাষী ভাইদের সংগে চলে এস। জমিদার কি ভাবে অন্যায় অত্যাচার করে চাষীর জমি কেড়ে নেয়, বিলে বাঁধ বাঁধতে কৌশলে বাধ্য সৃষ্টি করে। চাষীদের সমস্ত দুর্দশার কারণ ঐ জমিদারের পক্ষ ত্যাগ করে তোমরা তোমাদের ভায়ের কাছে, চাষীদের কাছে চলে এস। চাষীরা যা পাবে তা থেকে তোমাদেরও একভাগ দেবে। তারা না খেয়ে না মরলে তোমরাও মরবে না। চাষী মজুর ঐক্য জিন্দাবাদ, কৃষক সমিতি জিন্দাবাদ।

সম্মোহিত লেঠেলরাও। পাঁচশো চাষীর সংগে কণ্ঠ মিলিয়ে জিন্দবাদ দিয়ে উঠল।

কেষ্টবাবু বললেন, গুরুচরণ তোমরা জমিদারের নৌকা ছেড়ে নেমে এস।

এতদিনের অনুগত লেঠেলরা নায়েবের নৌকা থেকে নেমে এল। ক্ষোভে দুঃখে ভয়ে নায়েবের অন্তরাত্মা খাচা ছাড়া। বেগতিক দেখে নায়েব হরিশ চাটুজ্যে আত্মসমর্পন করলেন কেষ্টবাবুর কাছে।

পাঁচ শত কৃষক ধান কাটতে লেগে গেল। সকাল হতে আরও পাচ ছ' হাজার কৃষক ওদের সাহায্যে এসে হাজির হল। পরদিন দুপুর পর্যন্ত কাজ করে সব ধান কেটে নিয়ে গেল কৃষকরা।

এদিকে জোরকরে খাস জমির ধান কাটার জন্য মামলা করে দিল জমিদার। হরিশ চাটুজ্যে অপমানের প্রতিশোধ নিলেন। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হল কেষ্টবাবু ও আরো অনেকের বিরুদ্ধে।

গা ঢাকা দিলেন কেষ্টবাবু আর তার অন্তরঙ্গ সঙ্গীরা। তিনদিন পরে বিশ্

হাজার কৃষক ত্রিশমাইল পথ হেঁটে খুলনা সদরে গিয়ে হাজির হল এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

জমিদার বারীন ঘোষ তার প্রাসাদ শীর্ষ থেকে প্রত্যক্ষ করলেন এই অভূতপূর্ব কৃষক ঐক্য। নায়েব হরিশ চাটুজ্যের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি মিটমাটের প্রস্তাব পাঠালেন।

কৃষক সমিতির প্রস্তাব মত রাজী হলেন কৃষকদের মধ্যে খাসজমি বণ্টন করতে, রাজী হলেন বাঁধবন্দীর আংশিক খরচ দিতে খাসজমির ধান নেওয়ার আগে।

কৃষক সমিতির জনপ্রিয়তা ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল পাশাপাশি পরগনায়। সাহসে সুরু হল রামাখালি নদীতে বাঁধ—সেও দোয়ানে নদী। উদ্ধার হ'ল পঞ্চাশ হাজার বিঘে জমি।

১৯৪৩ সাল। দেশব্যাপী যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। রাস্তা তৈরী হচ্ছে। তৈরী হচ্ছে সৈন্যদের ঘাঁটি এখানে সেখানে। মাথার উপর দিয়ে যখন তখন ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে রিম রিম করে। কৃষকদের ধান সিজ করে নিল সরকার। চারিদিকে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।

ফুড কমিটি হল গ্রামে গ্রামে। কেরোসিনের কন্ট্রোল কাপড়ের, কন্ট্রোল, সরকারী ধানের লোন, রেশন—দেশের মানুষ যা আগে কখনও দেখেনি।

সেবা কার্যে নেমে পড়েছে সমিতির কর্মীরা। সুবীরের কর্মস্থল হয়েছে সাহসে। সেখানে ফুড কমিটির গঠন নিয়ে সংঘর্ষ হল স্থানীয় কোয়াক ডাক্তার অধীর দত্তের সংগে। কৃষ্ণকান্ত তরফদারের বাড়ী থাকে সুবীর। কৃষ্ণকান্তও সুবীরকে জড়িয়ে রেপ্‌কেস করে দিল একটা মালো মেয়েকে বাদী খাড়া করে। গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়ায় সুবীর ও কৃষ্ণকান্ত।

কেষ্টবাবু বিপজ্জনক লোক। স্বগৃহে অন্তরীন হয়ে রইলেন সরকারের হুকুমে।

তবু কৃষক সমিতির কাজ চলে। জ্যোতিষবাবু ছুটোছুটি করেন। এস. ডি. ও কে ধরে ব্যবস্থা করেন কেরোসিনের, কাপড় ধানের লোনের।

রিণী রিলিফ কিচেন চালায় গ্রামের মেয়েদের নিয়ে। মন্মথ আর অনিল চাল ডাল সংগ্রহ করে আনে—দু তিনশ লোককে এক বেলা খিচুড়ী খেতে দেয়। পরিবেশন করে রিণী আর রাণী। মাপা বরাদ্দ—এক এক হাতা। তার বেশী কেউ পাবে না।

বোমা পড়ে চাটগায়, পড়ে কলকাতায়। দলে দলে মানুষ প্রাণ ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালায়। মানুষ আসে দলে দলে চাটগা, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুরের গ্রাম থেকে, ভয়ে, অভাবে। ক্ষুধার তাড়নায়। দলে দলে বাড়ী বাড়ী একটু ফ্যান ভিক্ষে করে ঘুরে বেড়ায়।

এরই মধ্যে গ্রামে গ্রামে কৃষক সমিতিগুলির মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলেন জ্যোতিষবাবু। প্রাণপণ চেষ্টায় যে সংহতি গড়ে তোলা হয়েছে তা যেন নষ্ট হয়ে না যায়। দিন অবশ্যই পাল্টাবে। ভাঙ্গাহালে নাবিকের মত হালে পানি না পেয়েও তিনি হতাশ হন না। সমস্ত দুর্দিনে যে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালে মনে আপনা থেকে একটা বল আসত সেই সুনয়নী দেবীও আজ নেই।

খাওয়া ঘুম নেই রিণীর। খেতে পারে না। খেতে বসলে কংকালসার সেইসব শিশু নারী বৃদ্ধের দল ভীড় করে আসে। মানুষ নয়। মানুষের প্রেতাত্মা। ঠাকুর মা নেই। বাড়ীটা রিণীর কাছে যেন বাড়ী নয়। ভাবলে অবাক লাগে এই বাড়ীতে ও জন্মছে। আজ বিশ বছর ধরে এখানেই ও বড় হয়ে উঠেছে। বাবার সংগে তার যোগ গোড়া থেকেই শিথিল। বিপত্নীক মানুষ। হাটে হাটে নৌকায় নৌকায় তার দিন কাটে। সপ্তাহে এক আধ দিন দেখা হয়। কাকা মাঠে মাঠে চাষবাসের তদারকি করে আর পাড়ায় পাড়ায় তাসপাশা খেলে সময় কাটান।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের সাথে তার ঘনিষ্ঠতা কোনদিনই গাঢ় নয়। দূর থেকে তাকে দেখে এসেছে রিণী ছোটবেলা থেকেই। মাকে মনে পড়ে না। কাকীমাও সর্বদিনই যেন দূরের মানুষ। ধমক খেয়েছে তার অনেক। আদর পেয়েছে কিনা বলা কঠিন।

সংসারে দুটি লোকের বুকের মধ্যে সে মানুষ। এক ঠাকুরমা আর এক জ্যেঠামশাই। তার একজন নেই। আর একজন যেন থেকেও নেই।

জ্যোতিষবাবু যে আজকাল কখন আসেন কখন যান রিণী সর্বদিন বুঝতেও পারে না। কোন ভোরে উঠে বেরিয়ে যান—কোন কোন দিন রিণীর সংগে দেখা হয়। তখন হয়ত তিনি বেরোবার উদ্যোগ করছেন। রিণী চা দিতে চাইলে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, না মা, এখন থাক বিকেলের দিকে তখন চা খাব। ফিরে আসি, তুমি ভেব না। দেরী দেখলে খেয়ে নেবে কিন্তু।

ছোট ঔষধের ব্যাগটা হাতে করেই যান। যেন ডাক্তারী করতে যাচ্ছেন। সেই সদা হাস্যময় লোকটা যেন বড় শান্ত, অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন। যেন সব সময় পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান এ সংসার থেকে—ঘনিষ্ট লোক জনের কাছ থেকে।

সংসারে এই লোকটার কবে বা কে ছিল এক মা ছাড়া। কোথাও গেলে মাকে না বলে যেতেন না, ফিরে এসেও মা মা করে ডাকতেন। তিনবেলা মার কাছে খেতে চাইতেন। সেই মা না থাকার শূন্যতা হয়তো কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। স্ত্রী নেই। ছেলে মেয়ে নেই। বুকে করে মানুষ করেছেন রিণীকে।

জ্ঞান হবার পর রিণী দেখছে সে জ্যেঠামশায়ের সংগে খেয়েছে, দিনের বেলায়,

জেঠামশায়ের কাছে শুয়েছে রাতে ঠাকুমার কাছে। জেঠামশাই তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, এখানে ওখানে নিয়ে গেছেন বিয়ে দিয়েছেন আর সেইখানেই আর একটা বড় আঘাত পেয়েছেন। তবু দমে যান নি। রিণীকে ডাক্তারী শিখিয়েছেন, দেশের কাজে নামিয়েছেন যাতে আর কিছু না হোক সাধারণ মানুষের সেবা করে সে জীবন কাটাতে পারে. শান্তি পায়।

সেই রিণীর কথাও যেন আজকাল ভুলেই গেছেন। না দেখলে বোধহয় মনেই পড়ে না। কাছে গেলেও যেন তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিতে পারলে বাঁচেন। ফিরতে আজকাল প্রায়ই রাত হয়। বুড়ী নেই। সকাল সকাল খেয়ে সবাই শুয়ে পড়ে। জ্যেঠামশাই-এর ভাত নিয়ে জেগে বসে থাকে রিণী। আলো জেবলে বাইরে বসে না থাকলে হয়ত ফিরে না খেয়েই শুয়ে পড়লেন। একদিন হয়ে ছিলও তাই।

অনেকদিন সুবীরেরও কোন খোঁজ খবর নেই। সে যে কোথায় আছে কেউ জানে না। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। গোপনেও তো একবার খোঁজখবর দেওয়া যায়।

জ্যেঠামশাই সুবীর সকলের প্রতি যেন একটা আকণ্ঠ অভিমান চোখের তীরে এসে আছড়ে পড়তে চায়।

বাড়ীটা যেন কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। একটা লোকের অভাবেই বোধহয় এমনি হয়ে গেল। কেউ যেন কারো সংগে নেহাৎ প্রয়োজন ভিন্ন কথাবার্তা বলে না। কমলা তো কথাই বলে না। কাজকর্ম যা পারে করে। তারপর ছেলেমেয়ে দুটিকে খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে গিয়ে ঘরে দরজা বন্ধ করে দেয়। কাকীমা আগের মতই। সংসারের সব কাজ মুখ বুজে ঠেলে যাচ্ছে।

দুপুরে রান্না করে কমলা। রাত্রে কাকীমা। রিণীর ফিরতে কোনদিন দেড়টা দুটো। কোনদিন আড়াইটা তিনটাও হয়ে যায়। ওদের ভাত হাড়ীতেই থাকে। চান দান করে ও আর রাণী নিজেরাই ভাত বেড়ে খেয়ে দেয়ে নেয়। খাওয়া মানে দু'চার বার মুখে দিয়ে উঠে পড়ে। থালার ভাত যারা ফ্যান ফ্যান করে চেচাচ্ছে তাদের এক এক মুঠো দিয়ে দেয়।

বাইরে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন মতে সময় কেটে যায়। মন্মথ, অনিল, বিষ্টু, সুবল—ওদের সংগে কিচেন চালান। নিয়ে শলাপরামর্শ করা। ওরা বিকেলে বিকেলে গিয়ে কলেকশন করে আনে। সরকার থেকেও নোঙ্গর খানার জন্য কিছু কিছু চাল ডাল বরাদ্দ হয়েছে। পাঁচ ছয় জন মহিলা কর্মী আছে। খিচুড়ী তারাই রান্না করে। কিন্তু মালপত্রের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়। নৈলে মুহূর্তে চুরি হয়ে যাবে। ছেলেরা বাইরে পাহারা দেয়। নতুবা লুট হয়ে যেতে.

পারে কিচেনের সামগ্রী। পরিবেশনটা রিণীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে করতে হয়। না হলে দশ জনের খাদ্য একশ জনকে না দিতে শেষ হয়ে যাবে।

রাণীকে আজকাল রিণী তার সর্বক্ষণের সঙ্গী করে রেখেছে। ঠাকুমা মারা যাবার পর থেকে সে কোন দিন আর বাড়ীতে থাকে না। খাওয়া শোওয়া সব রিণীর সাথে। ওকে না পেলে রিণী আজ কি করে বেঁচে থাকত ভাবতেই পারে না।

রাত্রে শুয়ে পড়লে রাণীর তক্ষুণি ঘুম এসে যায়। রিণীর ঘুম পায় না। সে ঘুমুতে পারে না। জ্যোতিষবাবু কখন আসবেন ঠিক নেই। বাবা যদি কোনদিন রাত্রে ফিরে। উঠে গিয়ে তাকেই খাবার দিতে হবে। এ লোকগুলো একদিন বাড়ী ফিরে যাকে মা বলে ডেকে উঠত তার জায়গায় আজ সে ছাড়া আর সাড়া দেবার কেউ নেই। সে সাড়া না দিলে ওরা না খেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়বে।

রাণী ঘুমিয়েছে। তবু ও কাছে আছে। ও না থাকলে ঘরে বাইরে এই প্রাণান্ত-কর নিঃসংগতা কি করে সহ্য করত ও। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সস্নেহে ও ঘুমন্ত রাণীকে জড়িয়ে ধরে।

॥ ১৯ ॥

দেখতে দেখতে প্রায় এক দেড় বছর কেটে গেল। লাখ খানিক লোক মারা গেছে দুর্ভিক্ষে। দেশটা কালাজ্বরের রোগীর মত—বুকের পাঁজর বের করা, চোখ বসা, পেট মোটা, নীলশিরাগুলো ভাসা—লাঠি ঠক ঠক করে চলেছে।

তবু এরই মধ্যে একটা ঋতু পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু হল শুধু গোটা দেশে কেন, গোটা বিশ্বে। মহাযুদ্ধ থেমে গেছে। হিরোসিমা, নাগাসাকি দুটো বড় বড় শহর দুটি মাত্র বোমার আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পৃথিবীকে যুদ্ধের বিপদ থেকে এই ভয়াবহ মারণাস্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার উপায় বের করতে বড় বড় রাষ্ট্রের মাথাগুলো সব এক হয়েছে স্যান ফ্রানসিসকো শহরে।

তবে সারা দেশে একটা চাপা ক্ষোভ—একটা হায় হায়। এত বড় একটা সুযোগ সরে গেল দেশটা স্বাধীন হবার। সুভাষ বসুর আজাদহিন্দ বাহিনী এসেছিল মণিপুর পর্যন্ত। স্বাধীনভারতের পতাকা ওরা গেড়েছিল মণিপুরে। সে কথা দেশের লোক জানতেই পারেনি।

কৃষক সমিতির কাজ আবার পুরো উদ্যমে সুরু হল। কেষ্টবাবু ফিরে এসেছেন। সুবীর ফিরে এসেছে, এতদিনের এলোমেলো সমিতিগুলোকে ঝেড়েঝুড়ে চাঙা করে

নিয়ে একটা বড় রকমের সম্মেলন করতে হবে। তারপর সেখান থেকে কর্মসূচী নিয়ে সুরু হবে নোতুন কাজ নোতুন সংগ্রাম।

স্থির হ'ল সাহসে অর্থাৎ সুবীরের কর্মস্থলে করতে হবে প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন। কর্মীরা সব বেরিয়ে পড়ল প্রাথমিক কাজের ভার নিয়ে—চালডাল সংগ্রহ চাঁদা সংগ্রহ, বড় বড় নেতাদের সংগে যোগাযোগ। দিনস্থির করে প্রচার পত্র ছাপা, বিলি করা, রসিদ বই ছাপা, গ্রামে গ্রামে বৈঠক করা, গোলপাতা, বাঁশ খড় সংগ্রহ করা —এমনি বিবিধ কাজ। একমাস আগে থেকে গিয়ে ক্যাম্প করে থাকতে হবে একদল সর্বক্ষণের কর্মীকে।

এতবড় সম্মেলন এ জেলায় কখনো কোথায়ও হয় নি। কাজেই কর্মীদের অভিজ্ঞতার অভাব ও দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ সচেতন করে দিয়ে গেছেন কেষ্টবাবু। ওরে এ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের অভাব কারো নেই। মন্মথ সুবীর, অনিল, সুবল, রিণী, মণিরুদ্দী সামসুদ্দীন—সবাই মহা উদ্যমে লেগে গেছে। জ্যোতিষবাবুও আবার তার পূর্ব প্রকৃতিতে ফিরে এসে দ্বিগুণ উদ্যমে কাজে নেমেছেন।

সাহসে সম্মেলন করার আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। এখানকার জমিদার সুধীন মিত্র খুব কঠিন লোক। হাবভাবে যা বোঝা গেছে তাতে এখানে ঘাস জমির ধান কেটে তোলা মোটেই সহজ হবে না। বাঁধ বাঁধতে বিশেষ কিছু বাধা আসে নি বটে, কিন্তু ধান তিনি চাষীদের নিয়ে যেতে দেবেন না। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ানো দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদার সুধীন মিত্র নিজেই জমিদারীর সব কাজ দেখাশোনা করেন। পুলিসের সাহায্যে তিনি সমস্ত ধান কেটে নিজের খামারে তুলবেন বলে এখন থেকে শোনা যাচ্ছে। তাই সাহসে সম্মেলন করে কৃষকদের ঐক্য ও শক্তির বহর তাঁকে দেখিয়ে রাখাও একটা উদ্দেশ্য। তা বাদে সুবীরের এলাকার সংগঠনও খুব ভাল। স্থানীয় সংগঠন খুব ভাল না হলে এত বড় সম্মেলন সফল করাও কঠিন।

দূরাগত প্রতিনিধিদের থাকার জন্য অস্থায়ী চালা তৈরী হল। হোগলা দিয়ে ছাওয়া, হোগলা দিয়ে ঘেরা অস্থায়ী স্নানাগার পায়খানা। একটা গ্রাম্য শিল্প মেলা চলবে ঐ সাথে। দোকানপাট বসবে সব এক এক ধারে। রাত্রে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা হল। গ্রাম্য যাত্রা, বালক কীর্তন, কবি, জারী—এক একদিন এক এক রকম হবে। হাডুডু, কুস্তি ও লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা হবে সকালের দিকে। মূল সম্মেলনের কাজ তিনদিন ধরে চললেও, সব মিলিয়ে মোটামুটি সাতদিনের প্রোগ্রাম।

বিভিন্ন স্থান থেকে বিশেষ করে খুলনা শহর থেকে সম্মেলন স্থল অবধি বাইরের

প্রতিনিধিদের নিয়ে আসার জন্য দিনরাত বড় বড় নৌকো সম্মেলনের পতাকা উড়িয়ে যাতায়াত করেছে। স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করে নৌকোয় তুলে দিয়েছে। প্রকাশ্য সম্মেলনের দিন সকাল পর্যন্তও দু'-একখানা নৌকা ছিল—সে দিন পর্যন্তও কিছু লোক এসে পৌঁছেছিলেন।

১৯৪৬ সালে খুলনার মাটীতে এমন কতকগুলি প্রস্তাব গৃহীত হল এই সম্মেলনে যা কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লাঙ্গল যার জমি তার আজকের এই সুপরিচিত শ্লোগানের জন্ম হল এই সম্মেলনে। সূত্রপাত হল তেভাগা আন্দোলনের। চাষী পাবে উৎপন্ন ফসলের তিনভাগের দুইভাগ, মালিক পাবে একভাগ। এই সম্মেলনে আওয়াজ উঠল নিজের খামারে ফসল তোল, জান দেব তবু ধান দেব না।

এই সম্মেলনই স্পষ্ট করে বলে দি. আসন্ন ফসল তোলার মরশুমে জমিদারের সংগে চাষীদের চরম লড়াই। চাষীরা বুঝতে পেরেছে এবং সম্মেলনে তা খুব পরিষ্কার করে আলোচনাও করা হয়েছে যে এই সংগ্রামে হেরে গেলে চাষীদের আবার অনেক পিছিয়ে যেতে হবে? জমিদারও বুঝতে পেরেছে এই সংগ্রামে চাষীরা জয় হলে জমিদারের দিন শেষ।

শোনা যাচ্ছে খুলনা দক্ষিণ অঞ্চলের জমিদাররা পরস্পরের সংগে যোগাযোগ করে একযোগে সরকারের সাহায্য ও নিজেদের শক্তি নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। কথায় কথায় কেষ্টবাবু রিণীকে বললেন—তথাপি ওরা জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। তাই সরকারকে ধরে সর্বাগ্রে আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করিয়েছে।

আসন্ন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে মালোপাড়ার একান্তে সেই জীর্ণ কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিন কেষ্টবাবু আরও অনেক কথা বললেন রিণীকে।

সপ্তাহ তিনেক আগে এই অঞ্চল থেকে সম্মেলন সেরে ফিরে গেছে সব কর্মীরা। ফিরে গেছে রিণী জ্যোতিষবাবু। যায়নি সুবীর। কারণ এ অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত কর্মী সেই। সম্মেলনের শেষে আরও অনেক কাজ করতে হবে। সব গুছিয়ে শেষ করে তবে একবার দু'চার দিনের জন্যে বাড়ী থেকে ঘুরে আসবে—এমনি কথা ছিল। আর ছিলেন কেষ্টবাবু। যুদ্ধ যখন এই অঞ্চলেই বাধবে এবং তা অল্পদিনের মধ্যেই তখন এ ক'দিন তাকে এ অঞ্চল ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

কিন্তু সম্মেলন শেষ হতে না হতেই আশপাশের গ্রামে দেখা দিল কলেরা। কয়েকদিনের মধ্যে বেশ কিছু লোক মারা গেল। এমন অবস্থা যে মৃতদেহের সৎকার করার লোক ডেকে পাওয়া যায় না। সুবীর আর কেষ্টবাবু সমিতির কিছু কর্মীকে সাথে নিয়ে কলেরা রোগীর সেবায় লেগে গেলেন।

কুসংস্কার আর অজ্ঞতা। ঔষধপত্র নেই, ডাক্তার নেই—শুধু মনের জোরে এই মারাত্মক ব্যাধির সংগে লড়াই করে একে আয়ত্ত আনা সহজ কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত রোগ আয়ত্তে এল বটে, কিন্তু সুবীর পড়ে গেল। মালোপাড়ার একপ্রান্তে এই জীর্ণ কুড়ে ঘরে অতিকষ্টে ওকে স্থানান্তরিত করে আজ পাঁচ ছয়দিন চিকিৎসা চলছে। কেষ্টবাবু নিজেই স্যালাইন দেওয়া থেকে রোগীর সেবা শুশ্রূষা সবই করেছেন।

কিন্তু আজ দুদিন হয়েছে বিপদের উপর বিপদ। কেষ্টবাবু নেই। অর্থাৎ থেকেও নেই। গ্রেপ্তারী পরওয়ানার খবর পেয়ে গা ঢাকা দিয়েছেন। তবু পুলিশ এসে তাকে খুঁজে গেছে। খবর পেয়েছে তিনি সরে পড়েছেন। এই কলেরার রাজ্যে পুলিস ও দায়সারা করে ঘুরে গেছে। তাদেরও তো প্রাণের মায়া আছে। বলতে বলতে হাসছিলেন কেষ্টবাবু।

রিণী বলল, পুলিসের আর দোষ কি। আমিই আপনাকে চিনতে পারিনি। আমি তো রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কেষ্টবাবু আবার হাসলেন। বললেন, এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সুবীরকে তো ছেড়ে যেতে পারি না। কার উপর ছেড়ে যাব। পুলিশ খবর পেয়েছে আমি এই অঞ্চলে কলেরা রোগীর সেবা করে বেড়াচ্ছি। আমাকে এখানে পাওয়া যাবেই।

একটু চুপ করে থেকে বললেন তবে সাধারণ লোক খুব সাহায্য করেছে। ঘরে লুকিয়ে পুলিশকে বলে দিয়েছে, তিনি ছিলেন বটে, তবে দিন দুই আগে পুলিশ তাকে ধরবে শুনে কোথায় চলে গেছেন।

আর বাঁচিয়ে দিয়েছে এই ছদ্মবেশটা। খুব যত্ন করে এই বিদ্যেটা শিখেছিলাম যখন সন্ত্রাসবাদী দলে ছিলাম। এবার খুব কাজে লেগে গেল। তবু পুলিশের সন্দেহ যায় নি। আমি এই অঞ্চলেই গা ঢাকা দিয়ে আছি মনে করে তারা খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আজ রাত্রেই এখানে আসার কথা।

তাই নাকি!

ভয় পাবার কিছু নেই। ওরা যখন আসবে তখন আমি জেলার সীমা পেরিয়ে হয়ত যশোরের কোন গ্রামে উঠে বিশ্রাম করতে পারব। আর সেই জন্যেই তো তোমাকে আনা।

দুটি লোক আজ সকালেই কেষ্টবাবুর একটা চিঠি নিয়ে গিয়েছিল জ্যোতিষবাবুর কাছে। কেষ্টবাবুর চিঠি, এদের সাথে রিণীকে এই মুহূর্তে পাঠিয়ে দেবেন। চিন্তার কোন কারণ নেই।

তখনই রিণী রওনা হয়েছে। লোক দুটির সাথে একটা ছোট নৌকা ছই দেওয়া। ঐ নৌকোয় করে রিণী এসেছে বিলের মধ্য দিয়ে খালে খালে। আসতে আসতে ভেবেছে আকাশ পাতাল। কি হতে পারে। কেন কেষ্টবাবু নিতে পাঠিয়েছেন। কলেরা হয়েছিল ওদিকে। তবে কি? রিণীর মনটা কেঁপে উঠেছে। আবার ভেবেছে, না, তা হলে সে কথা তিনি লিখতেন একটু আভাসে ইঙ্গিতে। আর তা হলে রিণীকে কেন জ্যোতিষবাবুকেই ডেকে পাঠাতেন। তিনি হাতুড়ে হলেও একটু ডাক্তারী করেন। তারই তো বেশী প্রয়োজন।

বাড়ী থেকে খেয়ে বেরিয়েছিল। লোক দুটিকেও খাইয়ে নিয়ে এসেছিল। তবু লোক দুটি বললে, কিছু চিড়ে মুড়ি খাবার সংগে নিতে হবে, বাবু বলে দিয়েছে। লোকগুলো নদীতে পড়লে একটু তাড়াতাড়ি আসতে পারত। কিন্তু এল না। বললে বিলের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, বাবু বলে দিয়েছে। কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পেয়েছিল রিণী। বিলের ভিতর মাঝে মাঝে লোকগুলো অযথা দেরী করেছে। যেভাবে কেষ্টবাবু ওদের তাকে নিয়ে পাঠিয়েছেন, লোকগুলোর আচরণে তেমন কোন ব্যস্ততার চিহ্ন ছিল না। রিণী ওদের কয়েকবার তাড়া দিয়েছে। ওরা গ্রাহ্যই করেনি। শুধু বলেছে, কোন ভয় নেই, দিদিমণি। বাবু যেমন বলে দিয়েছে, আমরা ঠিক সময়ে নিয়ে যাব। আর আমরা থাকতে তোমার কোন ভয় নেই। এই গুরুচরণের জান কবুল।

বিশ্বাস করেছে রিণী। কিন্তু আরও হতে পারে নি। রহস্য ঘনীভুত হয়েছে। পরিষ্কার হয় নি কিছু। ওরাও কিছু বলতে চায় নি। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বাবুর দোহাই দেয়, ওরা যেন কিছুই জানে না। তবে এটুকু খবর পেয়েছে যে কলেরা এখন প্রায় থেমে গেছে। কেষ্টবাবু ও সুবীর রাতদিন কলেরা রোগীর সেবা করেছে। লোকে তো এখন ওদের দেবতার মত দেখে।

ঠিক সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসছে এমন সময় ওরা খাল ধারে একটা ঝোপের আড়ালে এনে নৌকা বাঁধল। গুরুচরণ বলল, ওঠ দিদিমনি আমরা আসে গেইছি।

চারিদিকে ঝোপজঙ্গল। একটু দূরে মালোপাড়ার ছোট ছোট কুড়ে ঘর। এক ধারের একটা ভাঙ্গা কুড়ের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে গুরুচরণ বললে, ঐ যে ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওখেনে যাও। আমরা এটু পরে যাচ্ছি।

রিণী পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। কিন্তু এবার যেন আর সাহসে কুলাতে চায় না। ধারে কাছে লোকজন নেই। এ রকম জায়গায় তাকে এনে তোলার উদ্দেশ্য কি। লোক দুটোও কোথায় সরে পড়ল।

ঘরটার কাছাকাছি এসে থমকে দাড়াল রিণী। ওদিক থেকে একটা লোক আসছে

মনে হয়। ভাবছে ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখবে কেষ্টবাবু কোথায় থাকেন। তার কথা সবাই জানবে নিশ্চয়ই।

লোকটা ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। মুখে এক মুখ কাচাপাকা দাঁড়ি। পরনে লুঙ্গি। গায়ে একটা আলখেল্লা। কাধে গামছা। মাথায় টুপি। হাতে একখানা লাঠি কাধে ঝোলা। কোন মুসলমান মুসাফির, বা ফকির। ভিক্ষে করে ফিরছে। হা, ভগবান এ কি করে কেষ্টবাবুর আস্তার কথা জানবে।

লোকটা রাস্তা ছেড়ে কুড়েটার কাছাকাছি দ্রুত পায়ে রিণীর দিকে এগিয়ে আসছে। সারাদিন নৌকায় বসা, একটা অজানা উদ্বেগ, তারপর আসন্ন সন্ধ্যায় এই অজানা জায়গায় অনিশ্চিত পরিস্থিতি—সব মিলে রিণী যেন ঘাবড়ে যাচ্ছে।

কাছে এসেই লোকটি পরিচিত অভ্যস্ত গলায় বললে এই যে রিণী মা, এসে গেছ। বাঁচালে। এখন তোমার জিনিষ তোমার হাতে দিয়ে সরতে পারলে হয়।

রিণী চমকে ওঠে। এ কি সেই কেষ্টবাবু। একেবারেই চেনা যায় না। আর ওকি কথা বলছেন।

রিণীর মনটা যেন আছড়ে পড়ে। কাকু, আপনি এ কি সব বলছেন।

কেষ্টবাবু যেন একটা ভাবের ঘোরে আছেন। রিণীর দিকে তার লক্ষ্য নেই। নিজের মনে বলে চলেন, দেখ মা, একটা আদর্শ নিয়ে জীবনে চলা বড় কঠিন। তার জন্য একটা জীবন্ত প্রেরনা চাই। সেই প্রেরণার উৎস করে যে কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে। সমস্ত লোভ আর মোহের উর্ধে সেই প্রেরণার স্থল যিনি তিনিই তো এই জীবনের কেন্দ্র। যে স্ত্রী সেই প্রেরণাদাত্রী হয় তিনি সহধর্মিনী। স্ত্রী না হলেও সহধর্মিনী হওয়া চলে। কাজটা আরও কঠিন। অনেক কান্নার ক্যানভ্যাসে জীবনের সার্থকতার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে হয়। তোমার কাছ থেকে সুবীর যেন সর্বদা আমাদের সংগ্রামী প্রেরণা পায়। তোমার কাছেই ওকে রেখে গেলাম। ওকে রক্ষা করো।

এ সব আপনি কি বলছেন কাকু? আপনার কি হয়েছে? আপনি অমন করে কথা বলছেন কেন?

রিণীর কোন কথা কেষ্টবাবুর কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। তিনিই বলেই চললেন, দেখ মা, তোমাদের সংগে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না।

ওকি অলুক্ষুণে কথা এই ভর সন্ধ্যেবেলায়!

না, না। ও সব কিছু নয়। বলছি কি জানো। একটা ঝড়ের গন্ধ পাচ্ছি। কিছুদিন হয়ত আমাদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। সেই সময় মাটীর নীচে সংগঠনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সুবীর যেন পালন করার চেষ্টা করে।

অবশ্য সে সময় আসতে এখনো কিছু বাকী আছে। তবে আসবেই তেমন সময় একদিন।

তা হলে—

না মা, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের সংগ্রাম — এর মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্থান নেই। সংগ্রাম আমাদের করে যেতেই হবে, জয়ী আমরা হবই মানুষের জয়, জনতার জয় অবশ্যম্ভাবী। তা আজ হোক আর কাল হোক।

রিণী কোন কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কেষ্টবাবুকে এতদিন দেখছে। কিন্তু এর এমন মূর্তি সে কোনদিন দেখেনি। এমন করে কথা বলতেও শোনেনি কখনও। গলার স্বরটা নিতান্ত চেনা না হলে, কেষ্টবাবু বলে ও স্বীকার করত না।

রিণীর মাথায় হাত দিয়ে আবার বললেন, ভয় কি মা, আমরা একটা অত্যন্ত পবিত্র কর্তব্যে ব্রতী হয়েছি। এ ব্রত আমরা এ জন্মে শেষ না করতে পারি, জন্ম-জন্মান্তর ধরে সাধন করে যাব। আবার আমি আসব, আসব তোমাদের মাঝে, তোমাদের নিয়ে মাটি কাটব। বাঁধ বাধব ঝিলে নদীতে, বাঁধ বাধব, নবেকীতে, বাঁধ বাঁধব সন্ন্যাসীর খালে। সংগ্রাম করব, জমিদা রের বিরুদ্ধে, মহাজনের বিরুদ্ধে, ধনী ব্যবাসয়ীর বিরুদ্ধে, রাজনীতি সমাজনীতির তথাকথিত নেতাদের বিরুদ্ধে, কুসংস্কার, রোগ, অজ্ঞতা দারিদ্র্য ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধে। এখনও অনেক কাজ বাকী—এখনও অনেক দূর, অনেক পথ যেতে হবে।

হঠাৎ কেষ্টবাবুর যেন ঘোর কেটে গেল। তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। অদূরে জীর্ণ কুটিরটার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ঐ ঘরে সুবীর আছে। এখন বোধহয় ঘুমাচ্ছে। ভাল হয়ে গেছে। তবু সাগু বার্লি ছাড়া কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। তুমি বাড়ী নিয়ে গিয়ে কালপরশু নাগাদ অন্নপথ্য করাতে পারবে। সেটা জ্যোতিষদা যেমন ভাল বুঝবেন।

আজ ক'দিন হ'ল ?

আজ সাত দিন। সে সব পরে শুনতে পাবে। আমি দেরী করব না তুমি ঐ ঘরে চলে যাও। কয়েক মিনিটের মধ্যে ওর জন্যে গরম গরম বার্লি তৈরী করে নিয়ে আসবে একটি মেয়ে। তারপরই আসবে দু'জন লোক। তারা সুবীরকে নিয়ে নৌকায় তুলবে। তুমি তাদের সংগে নিশ্চিন্তে চলে যাবে। নৌকায় মোট চার জন মাঝি থাককে। কোন ভয় নেই। আমার আর অপেক্ষা করার সময় নেই। আমি চললাম। ভালকথা সংঙ্গে খাবার আছে খেয়ে নিও। খালি পেটে থেকো না। এখানকার কোনকিছু খেয়ো না। রিণী কোনমতে একটা প্রণাম সেরে নিল। কেষ্টবাবু রিণীর মাথায় হাত রেখে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। রিণী টিপে টিপে সেই ভাঙ্গা কুড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল ভাল করে ভেতরটা দেখা যায় না। বাঁশের খুঁটির উপর দুটো তক্তা বেঁধে খাটের মত করা। তার উপর সুবীর শুয়ে।

পায়ের শব্দ পেয়ে সুবীর অস্ফুট কাতর স্বরে বললেন, কে?

রিণী কোন কথা বলে না। এগিয়ে গিয়ে সেই তক্তার উপর বসল। হাত দিল ওর মুখের উপর। বলল, কেমন আছ?

ভাল। তুমি কখন এলে।

এই তো একটু আগে। বাইরে কেষ্টদার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

কোথায় তিনি?

তিনি চলে গেলেন আপাততঃ আর দেখা হবে না।

হুঁ, অদ্ভুত মানুষ। উনি না থাকলে বাচতাম না। তোমাদের সংগে আর দেখা হত না।

কথাটা যে কি ভয়ংকর সত্যি তা রিণী বুঝতে পেরেছে। ওর চোখে জল এসে যায়। ও সহসা কিছু বলতে পারে না। সুবীরের শীর্ণ হাতটায় হাত বুলাতে থাকে। একটু সামলে নিয়ে বলে, আমাদের একটা খবর দিল না কেউ, এত কর্মী থাকতে। রিণীর স্বরে একটু ক্ষোভ।

সুবীর সহসা কিছু বলে না। একটু পরে আস্তে আস্তে বলে, আমি বলেছিলাম, কেষ্টদা রাজি হন নি, বললেন যখন যেটুকু করা দরকার করব তোমাকে ভাবতে হবে না।

কার পায়ের শব্দ। রিণী সচকিত হয়ে ওঠে। সুবীর ওকে উঠতে দেয় না। হাতটা ধরে রাখে। বলে, ও বিমলা পক্কা জেলের বউ। আমার পথ্য করে দিয়ে যায়। কেষ্টদা ওকে সব শিখিয়ে দেছেন।

এক হাতে কেরোসিন কুপি, আর এক হাতে এক বাটি-বার্লি নিয়ে এল বিমলা। এসেই যেন ভুত দেখে দাড়িয়ে গেল।

সুবীর বললে এস বিমলা, তুমি চিনতে পারছ না। সেই দিদিমনি যে সভার ক্যাম্পে থাকত।

অত কি বিমলা দেখেছে। বিমলা রিণীর দিকে চেয়ে রইল। হয়ত চিনতে পারে কিনা দেখছে।

রিণী বললেল, দেখছ কি, তোমার দাদাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আর তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।

কষ্ট কি কও, দিদি। এতে আমাগো কষ্ট হয় না। দাদা আমাগো জন্যি কত করে। কত মানুষ ওলায় মরে যা তো দাদা না থাকলে।

বার্লির বাটিটা ওর হাত থেকে নিতে রিণী বলে তোমরা অনেক করেছ ওর জন্যে। তোমাদের ঋণ শোধ হবে না।

সুবীরকে আস্তে আস্তে ধরে তুলে বসাল রিণী। তারপর বার্লির বাটিটা ওর মুখে তুলে ধরল।

বিমলা চলে যাচ্ছিল। সুবীর বললে, দাঁড়াও। আমি চলে যাব, বিমলা। দু' একটা জিনিষ যা থাকবে তুমি এসে নিয়ে যেও। আলোটা রেখে যাও।

সুবীর একটু বসতে চাইল। রিণী ওকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল।

॥ ২০ ॥

প্রাদেশিক সম্মেলনে কৃষকরা প্রতিজ্ঞা করেছিল, জান দেব তবু ধান দেব না। সে সে প্রতিজ্ঞা কৃষকরা রক্ষা করেছে—গুরুচরণ মণ্ডল পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। ধানও দিতে হয়েছে।

জমিদার পূর্বেই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কেষ্টবাবুর উপর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা। তিনি পালিয়ে আছেন। পালিয়ে আছেন আরো অনেকে। সুবীর স্বগৃহে অন্তরীন, যদিও তার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। তবু তাকে ছাড়া হয় নি। যদি গিয়ে হাজির হয়।

স্থানীয় তরুণ কর্মীরা এত বড় সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিল। এবং তাদের ধৈর্য ও স্থির বুদ্ধির অভাব হয়নি। কিন্তু ওর বেশী কিছু করার ছিল না। করতে গেলে শত শত লোকের প্রাণ যেত। এ ও গেছে মাত্র একজনের। কেষ্টবাবু মাটীর তলা থেকে নির্দেশাদি দিয়েছিলেন, কিন্তু সামনে এসে দাঁড়াতে পারেন নি।

প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক এসেছিল ধান কাটতে। এদের মধ্যে এক দল লেঠেলও ছিল। ওদিকে জমিদারের দিকে ছিল দু'শ সশস্ত্র পুলিস ও বিশ পঞ্চাশজন অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি।

তথাপি হয়ত ধান জমিদার নিজের খামারে তুলতে পারত না। কিন্তু কৃষকদের মধ্যেই একদল জমিদারের খামারে ধান তোলার পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়াল। এদের সঙ্গে জমিদারের লোকের গোপন যোগাযোগ ছিল বলে পরে বোঝা গেল। এক কথায় জমিদার সুধীন মিত্র কুট নীতিতে হারিয়ে দিল কৃষকদের। আর সে হারান সম্ভব হল নেতৃস্থানীর ব্যক্তিদের অনুপস্থিতিতে।

সারা দেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খারাপ হয়ে উঠল দিন দিন। মুসলীম

লীগ তীব্র সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছে সমস্ত দেশে। সমিতির প্রধান কাজ এই অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। হিন্দু মুসলমান কৃষকদের মধ্যে ঐক্য বজায় থাকলে জমিদার একদিন হটে যাবেই, আজ হোক আর কাল হোক।

সুবীরের শরীর এখনও ঠিক আগের মত হয় নি। অনেকদিন থেকে অতিপরিশ্রম আহার নিদ্রার অনিয়মের ফলে ভেতরে ভেতরে শরীরটা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তারপর সেই মারাত্মক ব্যাধি। সুবীর বলে, আমার নবজন্ম হয়েছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা হিককা চলার পরও যে কেউ বেচে ওঠে এটা বড় দেখা যায় না। একদিন রাত্রে খুলনা থেকে কেণ্টবাবুর বন্ধু এক ডাক্তার এসে দেখে ঔষধপত্র ব্যবস্থা করে গেলেন। বলে গেলেন আর বার ঘণ্টা কাটলে আর ভয় নেই।

জ্ঞান ছিল আগাগোড়া। সবই সুবীর জানছে, বুঝতে পারছে। আর সেইটাই ছিল মর্মান্তিক কষ্ট। মানুষ অজ্ঞান হয়ে থাকে, কি হচ্ছে না হচ্ছে বুঝতে পারে না, কোন কষ্টের অনুভূতি থাকে না—সে তো অত্যন্ত, সুখের মৃত্যু। কিন্তু তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারছি বাঁচার আশা নেই। নিশ্চিত মৃত্যু তার বীভৎস লোমশ কালো হাত দুটো দিয়ে আমার গলা টিপে ধরতে আসছে। অথচ চীৎকার করার উপায় নেই, কান্নার উপায় নেই, সব সময় কেণ্টবাবু কাছে কাছে আছেন। কোন দুর্বলতা প্রকাশ মরে গেলেও করা চলবে না। যারা বীর যোদ্ধা তারা তো হাসতে হাসতে মরবে।

যোদ্ধারা বোধ হয় আর মানুষ থাকে না। কেবল মর, আর মার। এর মধ্যে মধ্যে চিন্তার অবসর কোথা? সে এমন একটা রাজ্য যেখানে শ্যামলিমার লেশমাত্র নেই। সেই ঊষর মরুভূমিতে—অনুভূতি অঙ্কুরিত হবে কোথায়? ছেলে বউয়ের ফটো পকেটে গুজে সে বের হল হাজার হাজার বউকে স্বামীহীন আর ছেলেকে পিতৃহীন করতে সেই তো যোদ্ধা।

সেই যোদ্ধাদের সঙ্গে এই যোদ্ধাদের যে অনেক পার্থক্য। সেই যোদ্ধাদের কাজ মানুষ মারা। এদের কাজ মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে বাচান। যারা পরোক্ষভাবে তিলে তিলে মানুষকে মেরে চলেছে সংগ্রাম করে তাদের হঠিয়ে দেওয়া।

এদের অনুভূতি আছে। স্মৃতি আছে। কোন প্রিয়জন কাছে নেই। দূরে গ্রাম প্রান্তে একখানা ভাঙ্গা কুড়ে ঘরের মধ্যে একান্ত অসহায় এক ব্যক্তি সজ্ঞানে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা রোগে সে আক্রান্ত যার নাম শুনলে অনাত্মীয় কেউ ধারের কাছে আসবে না। নিতান্ত কর্তব্য বলে এক আধজন লোক যে সেবাটুকু না করলে নয় তাই করে যায়। অসংস্কৃত ভাঙ্গা ঘরের মধ্যে যে একটা গুনোধর গন্ধ তার সঙ্গে লাইজল ফিনাইলের গন্ধ মিশে গোটা ঘরটা ম ম করছে।

কেউ সেই নরকে ঢুকতে চাইলে যেন গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। আর আমি তার মধ্যে পড়ে খাবি খাচ্ছি। সুবীর হাসতে হাসতে বর্ণনা দেয়।

রিণী কিছু না বলেই উঠে চলে যায়। সুবীর বুঝতে পারে—এ বর্ণনা ওর না করাই উচিৎ ছিল। ও একটু অনুতপ্ত হয়ে ওঠে।

সেদিন রিণীর বুকে ওর ক্লান্ত মাথাটা রেখে ও হেলান দিয়ে বসেছিল যতক্ষণ। না গুরুচরণদের পায়ের শব্দ শোনা গিয়েছিল। কথা বেশী কিছু হয় নি। কারণ তার শক্তি ও প্রয়োজন কিছুই ছিল না। রিণীর গায়ের আর শাড়ীর গন্ধ ওর কোমল হাতের স্পর্শ আর সবশেষে একফোটা নোনা জল ওর মাথায় পড়ে জানিয়ে দিয়েছিল যাবতীয় তথ্য আর তত্ব যার পরে কিছু বলার বা শোনার থাকে না।

গুরুচরণের কথা ওর বড্ড বেশী করে মনে পড়ে যায়। ও ছিল ওর ডান হাত। সাহস এলাকার সংগঠনের সমস্ত কাজে গুরুচরণ ছিল ওর একনিষ্ঠ সহকর্মী। রোগের সময় যথেষ্ট করেছে। খুলনায় দৌড়াদৌড়ি করে ঔষধ আনা, ডাক্তারকে আনা পথ্য সংগ্রহ শেষ পর্যন্ত রিণীকে নিয়ে গিয়ে ওকে বাড়ী এনে রেখে যাওয়া। আর দেখা হবে না গুরুচরণের সাথে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, ধন্যবাদ জানানোর সুযোগটুকুও নেই। লোকটা বিশেষ কিছু লেখা পড়া জানতো না—সামান্য জমির মালিক কিন্তু জাত সংগ্রামী। সংগ্রাম করতে দিয়ে প্রাণ দিল।

সুবীর বৈঠকখানায় বসে বসে এইসব কত কি ভাবে সাংস্কৃতিক কাজকর্ম আগের মতই চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে। স্কুলগুলো চলছে। চারটে প্রাথমিক একটা মাধ্যমিক। গান বাজনা খেলাধুলোর চর্চা। এ সব চালাবার লোক যারা ছিল তারা আছে।

রিণী যেন আগের থেকে অনেক শান্ত হয়ে গেছে। ঠিক তেমন যেন চাঞ্চল্য নেই। যেন অনেকটা বয়েস বেড়ে গেছে ওর। সুবীর অনেক সময় দুচোখ ভরে বসে বসে ওকে দেখে। ভারী মিষ্টি, ভারী সুন্দর। তবে টকটক মিষ্টিমিষ্টির একটা স্বাদ আলাদা।—সেটা যেন হারিয়ে গেছে।

একটা বাঁধা ছকে রিণীর দিনগুলো কেটে যায়। সকালে উঠে চার ব্যবস্থা কর। জ্যোতিষবাবু থাকলে তামাক দাও। তারপর ডিসপেন্সারীতে এসে বস। ডিসপেন্সারী মানে বৈঠকখানা। রোগী দু চার জন তো হবেই। জ্যোতিষবাবু থাকলেও তাকেই ঔষধ দিতে হয়। না থাকলেও তাকেই দিতে হয়। দশটা নাগাদ উঠে স্কুলে যাওয়া। দুপুর গড়িয়ে গেলে ফিরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে আবার এসে বৈঠকখানায় বসা। তখন রাণী থাকে, সুবীর থাকে, আরও দু চারজন এসে জুটে যায়। সবাই বসে চা সহযোগে গল্পগুজব করা। রাত্রে সবাইকে ডেকে খাইয়ে দেওয়া। যে যখন আসে খেতে দেওয়া—যে কাজটা সুনয়নী করতেন। এখন তা

রিণীই করে। স্বেচ্ছায় ও কাজটা ও হাতে নিয়েছে। না নিলে দিদি আর কাকীমা সব পেরে উঠবে কেন। সন্ধ্যেবেলায় সুবীরের ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে পড়াতে বসায়। পিন্টু ক্লাস টুতে পড়ছে।

সময়টা একরকম করে কেটে যায়। শুধু কাটতে চায় না রাত্রিটা। পিন্টু থাকে রিণীর কাছে। রাণীও থাকে অনেকদিন। থাকলে কি হবে ওরা চট করে ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর। রিণীর যে ঘুম আসে না।

শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবে রিণী। ঠাকুমা মারা যাবার পর থেকে জ্যোঠা মশাই যেন আর সেই জ্যেঠামশাই নেই। মাকে ওর মনে পড়ে না। মার কথা ভেবে ওর কষ্ট হয় না। মার কোন ছবি ওর মনের মধ্যে নেই। বাইরেও কোন ছবি নেই। ফটো তোলার রেওয়াজ পাড়াগাঁয়ে তেমন নেই। ফটোগ্রাফার কোথা? তুলতে হলে যেতে হবে সেই শহরে। ঠাকুমার কথা মনে পড়ে কষ্ট হয়। অনেক বয়স হয়েছিল। শেষের দিকে শরীর ভেঙ্গে গিয়ে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন। গেছেন ভালই হয়েছে। বিছানায় পড়ে থাকলে কে তাকে সব সময় দেখতো—সেবা শুশ্রূষা করতো। কিন্তু জ্যেঠামশায়ের কথা মনে হলেই চোখ দিয়ে জল এসে যায়।

সকাল না হতেই কোথাও না কোথাও বেরিয়ে যান। সকাল বেলায় খাওয়াটা খেয়ে যেতে চান না। একটু চা খেয়েই দুপুর পর্যন্ত কাটিয়ে দেন।

অনেক অনুযোগ করে দেখেছে রিণী। বিশেষ কিছু কাজ হয়না। বলেন এই তো এক্ষুনি ফিরে আসছি। তুমি কিছু ভেব না মা। বলে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। রিণী আর মাথা তুলতে পারে না। চোখ দিয়ে তখন ওর জল গড়াতে থাকে।

তবে ইদানীং একটা কৌশলে রিণী জ্যেঠামশায়কে বড় জব্দ করেছে। সকালে কিছু না খেয়ে বেরোনোটা বন্ধ হয়ে গেছে।

রিণীও সকালে না খেয়ে স্কুলে যাওয়া ধরেছিল। খবরটা রাণীর কাছ থেকে সুবীর পায়। শরীর জিজ্ঞাসা করায় রিণী বলেছিল, জেঠু, না খেয়ে রোজ রোজ বেরিয়ে যায়, তাই আমারও আর খেতে ইচ্ছে হয় না। তা বাদে না খেয়ে তো বিশেষ কিছু কষ্ট হয় না দেখছি। এখন বয়স হচ্ছে। আমার একটু উপোস কাপাসের অভ্যেস করাও ভাল। বলে রিণী হেসেছিল।

রিণী ভাবতে ও পারে নি সুবীর সেই কথাটাকে জ্যোঠামশায়ের কাছে অমন করে লাগাবে।

জানেন, জ্যেঠামশাই রিণী আজকাল ভয়ানক দুষ্টু হয়েছে। সে না খেয়ে ইস্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। খায় সেই স্কুল থেকে ফেরতা-দুটো আড়াইটায়।

কেন? এ রকম অনিয়ম কারণ? এতে তো শরীর থাকবে না। মোটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়তে পারে।

তাকে কে বোঝাবে বলুন। বললাম তো বলেছিল—আমার ছেলেটা যে না খেয়ে বেরিয়ে যায় তা তোমরা কেউ দেখতে পাও না। আর আমি মা হয়ে—কি করে খাই বল তো।

জ্যেঠামশাই হো হো করে হেসে ওঠেন। তা বেটি আমাকে জব্দ করল বটে। আচ্ছা, কাল থেকে দেখব দেখি বেটি কত আব্দার সইতে পারে।

পরদিন সকালে জ্যোতিষবাবু বললেন, না খেয়ে তো আর বেরুতে দেবে না বুঝতে পারছি। তা আমার যে একটু তাড়া আছে, মা। খুলনা যেতে হবে। ছোটমার তো ভাত চাপাতে এখনও ঢের দেরী।

ছোটমা অর্থাৎ কমলা। সকাল সন্ধ্যার রান্না সুনয়নী যাবার পর থেকে ওই করে।

তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও, জেঠু। আমি এক্ষুনি খাবার নিয়ে আসছি। এত তাড়াতাড়ি ভতে হবে না। চিড়ে মুড়ি নারকেল কোরা গুড় এগুলো যোগাড় করতে কতক্ষণ।

আজ কেন খুলনা যাবে জেঠু?

কাল মামলা আছে। আজ আর ফিরতে পারব না। আজ থেকে গিয়ে পার্টীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে, উকীল মোক্তারের সংগে বোঝাবুঝি করে কাল যদি মামলা ধরে তো জবাব ঠিক করে রাখতে হবে।

জমিদার সুধীন মিত্তির শুধু ধান নিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। জোর করে জমিদারের জমির ধান কেটে নিয়ে যাবার দায়ে দশশ বিরাশী জন চাষীকে আসামী করে মামলা করে নিয়েছে। ঐ অঞ্চলে জমিদারের অনুগ্রহভাজন কয়েকজন ছাড়া এমন কোন চাষী পরিবার নেই যাদের কেউনা কেউ আসামী হয়নি। কোন কোন ঘরে দু তিন জন আসামী। সাক্ষী দেবার মত নিরপেক্ষ কোন লোক পাওয়া যাবে না। ভিন্ন অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে এই মামলার তদ্বির তাগিদা করতে হচ্ছে।

বছর ঘুরে গেল শুধু দিনই পড়ে যাচ্ছে। হাকিম মামলা ধরেই নি। হয়ত এর মধ্যেও জমিদারের কৌশল আছে। পেসকারকে ঘুস দিয়ে শুধু দিন ফেলাচ্ছে। চাষীদের যাতে হায়রানি হয় খরচান্ত হয়। যতভাবে ওকে চাষীদের জব্দ করা দরকার। ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর চেষ্টাও চলছে। উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমান কৃষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি।

কলকাতা বিহার নোয়াখালিতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার কথা খালাও করে

ছড়ানো হচ্ছে। ছড়াচ্ছে মুসলীম লীগের নেতারা। লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান আজ গ্রামে মুসলমান ছেলেদের মধ্যে নোতুন উদ্যম এনে দিচ্ছে হিন্দু বিদ্বেষ। বাংলা দেশ পাকিস্তান হবে। মুসলমান যুবকদের কথা বার্ত্তায় আবার নবাবীআমলের মেজাজ আসছে।

সেদিন কামাল মিঞা নায়েব হরিশ চাটুজ্যের ফরাসের উপর গিয়ে পা তুলে বসল। এতদিন ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট হয়েও নায়েব মশায়ের ফরাসে বসার সাহস ছিল না। চার পাঁচ যত দূরে রাখা ঠেস দেওয়া বেঞ্চিটাতে বসে কথা বলতেন। খুব গোপন আলোচনার সময়েও ফরাসের পাশে রাখা জল চৌকিটায় বসে পরামর্শ করতেন।

হাসতে হাসতে কামাল বললেন। শুনেছেন নায়েব মশাই দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশ পাকিস্তান হবে। আবার মোছলমান রাজত্ব ফিরে আসবে।

নায়েবের সর্বাঙ্গ রিরি করে জ্বলছে। উপায় নেই সহ্য করতে হবে। মুখে হাসি টেনে বললেন, কৈ শুনিনি তো। আমি তো বরং শুনিছি যে দেশ বিভাগে কংগ্রেস এখনও মত দেয় নি।

কামাল আবার হো হো করে হাসে নায়েবের অজ্ঞাতায়। বলে, আরে আপনি আজকাল ঘরের বাইরে হন না তো জানবেন কি করে। আমি থেকে কালই শুনে আলাম। কংগ্রেস মত করে ফেলেছে। শুধু গান্ধীর একটু মত নেওয়া বাকী। তা হয়ে যাবে।

কামাল মিঞায় বিজ্ঞতা পরোক্ষে নায়েবকে আর একটু তুচ্ছ করে তোলে। নায়েব স্বাভাবিক ভাব বজায় রেখে বলেন, তা কামাল মিঞা দেশ স্বাধীন হলি আপনার আমার কি? আপনিও পাকিস্তানের রাজা হবে না, আমিও হিন্দুস্তানের রাজা হব না। অবশ্য মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোক কম, আপনাকে হয়ত মন্ত্রী হবার জন্যে ডাকলেও ডাকতি পারে। আমার ভাই কোন আশাই নেই। হয়ত এই জমিদারী উঠে যাবে নায়েবের চাকরীটুকুও থাকবে না। বলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

কামালকে এতক্ষণে উচিৎমত আঘাত করা গেছে। কামাল আমতা আমতা করে বলে, কি যে ঠাট্টা করেন নায়েব মশাই? আমাকে কেন মন্ত্রী হতে ডাকবে। কত লোক আছে। তবে মুসলীম লীগ যখন করি, তখন মন্ত্রীদেরও কথা রাখতি হবে সময় অসময়।

তবেই দেখুন, আপানার একটা ভরসা আছে। আপনি মুসলীম লীগের চাঁই —পাকিস্তানের মন্ত্রীরা হবে আপনাদের হাতের পুতুল! আমার কোন ভরসা

নেই। আমি নায়েব গিরি ছাড়া আর কিছুই করিনে। তার উপর এই পাকিস্তানে—আমরা হিন্দু আমাদের থাকতি দেবেন তো আপনারা। তা না হলে ভিটে মাটি ছেড়ে কোথায় যে মরতে হবে তারও তো ঠিক নেই।

সে কি বলছেন নায়েব মশায়। থাকবেন বৈকি। আমরা সকলেই থাকব। যে যে দেশের লোক, সে সেই দেশে থাকবে। হিন্দুস্তানে তো মোছলমান আছে। সব কি উঠে পাকিস্তানে আসবে। তাই কখনও হয়।

থাকগে কামাল মিঞা। ও সব কথা থাক। যা হবার হবে। এখন দেখা যাক কি হয়। আপনারা যেন একটু নজর রাখেন। নেন এখন তামাক খান।

জ্যোতিষবাবু বাড়ী আসবেন না বলে গেছেন। তথাপি রিণী ঘুমাতে পারছে না। যদি দৈবাৎ এসে যান। হয়ত দু একবার রিণীমা রিণী করে ডাকবেন। সাড়া না পেলে না খেয়েই শুয়ে পড়বেন। যতই বয়স হচ্ছে ততই যেন জেঠু ছেলে-মানুষ হয়ে যাচ্ছেন।

রিণী আলো জেলে রাখল। আলো না দেখলে হয়ত ডাকলেনই না। কান খাড়া করে বসে থাকে। কোথাও কোন শব্দ হলে জানলা দিয়ে দেখা যায় কিনা। নিশ্চিত না হয়ে একা একা দরজা খুলে বাইরে আসাও নিরাপদ নয়।

একা একা শুয়ে বসে থাকলে আকাশ পাতাল ভাবনা মাথা জুড়ে কিলবিল করতে থাকে। বেশ হোক যা কেটে যাচ্ছিল। একটা না একটা নোতুন কাজের সূত্রী একটা উদ্দীপনার আগুনে তাজা করে রেখেছিল সবাইকে। তার মাঝে ব্যক্তিগত ভাব ভাবনার বেশী অবসর ছিল না। এখন সেই উদ্যতফনা কর্মফনী যেন কোন মন্ত্রবলে নিস্তেজ নতশির হয়ে পড়েছে। আর কবে মাথা তোলার সুযোগ পাবে তার ঠিক নেই।

কেষ্ট কাকুর কথা ওর মনে পড়ে যায়। ঐ একটি মাত্র লোক পাশাপাশি তিনটে থানায় কৃষকশ্রমিকদের মধ্যে এক বিরাট গঠনমূলক ঐক্য ও কর্মোদ্দম জাগিয়ে তুলেছিলেন। কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আসেন কে জানে।

জেঠুর কাছে শুনেছে, প্রথম দিনই সদর থেকে এসে বলেছিলেন সাহসের মামলায় যাদের আসামী দিয়েছে সুধীর মিত্তির তার মধ্যে কেষ্টবাবুর নাম প্রথমে। তিনি প্রধান আসামী। তিনি কৃষকদের উত্তেজিত করে জমিদারের জমি থেকে গায়ের জোরে ধান কেটে নিয়ে যাবার জন্য লেলিয়ে দিয়েছেন। তাই সরকার এবার হুলিয়া বের করেছে।

পালিয়ে কদিন বাঁচতে পারবেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার মত হয়ত আশ্রয় দাতা সেজে কোন বিশ্বাসঘাতক তাকে পুলিশের হাতে নিয়ে তুলে দেবে।

লোকটাকে ঠিক বুঝতে পারে না রিণী। কাছে এলে মনটা ভরে যায়। কি মিষ্ঠি মানুষ। স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতার যেন একখানা মূর্তি। আবার পর মুহূর্তে হাসিমুখে কোথায় হারিয়ে যায়। বিন্দুমাত্র আসক্তি নেই, কোথাও কোন বাঁধন নেই। এক বিচিত্র মানুষ।

আর রিণীকে নিয়ে কি যে করেন। মা মা করে অস্থির করে দেবেন। এমন ভাব করেন যেন রিণী কত বোঝে—একেবারে অভ্রান্ত। আসলে ওর কাছে থাকলে বুঝে ফেলা যায় উনি কি চান। আর সেইটে বলিয়ে নিয়ে প্রশংসাটা ছুড়ে দেন। আসলে ঐটে ওঁর স্বভাব। যাদের মধ্যে থাকেন তাদেরই একজনকে ধরে বলেন বলতো কি করা যায়। তারপর সে যা বলে সেইটে ধরেই প্রয়োজন বোধে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিয়ে কাজ বাতলে দেন আর তাকে প্রশংসা করে আসেন।

নিন্দা করে নয়। প্রশংসা দিয়েই মানুষকে বড় করা যায়। তার মাঝের সুপ্ত শক্তিকে উদ্যমকে, আত্মবিশ্বাসকে জাগরিত করা যায়। আর মানুষকে জাগাতে না পারলে কাকে নিয়ে কাজ হবে। যিনি জাগাতে পারেন তিনিই নেতা।

কিন্তু সেই দিনটা তিনি কিযে বলে গেলেন আজও রিণীর মাথায় ঢোকে নি। সুবীরকে সে কি করে সংগ্রামী প্রেরণা জুগিয়ে যাবে। সেই কি সুবীরের প্রেরণার উৎস। কেন তিনি তা মনে করলেন। সুবীর তো আগে থেকেই স্বদেশী করে বেড়াত। বললেন সুবীরকে তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তুমি ওকে রক্ষা করো।

একি কথা। সে তাকে কি করে রক্ষা করবে। কিসের থেকে রক্ষা করবে। তার ক্ষমতাই বা কি। অধিকারই বা কি।

ভাবলে ভয়ানক বিশ্রী লাগে রিণীর। অথচ সেদিন ঐ কথাগুলোর যেন কেমন একটা মাদকতা ছিল। একটা নেশার ঘোরে যেন সেদিনের সেই সন্ধ্যাটা, সেই রাতটা কেটেছিল। সুবীরের মাথাটা বুকে চেপে ধরে কি করে যে সে শান্ত হয়ে বসেছিল আজ ভাবলেই ও শিউরে ওঠে। হাত পা যেন শিরশির করে যায়। কেষ্টবাবুর কথাগুলোর ঐ মাদকতা সেদিন ওর প্রয়োজন ছিল। না হলে ঐ রুগ্ন লোকটাকে বাড়ী নিয়ে যাবার দায়িত্ব সে ঠিকমত পালন করতে পারত না।

নৌকার ছইএর মধ্যে ধরাধরি করে যখন সুবীরকে আনা হল তখন বিছানা বলতে কিছু নেই। গরীব মালোদের সামান্য বিছানা নিয়ে আসা হয়নি। নৌকার পাটাতনে রিণীর কাপড় দুখানা বিছিয়ে তারই উপর সুবীরকে শোয়ান হ'ল। কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগবে—যেতে হবে বিলের মধ্য দিয়ে খাল ধরে। তারপর নদীতে পড়া হবে।

ইতিমধ্যে আর দু'জন এসে গেল। ওমা, একে পাচু সর্দার। রিণী তো রীতিমত অবাক। পাচুদা তুমি কোথা থেকে এলে ?

পাচু হাসতে হাসতে বলে, আমি তো তোমার সে হুকুমির চাকর, দিদিমনি। বাবুর হুকুম গেছে। দাদাবাবুকে বাড়ী পেঁৗছে দিতি হবে। পথে আপদ বিপদ হোতি পারে। তা গুরুর দয়ায় পাচো থাকতি তোমার সে কোন ভয় নেই। আগে পাচোর জান যাবে। তারপর তোমার সে গায় আচোড় লাগবে। তুমি নির্ভয়ে থাকো দিদি।

রিণী হাসতে হাসতে বলে, না, পাচুদা, তুমি থাকতি ভয় কেন করবো। এখন মুস্কিল হয়েছে কি জানো, তোমার দাদাবাবুর যে ঠাণ্ডা লাগে যাবে। ছইএর মুখি কি দিই বল তো।

পাচু নৌকোর পাটাতনের নীচে ওর অস্ত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে বলে, এইবার তো ভাবনা বাধলে দিদি। পাচোর মাথায় কি ঐ সব বুদ্ধি খোলে? তা আমার গামছা খান দিলি যদি হয়ত নেও।

পাচুর গামছা ভাঁজ করে ছইএর মুখে আটকে দিয়ে অর্ধেকটা সুরক্ষিত করা হল যাতে ঠাণ্ডা টানা বাতাসটা সুবীরের মাথায় না লাগে। এক ধারটা রিণীর শরীর দিয়ে আটকে গেল।

সুবীরের মাথাটা কোলে নিয়ে পরনের শাড়ীর আচল দিয়ে ঢেকে দিল।

শিশির ঝরা জোছনা রাত। দিগন্ত বিস্তৃত বিলের মধ্য দিয়ে নির্জন খাল ধরে ওদের নৌকো এগিয়ে আসছে। সেদিন মনে হচ্ছিল কোন এক অগস্তযাত্রায় যেন ওদের দুজনকে আজ কেষ্টবাবু এক নৌকোয় তুলে দিয়ে গেলেন। কেন তিনি ওদের এমনি করে ভাসিয়ে দিলেন। কেন?

কিছুদূর গিয়ে গুণগুণ করে গান ধরেছিল পাচু সর্দার—

পরের জমি পরের জায়গা ঘর বাঁধিয়া আমি রই
গুরু আমার উপায় হল কই?

এমনি নিরালম্ব ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকতে হবে কে জানে। উপায় আর কি হবে! এ জন্মে এর আর কোন উপায় নেই। বুক ভেঙ্গে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে রিণীর।

কামাল মিঞার কথাই সত্যি হল। কংগ্রেস দেশ বিভাগ মেনে নিল। র‍্যাডক্লিফ ছুরি হাতে দেশটাকে দু খণ্ড করে এক খণ্ড ছুড়ে দিলেন কংগ্রেস কে, আর এক খণ্ড মুসলিম লীগকে।

কাজী বিচার করে শিশুটিকে দু খণ্ড করে দুই বিবদমান মাতাকে এক এক খণ্ড দিতে চেয়েছিলো। আসল মা তাতে আপত্তি করে নিজের দাবী প্রত্যাহার করেছিল। এখানে দুই বিবদমান সন্তনে কিন্তু মাকে দুখণ্ড করে এক এক খণ্ড নিতে কোন আপত্তি করল না।

১৯৪৭ সাল। ১৫ই আগষ্ট। হিন্দুপ্রধান খুলনা হিন্দুস্থানে গেছে মনে করে গ্রামে গ্রামে কংগ্রেসের পতাকা উড়ল। খাঁটি খবর এল ১৪ই আগষ্ট। মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ গেছে হিন্দুস্থানে আর হিন্দুপ্রধান খুলনা পাকিস্তানে। হিন্দু জমিদার বারীন ঘোষ, সুধীন মিত্রির টাকা নিয়ে গিয়েছিল নাকি র‍্যাডক্লিফকে ভেট দিতে কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে।

কামাল মিঞাদের দিন এসে গেল। আজ কয়েক বছর ধরে কামাল মিঞা প্রায় এপথ মাড়ায় না। জ্যোতিষ ডাক্তারের বাড়ী কৃষকসমিতির কর্মীদের আড্ডা। আর কৃষক সমিতির যা কাজ তা হল জমিদার মহাজন ও মুসলীম লীগ বিরোধী। প্রকাশ্যে এরা মুসলীম লীগ সম্বন্ধে কিছুই বলে না। তবে এদের মধ্যে যেহেতু সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ নেই সেহেতু প্রকৃত পক্ষে এরা মুসলীম লীগের শত্রু।

এতদিন হাতে পেয়েও বাগে পাওয়া যাচ্ছি না। হিন্দুজনগণ বিপুলভাবে এদের পক্ষে। এবার পাকিস্তান হয়ে যাওয়ায় হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে গেছে। ইতিমধ্যে যাদের একটু সঙ্গতি আছে তারা ভারতে সরে যাবার চিন্তা করছে। এবার এই ঘাঁটিটা গুড়িয়ে দেওয়া বেশ সহজ হবে।

আজকাল প্রায় ম'ঝে মাঝে কামাল মিঞা জ্যোতিষবাবুর বৈঠকখানায় এসে বসে। ডাক্তার খুড়ো, কেমন আছেন গো—বলে জ্যোতিষবাবুর টেবিলের সামনের চেয়ারটা দখল করে এসে বসে।

আরে এস এস প্রেসিডেন্ট সাহেব। তারপর খবর কি বলো। খবর আর কি। এই যাচ্ছিলাম এই পথে, তাই ভাবলাম একবার খুড়োমশায়ের খবর নিয়ে যাই।

ভাল ভাল, দেখতে এলে যে জ্যোতিষডাক্তার গেল না থাকল না বাপু, এখন ও যাওয়ার কথা ভাবি নি।

না না সে কথা কেন বলছেন। আপনারা চলে যাবেন এ তো আমরা ভাবতেই পারি নি।

চলে না গেলি আর তোমাদের সুবিধে কি হল। জমি জায়গা তো হিন্দুদেরই বেশী। অবস্থাও সাধারণ হিন্দুদের সাধারণ মুসলমানদের চেয়ে ভাল। তোমরা যদি হিন্দুদের সম্পত্তি লুটে পুটে না খেতে পারলে, তবে পাকিস্তান হয়ে আর তোমাদের কি লাভ হল ?

আপনি কি বলতে চান পাকিস্তানে কোন সরকার থাকবেনা।

কেন থাকবে না ? তবে সে সরকার হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য থাকবে না। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সাহায্য করতে থাকবে।

আপনি এই কথা বলতে পারলেন ?

কেন কথাটা খুব খারাপ শোনাচ্ছে নাকি ? তা শোনালেই বা কি করা যাবে। তোমরা আমাকে ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছ, কামাল। জ্যোতিষ ডাক্তার কখন কাউকে ভয় করে কথা বলে নি। আর যে কদিন বেঁচে আছি তা যেন বলতে না হয়। তুমি কিছু মনে করো না কামাল। মুসলমান বলে আমি কখন কাউকে ছোট বলে ভাবিনি। এই অঞ্চলে শত শত মুসলমান পরিবারে আমার যাতায়াত। তারা আমাকে ভালবাসে। আমি তাদের ভালবাসি। হিন্দু মুসলমান আমরা পুরুষানুক্রমে একসাথে বাস করছি। মুষ্টিমেয় কয়েকজন কা'র লীগপন্থী স্বার্থপর মুসলমান গোটা দেশকে বিষাক্ত করে দিচ্ছে। তাদের এই অপরাধ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এর শাস্তি তাদের পেতেই হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সরকার বাংলা দেশ শাসন করবে— সেটাই তো ন্যায়সঙ্গত। এই কাটা বাংলা দেশ কেন—গোটা বাংলা দেশই শাসন করা উচিত ছিল। কাট হল শুধু তদের ভ্রান্ত নীতির ফলে।

মুসলীম লীগ ভ্রান্ত। জিন্নাসাহেব ভ্রান্ত। আপনার স্পর্ধা তো কম নয়। আচ্ছা দেখা যাবে। বলে এক লাফে বারান্দার নীচে নেমে হন হন করে চলে গেল কামাল।

ভেতরে ঔষধ দেবার টেবিলে রিণী, বারান্দার একধারে সুবীর এতক্ষণ নীরবে বসে ছিল। রিণী এবার উঠে গিয়ে তামাক সেজে এনে গড়গড়া নলটা ধরিয়ে দিল জ্যেঠুর হাতে।

জ্যোতিষবাবু হাসলেন।

রিণী সাহস পেয়ে বলল ঐ লোকটার সংগে অমন উত্তেজিত হয়ে কথা বলার কি দরকার ছিল।

ছিল রে ছিল। তোরা জানিসনে, ঐ লোকটার মতলব ভাল না।

পাকিস্তান হয়েছে এবার ও ওর ক্ষমতা জাহির করতে আসে। সুবীর বলে।

রিণী যোগ করে, শুধু তাই নয়। ও এখানে এসে সমিতির কাজকর্মের খবরাখবর জানতে চায়। একরকম গোয়েন্দাগিরি করার উদ্দেশ্য।

জ্যোতিষবাবু বললে, তার চেয়েও জঘন্য মতলব ওর চোখে মুখে সেই ঘৃণ্য লালসা খেলা করে ফেরে। ভেবেছে কি ? প্রয়োজন হলে মুসলমান ছোকরাদের দিয়েই ওকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেব।

জ্যোতিষবাবুর বক্তব্য মোটেই অস্পষ্ট নয়।

রিণী মুখ নীচু করে উঠে ভেতরে চলে গেল। সুবীর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে রইল খিড়কীর ঘাটের পাশের ঐ সবচেয়ে মাথা তোলা ছাতিম গাছটার দিকে। ওরই পাশ দিয়ে নদীর ওপারের গাছপালার মাথার উপর দেখা যাচ্ছে একখণ্ড আকাশ

যেখানে রৌদ্রে নীলে মিশে একটা ধোঁয়াশার সৃষ্টি করেছে। বৎসরের কোন্ সময় এটা, কি মাস ইচ্ছে করে ভুলে থাকতে।

সুবীর অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে কিছুতেই মনে করতে পারছে না এটা কি মাস। অনেকদিনের একটা পুরানো স্মৃতি যেমন অনেক সময় মনে এসেও মুখে আসতে চায় না, ভেতরের কেউ একান্ত চেষ্টায় বাইরে আসতে চাইছে, কিন্তু বর্ষাকালে সস্তাকাঠের দুয়োরটা এমন করে আটকে গেছে যে কিছুতেই হাজার টানাটানি করেও খুলতে পারছে না। সুবীরও তেমনি মনের দুয়ারে আটকানো বন্দীর মত অস্থির অথচ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

একবার ওর মনে হচ্ছিল এটা বর্ষাকাল। বর্ষাকালে বেশ কয়েকদিন বৃষ্টি না হলে গাছপালা আকাশ, নদী যেমন নবীন বৈরাগীর মত এক অপরূপ রূপ ধারণ করে সুবীরের চোখেও আকাশটা আজ তেমন মনে হচ্ছিল। অথচ বর্ষার তো অনেকদিন চলে যাবার কথা। এখনও ঐ কাঁচ ঘাসগুলোর গা থেকে যেন শিশিরের জল শুকোয়নি। ঠিক বর্ষা চলে গেছে। নৈলে আজ সকালে ওর শীত শীত করবে কেন। পঞ্জিকাটা দেখে মাসটাও ঠিক করে নেবে।

ঐ ধূসর আকাশের মত জীবনটাও যেন ধোঁয়াশায় ভরে গেছে। ওর মধ্যেও কি একটা নবীন সন্ন্যাসীর রূপ ফুটে উঠেছে। সুবীর ঠিক বুঝতে পারে না। আর না পেরেই নিজের মনে মনেই ও হাসতে থাকে—যে হাসিরও কোন অর্থ নেই।

হঠাৎ ওর খেয়াল হল জ্যোতিষবাবু কখন উঠে গেছেন। ওরও যেন কোথায়ও যাওয়া, অন্ততঃ পাড়ার ভেতরেও এদিক সেদিক একবার ঘুরে আসা ভয়ানক দরকার মনে হল—ও লাফিয়ে দাওয়ার নীচে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না।

যাওয়া অবশ্য যায় স্কুলের ওদের কাছে—সরোজ দত্ত, গোপাল বোস, কিষ্ট মাল। কিন্তু ওদের তো স্কুলের সময় হয়ে আসছে। ওরা পার্টীর সব সময়ের কর্মী। এখানে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে কাজ করছে। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক রূপে। কিষ্টু বাবু স্থানীয় লোক। পাশের গ্রামে বাড়ী। হেড পণ্ডিত। তবে তিনিই স্কুলগুলোর প্রকৃত সংগঠক।

সরোজবাবু গোপালবাবুর কাছে আজকাল ওর সব সময় যেতে ভালই লাগে না। লোকগুলো এত জানে সব বিষয়ে এমন যোগ্যতা ওদের যে ওদের কাছে সুবীরকে যেন হাস্যাস্পদ মনে হয়। পার্টী থেকে সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে তাদেরই পাঠান হয় যারা সব বিষয়ে পারদর্শী।

সরোজবাবু এমন চোখা চোখা যুক্তি দিয়ে কথা বলবে যার উপর যেন আর কোন

কথা বলা যায় না। সেদিন কথা হচ্ছিল কৃতজ্ঞতা বোধ নিয়ে। ওটা মনুষ্যত্বের অপরিহার্য অঙ্গ। তার যত গুণই থাক ওটা না থাকলে সে পশুরও অধম।

সরোজবাবু হাসলেন, বললেন ইংরেজদের কাছ থেকে এই দেশ নানা ভাবে উপকৃত হয়েছে এ কথা কি অস্বীকার করা যায়? অনেক চাষী বা লেঠেল জমিদারের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে এটাও মিথ্যে নয়। তা হলে তো ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জমিদারের সংগ্রাম করা চলে না।

বিষ্টু বাবু বললেন, তা হলে আপনি কি বলতে চান যে মানুষের ওসব কোন থাকা উচিত নয়। সব সেণ্টিমেণ্ট মুছে নিলে মানুষ তো যন্ত্র হয়ে যায়।

তা যায় বৈকি। সব সেণ্টিমেন্ট তো মোছার কথা হচ্ছে না। আসলে সব জিনিসের একটা সীমা আছে। কৃতজ্ঞতার বেলাতেও তাই। কোন নারীর কি সতীত্ব বিসর্জন দিয়ে কৃতজ্ঞ হওয়া সাজে। কোন মানুষ কি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে কৃতজ্ঞ হতে পারে? একটার একটা পরিষ্কার সমাধান হয়ে গেল। কিন্তু সব জিনিসের সমাধান কি যুক্তি দিয়ে হয়? তা হয় না। যার কাছে হয় তার হৃদয় আছে কিনা সন্দেহ।

ঐ সরোজবাবুটাকে সুবীরের শুধু ঐ জন্যেও বেশী সময় ভাল লাগে না। ও যেন শুধু একটা যুক্তির পাহাড়।

আরে। শুকচাঁদের ছেলেটা চাঙ্গারীর আধ চাঙ্গারী গলদা চিংড়ি নিয়ে আসছে। সামনে পড়তেই বললে দাদাবাবু দিদি কই?

কোন দিদি? রাণী? কে তো দেখিনি।

না আমার দিদি তো বাড়ীতেই আছে। দিদিই তো পাঠিয়ে দিল। রিণী দিদি কই?

ও, তাই বল। রিণী ও রিণী, শিগগির ছুটে এস। দেখ না, তোমার ইন্দ্রনারায়ণ কি মাল হাজির করেছে।

রিণী চান করতে যাচ্ছিল। এগিয়ে এল।

ইন্দু বলল, দিদি পাটায়ে দেছে।

তোর দিদি কি মাছ ধরতে গিছিল?

না, কাকার কাছ থেকে নিয়ে পাঠায়েছে।

কত দাম দিতে হবে রে?

দাম লাগবে না বলেছে।

কে বলেছে সে কথা।

মা বলল, বলবি দাম লাগবে না।

হু ! তা ওগুলো কুটে বেছে দেবে কে ? তোর দিদিকে গিয়ে পাঠিয়ে দিবি। ছেলেটি মাছগুলো ঢেলে দিয়ে চলে গেল।

সুবীর বলল, তা রান্না করা আর খাওয়ার জন্যও কিছু লোক পাঠাতে বললে না যে।

কাঁচা মাছ দেখেই যাদের নুলো দিয়ে গড়ায় তাদের আগে ঠাণ্ডা করি, তারপর তো পাড়ার লোক ডাকার কথা।

সুবীর গলদা চিংড়ি খেতে ভয়ানক ভালবাসে।

রিণী চলে যাচ্ছিল। সুবীর ডাকলো, এই শোনো।

কি ?

রেগে না যাও তো বলি ?

ভণিতা রেখে যা বলবে, বল না।

নারকেলের দুধ দিয়ে কারি খাওয়াবে।

ঠিক আছে। রান্নী তো রাণী সাহেবা, রাজা মশায়ের হুকুম জানিয়ে দিচ্ছি।

সুবীরকে তিন পয়সার মুকুটহীন রাজা বলে ঠাট্টা করে রিণী।

সুবীর সে ঠাট্টায় কান না দিয়ে বললে, উঁহু ! তবে থাক।

থাকবে কেন ?

তুমি যদি নিজ হাতে রান্না করতে পারতো করবে। না হলে দরকার নেই। সুবীর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেল।

রান্না কমলা করে। তার মধ্যে ঢুকে এক পদ নিজে রাঁধতে চাওয়া কেমন লাগে। কমলাও কিছু মনে করতে পারে। আজ দুপুরে গোটা রান্নাটার ভারই হয়ত চেয়ে নিতে হবে। আর তা হলে হয়ত কমলা খুসীও হতে পারে।

সামনেই কমলার সঙ্গে দেখা। গোয়াল পরিষ্কার করে বেরোচ্ছে। হাতে গোবর মাখা। মাছগুলো কুটে দাও না দিদি। আমি চান করতে যাচ্ছি। আজ দুপুরে আমি তোমার রান্না করে দেব।

কেন আমার রান্না বুঝি আর মুখে রুচছে না।

রিণী রাগ করলো না। বরং হেসে ফেলে বললো কে বলেছে তোমার রান্না খারাপ। তার সংগে আমার রীতিমত ঝগড়া হবে। সত্যি তুমি এত সুন্দর রাঁধ না। জান মানুষের গুণটাই হল আসল। তোমার এত গুণ না দিদি—কে আমার হিংসে হয়।

রিণী এমন ভাবে বলে যে কমলাও ঠাট্টা বলে রাগ করতে পারল না। রিণী বলে চলে সত্যি দিদি একটুও বাড়িয়ে বলিনি। আর ধর তোমার রান্না যদি খারাপই

হত, তবে মাসের মধ্যে উনত্রিশ দিন যদি তা খেতে পারি একটা দিনও নিশ্চয়ই পারতাম। আসলে বসে বসে আছি। আর তোমরা সারাদিন খেটে মরছ। তোমাদের একটা দিনও যদি একটু সাহায্য করতে পারি তবু একটু ভাল লাগবে। এই যে মাছটা রইল।

কমলাকে আর কিছু বলতে না দিয়ে পিতলের ঘড়াটা তুলে নিয়ে চলে গেল রিণী।

কয়েক মাস যেতে না যেতেই পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হল। এ ব্যাপারের সংগে কামাল মিঞার মত মানুষের কোন হাত থাক বা না থাক এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মনে লীগের চাঁইদের প্রতি একটা চাপা ক্রোধ যেন বিদ্যুৎ গর্ভ আকাশের মত স্তব্ধ হয়ে উঠল। সকাল বেলা কয়েকটা রোগীকে ঔষধ দেবার পর মহেশের পারিবারিক চিকিৎসাখানা উল্টাচ্ছিল রিণী। ছেলেটার পেট ফাঁপা পাতলা পায়খানা। কিছুতেই সারাতে পারছি না। নক্স দিয়েছিল। হয় নি। জ্যেঠামশাইকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তিনি সব না শুনেই বলে চলে গেলেন, আধ্মানসংযুক্ত অগ্নি-মান্দ্য রোগেও পলস ব্যবস্থেয়। জ্যেঠামশায় ঐ রকম। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলেই একটা শ্লোক বলে যান। সেদিন একটা লোকের পেটব্যাথা। নক্স দিয়ে কাজ হচ্ছে না। জ্যেঠামশায়কে বলতে বললেন, চেপে ধরলে আরাম পায় ?

তা একটু পায়।

শুনে বললেন, কালোছিন্থে পেটব্যথা চাপে শান্তি রয়। সত্যি কালোছিন্থ দিতে মন্ত্রের মত কাজ হল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পালসেটিলাতে তেমন কাজ হচ্ছে না। তাই দেখছিল চায়না দেওয়া যায় কিনা। এমন সময় মন্মথ এসে হাজির। মুখ শুষ্ক, চুল উস্কোখুস্কো। উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা।

এস মন্মথদা খবর কি ? এমন চেহারা করেছ কেন ? বলে রিণী বইটা এক-পাশে সরিয়ে রাখল।

কোন কথা না বলে মন্মথ একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল মুখখানা অসম্ভব গম্ভীর, বিষন্ন।

রিণী ওর ভাবভঙ্গী দেখে মৃদু মৃদু হাসছে। কি গো কিছু বলছ'না যে। নাও ডুবিয়ে এসেছ মনে হচ্ছে।

না কি ডুবতে বাকী আছে আমাদের ? তুমি কিছুই শোন নি ?

এই দেখ, আমি আবার কি শুনব ? আমি কি তোমাদের মত হিল্লীদিল্লী বনবাদাড় শহরগঞ্জে ঘুরে বেড়াই যে রাজ্যের খবর আমার কানে আসবে। মন্মথর মনমেজাজ তিরিক্ষে হয়ে আছে। দলের মধ্যে স্থানীয় কর্মীদের ক্ষেত্রে সুবীরের

পরই মম্নথের স্থান। আর রিণীর প্রয়োজনে মম্মথের স্থান সর্বাগ্রে। অত্যন্ত নির্ভর যোগ্য—সাদা দিলদরিয়া মেজাজ।

মাঝে মাঝে তুমি এমন কর না যে তোমার মুখ দেখতে আর ইচ্ছে করে না। মনে হয় যেন আর এ মুখো না হই।

আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে। আমি ঘাট মানছি। একটা লোক সর্বস্ব হারিয়ে এল। কাল থেকে পেটে তার দানা পানি পড়েনি। অথচ আমি—তুমি একটু বস মম্মথদা, আমি এক্ষুনি নিয়ে আসছি। আমার ভাঁড়ারে যা আছে, বলেই যাচ্ছিল।

মম্মথ প্রায় চীৎকার করে উঠল, দাঁড়াও। শুনে যাও, আমি তোমার কাছে খেতে আসি নি।

রিণী ফিরে এল। ধীরে ধীরে মম্মথ'র কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ওর রুক্ষচুলে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ছিঃ মম্মথদা, তোমরা অত ভেঙ্গে পড়লে কি করে চলবে। পার্টী বেআইনী হয়েছে, তাতে হয়েছে কি।

আমাদের এখন উপায় কি? মম্মথ ভাঙ্গাগলায় বললে।

তুমি জেলের ভয় করছ? জেল তো আগে খেটেছ। আবারও খাটতে হলে খাটবে।

না সে ভয় করি নি। কিন্তু আমরা কাজ করব কি করে। এখনও যে অনেক কাজ বাকী।

সে তো জানি। এত কাজ করার আছে আমরা সাতজন এক নাগাড়ে করে গেলেও তা কোনদিন শেষ হবে না। পার্টী বে-আইনী হতে পারে, উঠে যেতে পারে। মানুষ তো আর সব উঠে যাবে না, নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কাজ তো আমরা মানুষের মঙ্গলের জন্যই করি।

কিন্তু সরকার যদি কাজ করতে না দেয়, তুমি কিছুই করতে পার না। আর সরকার যারা চালায় তাদের স্বার্থের বিপক্ষে যা যাবে তা তারা করতে দেবেও না।

কি করবে? জেলে পুরে থাকবে? সেখানেও তুমি কিছু মানুষ পাবে। তাদের জন্যে সম্ভবমত যা পার করবে। তাদের বললে—মানুষের ভালর জন্য ভাবতে শেখাবে, আর সেই ভাল করতে মানুষে মানুষে ঐক্যের প্রয়োজন বোঝাবে। নির্জন সেলে রাখবে? সেখানে তুমি মনে মনে মানুষের কল্যাণ চিন্তা করবে। সেটাও তো কম কাজ নয়। সেই চিন্তার প্রস্তাব ও একদিন মানুষের কল্যাণকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। গায়ের জোরে তোমার হাতে পায়ে শেকল দেওয়া যায়, মুখও

বন্ধ করা যায়। কিন্তু মন? মনের পায়ে শেকল দেবার ক্ষমতা কোন জিন্না সাহেবের নেই।

মন্মথর মাথাটায় ঝাঁকা দিয়ে রিণী বললে, তা বল ভাত হতে তো এখনও দেরী আছে। লংকা মুড়ি—না নারকেল মুড়ি—কোনটা খাবে।

শোন। তুমি খাওয়ার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছে কেন? আরও অনেক অনেক গুরুতর খবর আছে তা শুনলে সব খাওয়া বরফ হয়ে যাবে।

সে সব খেতে খেতে হবে। যাই হোক না কেন, খাওয়া বন্ধ করে তো আর মানুষ বাঁচতে পারবে না। আর বরফ তো পাথরের বুকের জিনিস। মানুষের কাছে তা ক্ষেত্র বিশেষে অসহ্য হলে ও পাথরের ও প্রিয়সাথী।

রিণী মুড়ি নিয়ে এসে বললে, নাও খেয়ে নাও। খাওয়ার আগে আর একটা কথাও শুনবো না। তা সে যে কথাই হোক।

পার্টী বে-আইনী হবার সাথে সাথে পুলিশের হামলাও জুলুম সুরু হয়েছে। পার্টীর অফিস সিল করে দেওয়া হয়েছে। কাগজপত্র আটক করা হচ্ছে। ছোট বড় সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। গ্রামের দিকেও হামলা হয়েছে। সাহস থেকে ……এবং আরও কাকে কাকে যেন ধরে নিয়ে গেছে।

চা খেতে খেতে রিণী বললে, এবার বল কি সুসংবাদ আছে।

মন্মথ বললে, সুসংবাদই বটে। প্রচন্ড সুসংবাদ। কাল কেষ্টদা ধরা পড়লেন।

এ্যা, রিণীর হাত থেকে চায়ের কাপটা পড়ে গেল। মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললে, খবরটা না জানলেও এটা যে একদিন হবে তা জানতাম।

অনেকদিন থেকে গোয়েন্দা পুলিশ ওঁর পিছু নিয়েছিল। সুবিধা করতে পারে নি। পরশু রাত্রে জলসায় পুলিশ ওকে ঘিরে ফেলে—উপায়ান্তর না দেখে উনি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তখন ভাটি সুরু হয়েছে। কখনো ডুব সাঁতার কেটে, কখন ভাটির টানে ভেসে এক বাঁক পেরিয়ে গিয়েছেন তখন একটা জেলে নৌকো ওঁকে তুলে নেয়। মুসলমান জেলে ওকে খাতির করে বাড়ীতে নিয়ে যায়। এদিকে পুলিসে খবর দিয়ে দেয়।

হু, অথচ একদিন এদেশে আশ্রিতের জন্য আশ্রয়দাতা প্রাণ দিতেন। পাপটা তা হলে কাটতে এখনও অনেক দেরী॥

বেশ কিছুক্ষণ দু'জনে চুপচাপ হয়ে বসে রইল। যেন কারো কিছু আর বলার নেই। ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে আছে। এখন শুধু জহ্লাদের আসার অপেক্ষা।

হঠাৎ রিণী বলে উঠল, মন্মথদা, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি মনে মনে এতদিন, তোমাকেই খুঁজছিলাম। তুমি ছাড়া আর আমার কেউ নেই এ সমস্যার সাহায্য করতে।

তুমি আমাকে এতটা বিশ্বাস করছ কি ব্যাপারে এবং কেন ?

কেন তা জানি না। তবে প্রথম থেকেই তোমাকেই আমার সবথেকে নির্ভর-যোগ্য মনে হয়েছে। এখনও তাই মনে হয়।

রিণী তুমি কি বলতে চাইছ আমি জানি না। তবে আমি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমার এখানে এসেছি।

রিণী বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

আমার প্রতি পার্টীর শেষ নির্দেশ ছিল কেষ্টদার অজ্ঞাতে তার উপর নজর রাখা, আর চরম মুহূর্তে পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে তাকে সাহায্য করা। আমি সেদিন আর একটু আগে তাকে সতর্ক করতে পারলে হয়ত তিনি এ যাত্রা গ্রেপ্তার এড়াতে পারতেন। কিন্তু তা করতে গেলে হয় আমি ধরা পড়তাম অথবা পুলিসের গুলিতে প্রাণ দিতে হত। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি রিণী।

আমার তা মনে হয় না। কেষ্টকাকুর ধরা পড়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। আজ হোক আর দুদিন পরে হোক। বাইরে থেকেও আর তিনি কোন কাজ করতে পারতেন না। বরং যে কদিন বাইরে থাকতেন সে কদিন আরও বহুলোককে বিপন্ন করে তুলতেন। তার চেয়ে তিনি তার স্বস্থানে যত তাড়াতাড়ি যান ততই ভাল। তোমাদের মত ছোটখাট কর্মী বরং যদি দু'চারজন বাইরে থাকতে পারে তবু কিছুটা কাজ হলেও হতে পারে।

যাক, বাঁচালে। একটা অপরাধ-বোধের আত্মগ্লানি থেকে রক্ষা করলে। পার্টি মানে কোন বিশেষ ব্যক্তি নয় — একটা লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যের প্রতি আমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করিনি। আঃ।

কেষ্টবাবু তো সেই কথাই আমাদের শিখিয়েছেন। আমারও আগে ঐ ভুল ছিল

কিন্তু তবু—

আবার কিন্তু কি ?

আমি তো সেদিন ঐ বোধে সরে আসি নি। তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে মরতে কিছুতেই সাহস হ'ল না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো রিণী।

কিছু না বলে রিণী হঠাৎ উঠে গেল। কি মনে করে গেল, না জেনে মন্মথ শংকিত হয়ে উঠল। ওর মুখের দিকেও তাকায়নি। বিশ্রী হয়ে বসে রইল। ওর মনে হচ্ছিল উঠে এই ফাঁকে পালিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর রিণী এল। একটু যেন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন ভাব। এসেই বললে, আচ্ছা মন্মথদা, তুমি কি মানুষ বল তো ? ভীষণ স্বার্থপর। আমি যে এদিকে মহাসমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছি সেদিকে কোন খেয়াল নেই। শুধু নিজের আজেবাজে চিন্তা নিয়ে অস্থির।

সত্যি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। তুমি বলেছিলে বটে মহাসমস্যায় পড়েছ। কি ব্যাপার বল দেখি।

রিণী হেসে ফেলল। তবু ভাল মনে পড়ল কথাটা। দেখ, যা মনে হচ্ছে তোমাদের আর বড়জোর তিনদিন থেকে সাতদিন সময় আছে। আমি চাই সবচেয়ে কম সময়ে অর্থাৎ এই তিনদিনের মধ্যেই তুমি আমার এই সমস্যার সমাধান করে দিয়ে আমাকে বাঁচাও।

বারে বারে বাঁচাও বাঁচাও করছ কেন? সমস্যাটা কি তাই তো বললে না। তোমার কি মনে হচ্ছে যে আমার সাধ্য থাকলে আমি প্রাণ দিয়েও সে কাজ করব না।

সাধ্য আছে কিনা জানি না। তবে তোমার না থাকলে আর কারো থাকবে না।

ভাল জ্বালায় পড়া গেল। আসল কথাটা কখন বলবে।

বলছি। এখন অস্থির হচ্ছ, শুনলে স্থির হয়ে যাবে। আমার রাণীর কাল-পরশুর মধ্যে বিয়ে দিতে হবে। পুলিন ওকে ভালবাসে। জানাশোনার মধ্যে ওর চেয়ে ভাল কোন ছেলেও নেই। এটা করতেই হবে—একদিনও দেরী করা চলবে না।

শুনে খানিকটা চুপ করে রইল মন্মথ। তারপর বলল জেলে, মালো, বাগদী··· —যারা মাছ ধরে খায় তাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়। সকলের সংগে সকলের চলে না। পুলিনের বাড়ী থেকে কিছুতেই রাজী হবে না। শুকচাঁদদার কি মন হবে জানি না।

সেটা আমার দায়িত্ব। তুমি শুধু ঐ দিকটা যা করলে যা হয় করে এনে ঘুরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। স্বাভাবিক অবস্থা থাকলে পার্টি আমার সহায় হত, এখন একমাত্র তুমিই আমার ভরসা। আয়োজন থাকবে না—চুপি চুপি কাজ সারতে হবে। আর না যদি পার—

থাক আর বলতে হবে না। না পারলে আমার মুখ দেখবে না, এইত? মন্মথ হাসল।

তাই কি বলেছি নাকি?

বলনি, না হয় উল্টো করে বলতে, এই তো?

তোমার খালি বাজে কথা।

মন্মথ আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

রিণী ব্যস্ত হয়ে বলল, উঠছ যে?

নষ্ট করার মত সময় আর হাতে নেই। কে কোথায় আছে তাও জানি না। বাজে জিনিস বাদ দিয়ে কাজের ব্যাপারে চললাম। দেখি কি করতে পারি।

মন্মথ বারান্দায় নেমে এল। রিণী ছুটে এসে ওর হাতটা ধরলো। বললে,

তোমাকে জানি। তুমি না থাকলে রাখতে পারব না। তবে যদি দুটো না খেয়ে এখন যাও তবে জানবে তোমার উপর দেওয়া দায়িত্ব আমি ফিরিয়ে নিলাম।

দুদিন দেখা নেই মন্মথর। কেউ কোন খবর দিতে পারল না পর্যন্ত। এদিকে এমন ভয়ানক কাণ্ড ঘটে গেল যাতে সারা ইউনিয়ন চমকে উঠল। পরদিন রাত্রে প্রেসিডেণ্ট কামাল মিঞা তার বাড়ীর সামনে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হল।

পুলিস এসে লাস চালান দিয়েছে। জোর তদন্ত চলছে। এখনও কোন গ্রেপ্তার হয় নি। যে কেষ্টবাবুকে ধরিয়ে দিয়েছে সে নাকি কামালের লোক ছিল। বিকালে আরও ভয়ংকর খবর। যশোরে লীগের সেক্রেটারী হামিদমিঞা নিহত হয়েছে।

রিণীর মুখে কোন কথা নেই। সুবীরের ছোট ছেলেটার জন্য একটা সোয়েটার বোনার সে হঠাৎ ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ওরই মাঝে মাঝে নিজের ঘরে কিছুক্ষণ যায়। কি সব খুট খাট করে। আবার ফিরে এসে বোনা নিয়ে বসে। কেষ্টবাবুর সেই শেষের কথাগুলো ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে বাজতে থাকে। সুবীরকে তার হাতে দিয়ে গেছে। তাকে রক্ষা করতে হবে। ওঃ সব কঠিন বোঝা কি তাকেই বইতে হবে? কেন? কি পাপ সে করেছে? মাঝে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে তার।

জ্যোতিষবাবুও খুব চিন্তিত। একবার বললেন আর বেশী দেরী নেই। সবাই যে কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরী থাক। এই পার্টীর নীতি। সর্বনাশ করে দিল কৃষক শ্রমিক আন্দোলনের।

হয়ত কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যক্তির এই কাজ। সুবীর মন্তব্য করে।

রিণী ভাবে মন্মথদা কোথায় গেল। সে আবার কোথাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ল না তো?

আর একটা কালো থমথমে রাত কেটে গেল। রিণী গভীর মনোযোগে উলের কাজে ফোঁড় তুলে চলেছে। আর মাঝে মাঝে ঘর বার করছে।

একবার রাণীদের বাড়ী ঘুরে এল। কেমন আছিস তোরা রাণী?

কেন, ভালই তো আছি দিদি।

ইস্ কি বিশ্রী তোদের ঘর বাড়ীর অবস্থা। উঠোনটা ঘরটা নিকিয়ে রাখবি। আমি বিকেল বেলা এসে দেখব—আর দুপুরবেলা একবার যাবি তো।

আচ্ছা।

রাণী এলে রিণী একটা নোতুন শাড়ী দেখিয়ে ওকে বলল, দেখ তো শাড়িটা তোর পছন্দ? শাড়ীটা পরিয়ে দেখল কেমন মানায়। নিজের দু'এক খানা গয়না ওকে পরিয়ে দেখে আবার খুলে রাখল। রিণী এগুলো কখন পরে না।

সন্ধ্যার মুখে হঠাৎ মন্মথ কোথা থেকে এসে হাজির। সংগে পুলিন। রিণীকে বললে, এই নাও তোমার আসামী হাজির। এবার যা করবার তুমি কর।

সুবীর, জ্যোতিষবাবু শুকচাঁদ— সবাইকে নিয়ে একটা গোপন সভা হয়ে গেল।

সাহসে পুলিসের ক্যাম্প বসে গেছে আজ থেকে। বিশ আইন জারী হবে যে সব গ্রামে সমিতির ঘাঁটি ছিল। কামালের হত্যাকারী ধরা না পড়লে নির্যাতন কোন পর্যায়ে উঠবে কেউ বলতে পারে না।

ছোট একটু ছাদনা, একটা ডে লাইট, ফুল, বামুন, শংখ—অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই। এক ঘণ্টার মধ্যে মন্মথ সব ঠিক করে দিয়েছে। মেয়ে সাজিয়ে দিয়েছে রিণী তার কাপড় গয়না দিয়ে। শাখা সিঁদুর কিছুরই অভাব হয়নি। পাড়ার আট দশ জনকে ডেকে ডাল ভাতের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

বরবধূ ঘরে তুলে দিয়ে রিণী বাইরে এল। রাণীর ভাইটা এক খণ্ড কাগজ এনে দিল ওর হাতে। বললে। মন্মথদা দিয়ে গেছে তোমাকে দিতে।

ছোট্ট এক খণ্ড কাগজ। ভাজ করা। চিঠিই হবে। মন্মথ লিখেছে। আজ কদিন যে কি হয়েছে রিণীর। কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে। কাগজটা খুলে পড়তে সাহস হচ্ছে না। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। কি লিখেছে মন্মথ কে জানে।

বাইরের খুটিটা ধরে ও নিজেকে একটু সামলে নিল। তারপর কাগজটা খুলে পড়ল, লিখেছে— রিণী, আমার আর সময় নেই। তাই বড্ড দেরী হয়ে গেল। তোমার এ কাজটা শেষ না করে তো যেতে পারি নে। কবে কখন দেখা হবে, কিংবা আর কোন দিনই দেখা হবে কিনা জানি না। তবে যতক্ষণ আছি তোমাদের কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করবো। বেঁচে থাকলে বা বাইরে থাকতে পারলে প্রয়োজনের সময় না ডাকতেই পাবে। নির্ভয়ে থেকো। ইতি মন্মথ।

চিঠিটা পড়ে কুটি কুটি করে উনুনে দিয়ে এলো। সব বিষয়েই খুব সাবধান হওয়া দরকার।

মাথাটার মধ্যে ঘুরছে। এতদিন পরে এবার বোধ হয় ও গুলিয়ে ফেলবে। আর কত ঠিক থাকা যায়।

ওর মনে পড়ল ও সেদিন মন্মথর কাছে নিজেকে পাষাণ বলে উপমিত করেছিল।

ভাববার ও একটু সময় নেই। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেও ছুটল বাড়ীর দিকে বমলাও বিয়ের এখানে এসেছে। ও সারাবাড়ী ঘুরে দেখল। কাকীমা আছে, কাকা আছে বাড়ীতে। সবাই বাড়ী ছেড়ে যাওয়া যায়নি। বাবা জ্যেঠা ওখানে। তারাই যেটুকু যা সব ব্যবস্থা করেছেন।

রিণী কাকা কাকীমার সাথে কথা বলল। এঘর ওঘর ঘুরল। একবার নদীর ঘাটের দিকে গেল। আবার বিয়ে বাড়ী চলে গেল। রাস্তার এদিকে ওদিকে বাড়ী— দূরে তো নয়। রাত্রির অন্ধকারে অনেক ছেলে এসে জুটেছে। তা পনের বিশজন হবে। প্রায় সবারই সংগে রিণী একটু একটু কথা বললে। দেখা হয়নি অনেকদিন।

লোকজনকে খেতে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুবীরকে এক ফাঁকে টিপে দিয়ে ও আবার বেরিয়ে এল।

সুবীরকে বাড়ীর পেছন দিকে নদীর ঘাটে যেতে বলে ও আবার বাড়ী এল। কাকা কাকীমা বারান্দায় শুয়ে পড়েছেন। মাদুর পাতা আছে। বোধহয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পা টিপে টিপে ও খিড়কীর পথে আনারস কাঠাল আম জামের বনের ভিতর দিয়ে ঘাটে এসে পৌছাল। সুবীর আগেই এসে গেছে।

নদীর ধারে ছাতিম গাছটার শেকড়ে একটা ছোট্ট নৌকা বাঁধা।

সুবীর বললে, কি ব্যাপার এখানে নিয়ে এলে কেন?

রিণী কোন কথা বললে না। সুবীরের কাছে এগিয়ে গেল। সুবীরের একটা হাত ও তুলে নিল। নিজের হাতে। তারপর বললে, তুমি তো সব জান। আর এক মুহূর্তেও তোমার এখানে থাকা চলবে না। রাত প্রায় একটা বাজে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে সারা গ্রাম পুলিশ এসে ঘিরে ফেলবে। তোমাকে এই মুহূর্তে ঐ নৌকায় নদী পেরিয়ে পালিয়ে যেতে হবে।

তা হয় না রিণী সুবীর একটু দৃঢ় গলায় বলতে চায়।

ছিঃ। অবুঝ হয়ো না বীরুদা। মানুষের জন্যে তোমাকে বাঁচতে হবে সংগ্রাম করে যেতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

সুবীর হেসে ফেলে। মানুষের জন্যে বুঝি সব দায় আমার। আর কারো কোন দায় নেই।

আছে বই কি। মন্মথদা তো ইতি মধ্যে পালিয়েছে। আরও দু'চার জন গা ঢাকা দেবে সকলের যাওয়া চলবে না। তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।

তোমার কোন দায় নেই?

তবে তুমিও আমার সংগে চল। নৈলে আমি যাব না।

রিণী সুবীরের বুকে মাথাটা নুইয়ে দেয়। সুবীর ওকে জড়িয়ে নেয়। রিণী ওর বুকে মাথা রেখে আস্তে আস্তে বলে, তুমি কি আমার দায় বোঝা। আমার দায় তোমাকে দেশের কাজের জন্যে বাঁচিয়ে রাখা। তোমার ছেলে-মেয়ে স্ত্রী

জ্যোঠামশাই এদের সবাইকে দেখা। নৈলে তুমি নিশ্চিন্তে সংগ্রাম করতে পারবে কেন ?

ওদের দেখা তো আমারই কর্ত্তব্য।

কিন্তু তুমি থেকে সে কর্ত্তব্য পালন করতে পারবে না। তুমি থাকলে আর হয়ত ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পুলিশ তোমাকে ধরে নিয়ে যাবে—মেরে পঙ্গু করে জেলে পুরে রাখবে। সেখান থেকে তুমি ফিরতেও পার, নাও পার। তাহলে বুঝতেই পারছ তোমার কর্ত্তব্য আমাকেই করতে হবে। আব তোমার আমার কর্ত্তব্য আমাকেই করতে হবে। আর তোমার আমার কর্ত্তব্য আলাদা করে ভাবছ কেন ?

এর মধ্যে না বোঝার কি আছে বল। আজ তুমি মানে তোমার ছেলে-মেয়ে স্ত্রী এদের সবাইকে নিয়েই তুমি। আজ তোমাকে ভালবাসতে চাইলে এদেব ও ভালবাসতে হয়—নৈলে তা সত্য হবে কিসের জোরে। আর দেরী কারো না লক্ষ্মীটি।

ছাতিম গাছের গোড়ায় একটা ছোট ব্যাগে দু'একটা জামা কাপড় আর ক'টা টাকা আগেই এনে গুছিয়ে রেখে দিয়েছিল রিণী। সেটা ওর হাতে তুলে দিয়ে নৌকায় উঠার জন্যে তাড়া দেয। নিজেই ওর হাত ধরে নিয়ে নৌকায় উঠে দাঁড়ায়।

তা হলে যেতেই হবে বলছ যখন। কিন্তু কোথায় যাব ? সামনে তো শুধুই অন্ধকার।

ঐ অন্ধকারের ওপার হতে আলো আসছে। সেই বিশ্বাস নিয়েই তো এগিয়ে যেতে হবে।

যতক্ষণ আলো না জাগে ততক্ষণ পথ কি করে দেখব। কেন ? বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে। কবিগুরু তো বলেছেন।

নৌকোর কাছি খুলে দিয়ে লাফিয়ে রিণী নেমে আসে। গলুইটা ধরে একটা জোর ধাক্কা দিয়ে ছেড়ে দেয়। সুবীর চোস্ত হাতে দাঁড়টা চেপে ধরে। নৌকা মাঝ নদীতে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

দু'এক পা উপরে উঠে ছাতিম গাছটা জড়িয়ে ধরে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে রিণী।